উনিশের শতকে নব্য-হিন্দু আন্দোলনের কয়েকজন নায়ক

সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী

জি. এ. ই. পাবলিশার্স
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ :
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী

প্রকাশক :
সুনন্দ ভট্টাচার্য
জি. এ. ই. পাবলিশার্স
১০, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট (ফ্ল্যাট নং-১১
কলিকাতা-৭০০০০৬৭

মুদ্রাকর :
শ্রীঅমলেন্দু শিকদার
জয়গুরু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩/১ মণীন্দ্র মিত্র বো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :
প্রবীর সেন

আমার সকল কর্মের উৎসাহ ও প্রেরণাদাত্রী

আমার মাতৃদেবী

শ্রীযুক্তা শৈলবালা রায়চৌধুরীকে

ভূমিকা

অধ্যাপক সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরীর গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে অনুরুদ্ধ হয়েছি এ আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। দীর্ঘকাল গবেষণা-নিবন্ধের পাণ্ডুলিপিটি অমুদ্রিতভাবে পড়েছিল, এখন মুদ্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। অতএব এটি আমার পক্ষে তৃপ্তিকব সংবাদ।

হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানবাদী আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা হিন্দু সন্তানদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণ এবং কেশবচন্দ্র সেনের খৃষ্টমুখী ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাদান এই উভয় প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল। দেবেন্দ্রনাথেব পবিচালিত ব্রাহ্মসমাজ যাকে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' বলা হত, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তার বিরোধী ছিল না। কেননা দেবেন্দ্রনাথ কখনও বিধবা বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনে উৎসাহী ছিলেন না, নিজের পরিবারে তাঁর জীবিতকালে এর কোনটি সম্ভব হয়নি। দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্টোপদেশ বা খৃষ্ট-সাধনার পক্ষপাতী না হওয়ায় হিন্দুসমাজ তাঁব প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ভিন্নমতাবলম্বী ছিলেন। কেশবচন্দ্রের খৃষ্টধর্মপ্রীতি, বাইবেলে আস্থা, পাপতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রভৃতি তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বিব্রত, তাঁর বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনে তারা সন্ত্রস্ত হয়েছিল। 'ব্রাহ্মরা হিন্দু নয়' ঘোষণার পব হিন্দুসমাজ নিজেদের নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। তার ফলে একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের পঠন-পাঠন নবোদ্যমে দেখা দেয়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে শাস্ত্র বিচার আরম্ভ হয়, তেমনি হিন্দু ধর্ম তথা সমাজের সম্পর্কে হাস্যকর অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও প্রচুর জন্মলাভ করে। তবে মনে হয় স্বধর্ম ও স্বসমাজকে, খৃষ্টসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার আন্দোলনের সঙ্গে স্বদেশ সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। একে হিন্দু জাতীয়তাবাদ বলা হয়ে থাকে। রাজনারায়ণ বসু যিনি আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ও 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'র লেখক তাঁর রচনায় সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের রচিত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' গানটি উদ্ধৃত করেছেন। এই গানটিকে বঙ্কিমচন্দ্র 'মহাগীত' আখ্যা দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে রাজনারায়ণ বসু চৈত্রমেলা অর্থাৎ 'হিন্দুমেলা'র (প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৮৬৭) মুখ্য প্রবর্তক।

আর এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, কেশবচন্দ্র পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ অতিরিক্ত রাজভক্ত ছিলেন এবং তাঁরা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যা 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে পরিচিত তার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় 'স্বদেশী' আন্দোলনে যোগ দিয়ে ইংরেজের জেলে ঢুকেছিলেন। প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সমাজকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ ও তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভের প্রয়োজনীয়তার কথা টিলক, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথও বলে গেছেন। কাজেই হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যে একযোগে নির্দিষ্ট কালপর্বে কাজ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

সুনীতিরঞ্জন, এই আন্দোলনের সামগ্রিক ঐতিহাসিক আলোচনা করেন নি। তিনি কয়েকজন নায়কের চিন্তা ও কার্যকলাপের পর্যালোচনা করেছেন, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। বইটি চিন্তাশীল পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, এই আশা রাখি।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

নিবেদন

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের কয়েকজন নায়ক' আমার গবেষণা-গ্রন্থ। তদানীন্তন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক, অধুনা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্যেব পরিচালনাধীনে ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে আমি গবেষণাকার্য সম্পন্ন করেছিলাম। বিভিন্ন কাবণে এতদিন এই গবেষণা-গ্রন্থ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আমাব পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য উৎসাহ ও প্রেরণা না দিলে এই গ্রন্থ আদৌ প্রকাশিত হত কিনা সন্দেহ। এজন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

'হিন্দু পুনরভ্যুত্থান' এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন। আমাদের জাতীয় জীবনে এব গুরুত্ব অপবিসীম। বিভিন্ন লেখক ও সাময়িকপত্র এই আন্দোলনে সহায়তা করেছিলেন। আমি এই সমস্ত লেখকের রচনা, সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলি গভীব অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেছি। এখন সেগুলির অবস্থা এমনই জীর্ণ যে কাবও পক্ষে সেগুলি অধ্যয়ন করা এমন কি লাভ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপাব। অত্যন্ত দুঃখেব বিষয়, জাতীয় জীবনের এই অমূল্য সম্পদগুলি রক্ষা করার সুব্যবস্থা এ-পর্যন্ত হয়নি। অচিরেই এগুলি যে কালগর্ভে বিলুপ্ত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে যাই হোক, 'হিন্দু পুনবভ্যুত্থান' আন্দোলনের ব্যাপকতা একটি মাত্র গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমি আন্দোলনের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছি মাত্র।

গ্রন্থ বচনায় পরম পূজনীয় অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন, স্বর্গত বিমানবিহারী মজুমদার আমাকে অমূল্য উপদেশ দান করে সহায়তা করেছেন। তাছাড়া এই গ্রন্থ রচনায় আমি জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গ্রন্থাগার, প্রেসিডেন্সী কলেজ গ্রন্থাগার, কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার, রামমোহন গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, শ্রীচৈতন্য গ্রন্থাগার, স্টেটস্‌ম্যান ও অমৃতবাজার পত্রিকা গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচার গ্রন্থাগার এবং বাংলা দেশের বহু সুধী ব্যক্তির অকৃপণ সাহায্য লাভ করেছি। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের

কর্তৃপক্ষ আমাকে বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকাগুলি ব্যবহার করার সুযোগ দান করেছেন, যেসব সুধী ব্যক্তির সদুপদেশ এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পরিচালক ও কর্মীদের সক্রিয় সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী।

এই গ্রন্থ প্রকাশে সর্বাধিক সহায়তা লাভ করেছি শ্রীআনন্দ ভট্টাচার্য ও জয়গুরু প্রিন্টার্স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীঅমলেন্দু শিকদারের কাছ থেকে। তাঁদের দ্রুত ও সময়োচিত সহায়তা না পেলে গ্রন্থ-প্রকাশ অনেক বিলম্বিত হতো। কল্যাণী গঙ্গোপাধ্যায় বইটিব নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করতে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রতন কাঞ্জিলাল, চন্দনা মুখোপাধ্যায়, কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ও কল্যাণী নাথবায় কোনো কোনো ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। শ্রীঅমিয় রায়চৌধুবী ও শ্রীমতী সন্ধ্যা রায়চৌধুরী আমাকে নিরন্তর উৎসাহদান করেছেন। তাঁদের কাছে আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

শ্রীসুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
চারুচন্দ্র কলেজ (সান্ধ্য)
কলিকাতা-৭০০০২৯

সূচীপত্র

প্রাক্-পরিচয়

'হিন্দু রিভাইভ্যালিষ্ট মুভমেণ্ট' কথাটি বোধ করি প্রথম ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ব্যক্তিরা ব্যবহার করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের (১৮৬৪—১৯৩৮) **'New Essays In Criticism'**-গ্রন্থে এর উল্লেখ রয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯) তাঁর **'History of the Brahmo Samaj', (vol. II, P. 275)** এবং বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮—১৯৩২) তাঁর **'Memories of my Life and Times' (P. 441-443)** গ্রন্থে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। 'রিভাইভ্যালিজম্' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' (১৯০৪) গ্রন্থে এর প্রতিশব্দ করেছেন 'হিন্দু পুনরুত্থান' (২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩০০)। বিমানবিহারী মজুমদার এটা সুপ্রযুক্ত বলে মনে করেন না। কারণ, 'পুনরুত্থান' বলতে যীশুখৃষ্টের রেজারেকসন (**Resurrection**) বা পুনরুত্থানের কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের 'রিভাইভ্যালিষ্ট মুভমেণ্ট' ভিন্ন ব্যাপার। তিনি 'পুনরুত্থানের' চেয়ে 'পুনরভ্যুত্থান' কথাটি সঙ্গততর বলে মনে করেন। মনে হয়, খৃষ্ট ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ব্যক্তিরা যীশুখৃষ্টের কথা স্মরণে রেখে হয়তো এরকম প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীরা প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যকে পুনঃ প্রবর্তিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। অতীতের স্বর্ণযুগে ফিরে যাওয়াই ছিল যেন তাঁদের সাধনা। অবশ্য অতীতের কোন্ যুগে তাঁরা প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তা খুব স্পষ্ট নয়। মনে হয়, বৈদিক যুগ, মহাভারতের যুগ, অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের যুগই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। আবার রাণা প্রতাপ, শিবাজী প্রভৃতি হিন্দু বীরেরা ছিলেন তাঁদের আদর্শ। এই প্রসঙ্গে সংস্কারবাদী ও পুনরভ্যুত্থানবাদীদের পার্থক্যটিও স্মর্তব্য। সংস্কারবাদীরা বর্তমান সমাজব্যবস্থার কথাই চিন্তা করতেন; বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যা-সমাধানের কথা ভাবতেন। পুনরভ্যুত্থানবাদীরা গ্রীক্ দেবতা জেনাসের মতো অতীতের স্বর্ণযুগ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করতেন। সংস্কারবাদীদের আদর্শ ছিল

ইউরোপীয় সমাজ-চিন্তার অভিজ্ঞতা ও যুক্তিবাদ, পুনরভ্যুত্থানবাদীদের আদর্শ ছিল হিন্দুশাস্ত্র এবং ভারতের অতীত ইতিহাস। লালা লাজপত্ রায় এ-সম্বন্ধে লিখেছেন—'The former are bent on relying more upon reason and the experience of European society while the latter are disposed to primarily look at the shastras and the past history, and the traditions of their people and the ancient institutions of the land which were in vogue when the nation was in the zenith of its glory.' (Lajpat Rai : The Man and his work, P. 148)

ইংবেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়েব হিন্দুধর্মেব প্রতি অনাস্থা ও অবজ্ঞার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদ আন্দোলন অনেকটা দানা বেঁধেছিল। এব সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারকদেব নির্বিচার ধর্মান্তরকরণ ও হিন্দু-বিদ্বেষ। এর ফলে একশ্রেণীর হিন্দুব মনে ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁবা হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বতোভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টাই হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদের মূলে।

শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৭০—১৮৭৯ কালপর্বকে 'ব্রাহ্মসমাজেব প্রভাবেব হ্রাস ও হিন্দুধর্মেব পুনরুত্থানের সূচনা কাল' (২য় সংস্কবণ, পৃঃ ৩০০) বলে উল্লেখ করেছেন। এই উক্তি একেবারে অযথার্থ নয়। 'হিন্দু পুনবভ্যুত্থানের' প্রবলতা ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষিত হয়। 'প্রচার' (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪), 'নবজীবন' (১৮৮৪) পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ও হিন্দুধর্মের নব ব্যাখ্যাদান এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাছাডা এই একই সময়ে একদিকে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৪৯-১৯০২) ও পণ্ডিত শশধব তর্কচূডামণিব (১৮৫১-১৯২৮) হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা ও নব্য হিন্দুধর্মপ্রচার, অন্যদিকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-৮৬) ধর্মব্যাখ্যা 'হিন্দু পুনবভ্যুত্থান' আন্দোলনকে তীব্র গতিদান করেছিল।

অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে যে 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থান' ঘটেছিল তার ইতিহাস জানতে গেলে এই শতাব্দীর গোডার দিকেও যেতে হবে। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩) খৃষ্ট-ধর্মপ্রবাহ রোধ কবার জন্য সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দুধর্মের প্রধান প্রতিস্পর্ধী ছিল খৃষ্টধর্ম। রামমোহন রায় খৃষ্টীয় 'ত্রিত্ব' বাদ খণ্ডন করে খৃষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে

তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অন্যদিকে রামমোহনের পৌত্তলিকতা বিরোধী বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মবিষয়ক মতবাদ ও ব্রহ্মসভার (১৮৩০) বিরোধিতা করে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ 'ধর্মসভা' (১৮৩০) প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু রামমোহনের খৃষ্ট ধর্ম প্রবাহরোধ এবং শাস্ত্রচর্চা হিন্দুসমাজের অনেকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) রামমোহনের ব্রহ্মসভাকে ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত করেন। তিনি বামমোহন রায়েব চেয়ে দৃঢভাবে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের বিরোধিতা কবে হিন্দু সমাজেব অস্তিত্ব বক্ষার সহায়ক হয়েছিলেন। হিন্দু সমাজ তাঁকে ভালবাসত, শ্রদ্ধাব চোখে দেখত। ব্রাহ্ম ধর্মকে তিনি হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকাব বলে মনে কবতেন। খৃষ্ট ধর্মের প্রবাহ রোধ করার জন্য বক্ষণশীল হিন্দুদের সঙ্গে সম্মিলিত হতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। মিশনারীদের বিশেষতঃ আলেকজাণ্ডার ডাফের (১৮০৬-৭৮) অবৈতনিক বিদ্যালয় 'জেনাবেল অ্যাসেম্‌ব্লি' এ-দেশীয় কিশোর এবং যুবকদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করাব কেন্দ্র হয়ে উঠলে দেবেন্দ্রনাথ এব বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৮৪৫ খৃঃ ডাফ সাহেব সস্ত্রীক উমেশচন্দ্র সবকারকে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করালে দেবেন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ হন ('মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী' সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃঃ ৩৪১)। ধর্মান্তরণের ঢেউ বোধ করার জন্য রক্ষণশীল হিন্দুসমাজেব নেতা রাজা রাধাকান্ত দেবের (১৭৮৪-১৮৬৭) সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৮৪৬ খৃঃ ১লা মার্চ চিৎপুব বোডে রাধাকৃষ্ণ বসাকের বৈঠকখানায় তিনি 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' (ইংবাজী নাম—**Hindu Charitable Institution**) প্রতিষ্ঠা করেন।[১] ১৮৪৮ খৃঃ হিন্দু কলেজেব অষ্টম শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা নিলে কলেজের হিন্দু অধ্যক্ষগণ এবং শিক্ষা-সংসদের (**Council of Education**) মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এর পরের বৎসব অর্থাৎ ১৮৪৯ খৃঃ গুরুচরণ সিংহ নামক উক্ত কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্র খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ কবলে দেবেন্দ্রনাথ কলেজের মূলনীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ-বিষয়ে অধ্যক্ষ সভার প্রধানতম সদস্য রাজা রাধাকান্ত দেব এবং শিক্ষা-সংসদের সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটাব বেথুনের মধ্যে বাদানুবাদের ফলে রাজা রাধাকান্ত দেব কলেজের অধ্যক্ষপদ পরিত্যাগ করেন (জুন, ১৮৫০)। এই বিরোধে দেবেন্দ্রনাথ রাজা রাধাকান্ত দেবকে সমর্থন করেছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ হীরা বুলবুল নামক এক পশ্চিমা রূপোপজীবিনীর পুত্রকে কলেজে ভর্তি করা হলে অধ্যক্ষ সভা প্রবল আপত্তি জানায়। কলেজের

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারী সরকারী শিক্ষা-সংসদ সেই আপত্তি গ্রাহ্য না করলে হিন্দু-সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২রা মে 'হিন্দু মেট্রোপলিটন' কলেজ স্থাপন করেন। এর অধ্যক্ষ সভায় রাজা রাধাকান্ত দেব ছিলেন সভাপতি; দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বিশেষ প্রভাবশালী 'অধ্যক্ষ'। খৃষ্টান বিরোধিতার জন্যই ব্রাহ্ম ও হিন্দু নেতৃদ্বয়ের এ-মিলন সম্ভব হয়েছিল। কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) ব্রাহ্মসমাজে খ্রীষ্টভাব আমদানি করলে এ-কারণেই দেবেন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৭৯ খৃঃ ৯ই এপ্রিল টাউন হলে কেশবচন্দ্র 'ঈশা কে' নামক খৃষ্ট-প্রশস্তিমূলক একটি বক্তৃতা দিলে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে (১৮২৬-৯৯) তার প্রতিবাদে কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডীয় বন্ধু বয়সি সাহেবকে একখানি পত্র লিখতে অনুরোধ করেছিলেন (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সংকলিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী' পৃঃ ১১৯-১২০)। বস্তুতঃ অনেকটা কেশবচন্দ্রের খৃষ্টভাব প্রাধান্য ও ব্রাহ্ম বিবাহ ব্যাপারে 'ব্রাহ্মেরা হিন্দু নয়' এই ঘোষণাব প্রতিক্রিয়া হিসাবেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 'হিন্দু-পুনবভ্যুত্থান' আন্দোলন দেখা দেবার অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

এই 'হিন্দু পুনবভ্যুত্থান' আন্দোলনের কারণ দুটি বলে অনুমিত হয়: একটি মূলগত (Basic) অপরটি তাৎক্ষণিক (Immediate)। প্রথমটি সম্বন্ধে বলা যায়, বহুক্ষেত্রেই বিরোধী দুটি মত পাশাপাশি থাকতে দেখা যায়। একটি উদারপন্থী, সংস্কারবাদী; অপরটি সংস্কার-বিরোধী, রক্ষণশীল। ইউরোপের **'Reformation'** এবং **'Counter-Reformation'**-এর মতো কোন সময় সংস্কারবাদ (**Reformation**), কোন সময় প্রতিসংস্কারবাদ (**Counter-Reformation**) প্রাধান্য বিস্তাব করে। আবাব কোন সময় দেখা যায়, সংস্কারপন্থীদের কিছু কিছু নীতি আত্মসাৎ কবে প্রতি-সংস্কারবাদ প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশের 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থানে' এ-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে এ-দেশের যুব-সমাজ সমস্ত দেশীয় প্রথা, ঐতিহ্য ও সংস্কারকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল। শতাব্দীর শেষ দিকে আবার হিন্দু ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে আস্থা ফিরে আসে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪), বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) প্রভৃতি 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থান' আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করেননি। উনবিংশ শতাব্দীর 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের' আর একটি লক্ষণীয়

মূলগত বৈশিষ্ট্য হল—সংস্কারপন্থী নেতৃবৃন্দের চরিত্রেও উদার নীতিবাদের সঙ্গে রক্ষণশীলতার সংমিশ্রণ। এর ফলে হিন্দু ঐতিহ্য ও বিশ্বাস আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যমণি দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যিনি বর্ধমানের বিধবা মহারানী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করে 'বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও সিভিল বিবাহ' একসঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন, পরবর্তীকালে অযোধ্যায় গিয়ে তিনি টিকি রেখে পরম হিন্দুব ন্যায় ব্যবহার করতেন (রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত)। একটি ব্রাহ্মণকুমাবীব সঙ্গে তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম-আন্দোলন হিন্দুধর্মের ভিত্তিকে দুর্বল করতে পারে মনে করে তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পডেছিলেন। সেজন্য ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু অযোধ্যায় গেলে তিনি শঙ্কিত বোধ করেছিলেন।

ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর আর একজন মুখপাত্র ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুব ১৮৫১ খৃঃ খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করায় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮১৩-৮৫) কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করতে সক্ষম হন। জীবনেব অনেক বছব তিনি বিলাতে কাটিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধের সময় 'Englishman' পত্রিকায় (২২শে অক্টোবর, ১৮৪৬) 'Justicia' ছদ্মনামে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে পৌত্তলিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে একখানি পত্র লিখেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃষ্টান হয়েও কিন্তু হিন্দু জাত্যভিমান ত্যাগ করতে পারেন নি। তিনি নিজের পরিচয় দিতেন, 'আমি ব্রাহ্মণ খৃষ্টান'।

রাজনারায়ণ বসু প্রথম জীবনে ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টান, তারপরে 'ঈষৎ মুসলমান' এবং কলেজ ত্যাগ করার পূর্বে হিউম পড়ে সংশয়বাদী হয়েছিলেন (রাজনায়ায়ণ বসুর আত্মচরিত)। আবার তাঁর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭২) বক্তৃতার পরেই হিন্দু পুনরুজ্জীবন অনেকটা ত্বরান্বিত হয়েছিল। তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু ছিলেন রামমোহন রায়ের শিষ্য ও 'সেক্রেটারী'। কিন্তু হিন্দু লোকাচারকে তিনি লঙ্ঘন করতে পারেননি। এ-বিষয়ে তাঁর নীতি ছিল, 'লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ—মনেতেও লৌকিকাচার উল্লঙ্ঘন করিবে না।' তিনি কোষাকুষি নিয়ে রোজ পূজা আহ্নিক করতেন, আর একটি পেরেকের উপর তুলসীর মালা ঝুলান থাকত।

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ) (১৮৪৫-১৯০৪) সংস্কৃত কলেজে লেখাপড়া শিখলেও 'পজিটিভিজম্' বা প্রত্যক্ষতাবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন।

তিনি মনে করতেন, পজিটিভিজমই হবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ধর্ম। তিনি স্বাধীন প্রেমের সমর্থক ছিলেন, বিবাহের কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন না। মিলের মতাদর্শে তাঁর বিশ্বাস ছিল। মিলের জীবনীও লিখেছিলেন তিনি। 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' পৌত্তলিকতা প্রচার করা হয়েছিল বলে তিনি অভিযোগ করেছিলেন। অথচ প্রাচীন বর্ণভেদের উপযোগিতা তিনি সমর্থন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-গর্বেও তিনি গর্বিত ছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, ব্রাহ্মণ্য গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেই ভারতের উন্নতি হবে।[২]

প্রখ্যাত 'পজিটিভিষ্টরা'ও এই ভাবদ্বন্দ্ব অতিক্রম করতে পারেন নি। খ্যাতনামা 'পজিটিভিষ্ট' যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রথম জীবনে 'প্রতিক্রিয়াশীল' হিন্দু পুনরভ্যুত্থানে'র বিরোধী ছিলেন। অথচ জীবনের শেষদিকে তাঁব মত অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি তখন ধর্মেব চেয়ে নীতিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিব মধ্যে তিনি নীতির চরম বিকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর মতে হিন্দুধর্মে অতিথি-ঋণ, ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ, দেব-ঋণ প্রভৃতি যে ঋণতত্ত্ব দেখা যায়, তার মধ্যে সর্বোচ্চ নৈতিক কর্তব্যবোধেব পরিচয় পাওয়া যায়।[৩] সাহিত্য, সামাজিক সংগঠন, পারিবাবিক নীতি-আদর্শ, কর্তব্যবোধ ও সত্যধারণা সম্বন্ধে হিন্দুবা পাশ্চাত্য-মানবগোষ্ঠী থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ বলে তিনি মনে করতেন। এ-ধরনের চিন্তাধারা পরোক্ষভাবে 'হিন্দু পুনবভ্যুত্থানের' সহায়ক হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শচীশের বিশ্বাস পরিবর্তনের মধ্যে এ-সম্বন্ধে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন,—'আবার একদিন কানাকানি এবং কাগজে কাগজে গালাগালি চলিল যে, ফের শচীশেব মতের বদল হইয়াছে। একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম, তারপরে আর একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া স্নান-তর্পণ যোগযাগ দেব-দেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না।'

'উন্নতিশীল' ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র সেনেব জীবনেও এই ভাব-দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অসবর্ণ বিবাহ, জাতিভেদ লোপ, নারী স্বাধীনতা প্রভৃতি বৈপ্লবিক কর্মসূচী নিয়ে তিনি 'পিছিয়ে পড়া' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবের সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু শেষদিকে তিনি নিজেই নিজের অনেক মতের বিরুদ্ধাচরণ করেন। ১৮৭১ খৃঃ কিছুসংখ্যক ব্রাহ্ম পর্দার বাইরে বসে মহিলারা যাতে সমাজের কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারেন সেজন্য আন্দোলন শুরু করেন।

কেশবচন্দ্র এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি মেয়েদের জ্যামিতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। শেষ-জীবনে তিনি যোগ, বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন। পৌত্তলিকতার সমর্থনও তিনি করেন।[৪]

'হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের' তাৎক্ষণিক (Immediate) কারণগুলির মধ্যে কেশবচন্দ্রের খৃষ্টপ্রীতি, 'ব্রাহ্ম বিবাহবিধি' প্রবর্তন' (১৮৭২), 'ব্রাহ্ম স্ত্রী-স্বাধীনতা' 'অসবর্ণ বিবাহ', 'সহবাস সম্মতি বিধি' (১৮৯১) প্রভৃতি অন্যতম।

১৮৬৮ খৃঃ মুঙ্গেরে কেশব-শিষ্যদের মধ্যে অনুতাপ, ক্রন্দন প্রভৃতি খৃষ্ট-ভাব দেখা দিলে ব্রাহ্ম সমাজে 'নর-পূজার' অভিযোগ উঠে। এই খৃষ্টভাবের প্রবাহ রোধ করার জন্য ১৮৭২ খৃঃ ১৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ 'ট্রেনিং একাডেমি' গৃহে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌরোহিত্যে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নামক স্মরণীয় বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় হিন্দু সমাজ বিশেষ উল্লসিত হয়েছিল। 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁর অশেষ প্রশংসা করে তাঁকে 'হিন্দুকুলশিরোমণি' আখ্যা দিয়েছিলেন।[৫] 'এডুকেশন গেজেট' (প্রথম প্রকাশ ১৮৫৬)-সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪) তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন (রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত)। হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্য তিনি 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১৮৮৬) পুস্তক প্রণয়ন এবং 'মহাহিন্দু সমিতি' গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন।

'ব্রাহ্ম বিবাহবিধি' (১৮৭২) প্রবর্তনের সময় কেশবচন্দ্রের 'ব্রাহ্মরা হিন্দু নয়' ঘোষণায় আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং হিন্দুসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাছাডা, উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং অসবর্ণ বিবাহ হিন্দু সম্প্রদায়কে আতঙ্ক-গ্রস্ত করেছিল। তাই হিন্দু সমাজ নিজেদের দুর্গকে দুর্ভেদ্য ও অক্ষত রাখার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। এসময়ে উপন্যাস, নাটক ও প্রহসনে ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকার জীবন নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু হয়। অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) নাটকে স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ এবং স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশাকে কটাক্ষ করেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'শাস্তি কি শাস্তি' (১৯০৮) নাটকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের মতো বিধবা বিবাহের কুফল বর্ণনা করে ঋষিদের বিধানকেই অমোঘ সত্য বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্ম স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতিকে প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিলেন অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)।

তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্ম সমাজ। 'বিবাহবিভ্রাট' (১৮৮৪), 'বাবু' (১৮৯৩), 'খাসদখল' (১৯১১) প্রভৃতি প্রহসনে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, কলেজীয়-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, ব্রাহ্ম ভ্রাতা-ভগিনীদের সমালোচনা করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দুটি ঘটনা হিন্দু জাগৃতি ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের সহায়ক হয়েছিল। একটি 'ইল্‌বার্ট বিল' (১৮৮২), অপরটি 'সহবাস সম্মতি বিধি' (১৮৯১)। 'ইল্‌বার্ট বিলে' এদেশীয় বিচারকদের দ্বারা ইউরোপীয়দের বিচারের কথা বলা হয়েছিল। ইউরোপীয় জনসমাজ বিলটিকে 'কালাকানুন' আখ্যা দিয়ে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ব্রান্‌সন্ হিন্দুদের ধর্মগত আচার-ব্যবহার এবং সমাজ-ব্যবস্থার নিন্দা কবে ঢাকায় জোরালো বক্তৃতা দেন। বাগ্মীপ্রবর লালমোহন ঘোষ ব্রান্‌সনের উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনে হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা এবং ধর্মগত আচার-ব্যবহারের প্রকাশ্য নিন্দা হওয়ায় হিন্দুধর্মের সবই ভাল এরূপ একটি সংস্কার শিক্ষিত হিন্দুদেব মধ্যেও দেখা দিতে শুরু কবেছিল।[৬] ১৮৮৩ খৃঃ আর একটি ঘটনায় হিন্দুসমাজ আরও বিক্ষুব্ধ, আব সংঘবদ্ধ হয়। বিচাবপতি নরিস যিনি 'ইল্‌বার্ট বিল' আন্দোলনে ইউরোপীয়দের অন্যতম মুখপাত্র ছিলেন, তিনি প্রকাশ্য আদালত গৃহে হিন্দুধর্মের অবমাননা করেন। একটি মোকদ্দমার বিচার কালে তিনি হাইকোর্টে শালগ্রাম আনিয়ে সে সম্বন্ধে কিছুটা ব্যঙ্গার্থক মন্তব্য করেন। 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতি নরিসেব আচবণেব সমালোচনা করলে আদালত অবমাননার দায়ে তাঁব কারাদণ্ড হয়। হিন্দুসমাজ মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে **'Defender of faith'** বা 'হিন্দুধর্মেব রক্ষক' বলে অভিহিত করেন।

'সহবাস সম্মতি বিধি'ও হিন্দুসমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এই আইনের দ্বারা নরনারীর সহবাসের বয়ঃসীমা নির্ধারিত করা হয়েছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫)-সম্পাদিত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। গড়ের মাঠে লক্ষ লোকের জনসভার আয়োজন 'বঙ্গবাসী'ই করেছিল। হিন্দু সমাজের আপত্তির কারণ ছিল—এই আইন হিন্দুব 'গর্ভাধান' সংস্কার বিরোধী। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৪৯-১৯০২), শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১), অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও (১৮২০-১৮৯১) এই আইন সমর্থন করেননি। অবশ্য

বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে 'আইন হইবার প্রয়োজন নাই, হইলেও ক্ষতি নাই।' গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল বসু নাটকে, প্রহসনে ব্যঙ্গ-কটাক্ষের সাহায্যে এই 'বিলের' বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেছিলেন। গিরিশ-চন্দ্র 'পাঁচ কনে' (১৮৯৬)-শীর্ষক রচনায় এই আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। 'সম্মতি সঙ্কট' প্রহসনে অমৃতলাল এর বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করেন।

উপরিউক্ত ঘটনাবলী 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের' প্রত্যক্ষ কারণ হলেও রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের (১৮৩৬-১৮৮৬) সহজ সরল ভাষায় হিন্দুধর্মের সারসত্য প্রচার, চিকাগোর বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে বিবেকানন্দের অবিস্মরণীয় বক্তৃতা, শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' হিন্দু ধর্মের তত্ত্বব্যাখ্যা হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের' দুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। একটি হল—যুক্তি বিরোধী ভক্তি চর্চা। এই শতকের অনেক সংগ্রামী যুক্তিবাদীও শেষ পর্যন্ত রসবাদ ও ভক্তিবাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হিন্দু-পুরাণ, বৈষ্ণব সাহিত্যে ভক্তির যে প্রাচুর্য আছে, তা এযুগে বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়েছিল। তাই, পৌরাণিক নাট্য রচনা এবং গৌড়ীয় ভক্তিবাদের অনুকরণে বৈষ্ণবীয় ভাবসাধনা এ-যুগের অনেক মনীষীর মনকে আকৃষ্ট করেছিল। ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র পাল পর্যন্ত কেউ এ-ভাবধারাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। সংকীর্তন, গুরুবাদে বিশ্বাস তাই এ রস-সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দুধর্মের এই নব-রসবাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য খৃষ্টান ও ব্রাহ্মরাও তাঁদের ধর্মচর্চায় বৈষ্ণব সংকীর্তনের অনুকরণে খৃষ্ট-সংকীর্তন ও ব্রাহ্ম সংকীর্তন আমদানী করতে বাধ্য হয়েছিল। উনবিংশ শতকের এই পুনরভ্যুত্থান-বাদী ভক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে কার্ডিনাল নিউম্যানের (১৮০১-৯০) **'Oxford Movement'**-এর আংশিক তুলনা করা যেতে পারে। ১৮৩৩ খৃঃ থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। নিউম্যানের এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল অষ্টাদশ শতকীয় 'র‍্যাশনালিজম' অর্থাৎ নির্মোহ যুক্তি ও বুদ্ধিগত বিচার প্রবণতার বিরোধিতা করা। সমালোচকের কথায় বলা যেতে পারে **'but he used reason to maintain beliefs'**।[৭] উনবিংশ শতকের বাংলা দেশে যে 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থান' দেখা দিয়েছিল তাও ছিল নির্মোহ যুক্তিবাদ ও বিচার প্রবণতার প্রতিস্পর্ধী। রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গে' এই পালাবদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন। নাস্তিক

যুক্তিবাদী জেঠামশায়ের 'চেলা' শচীশ ঈশ্বর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এই পদ্ধতিতে তর্ক করতেন—

'ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া, সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে, ঈশ্বর নাই, অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে, ঈশ্বর নাই.' সেই শচীশ একদিন 'লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া' পাড়া অস্থির করে তুলল। শচীশের এই ভূমিকা সেযুগের ভাবধারার প্রতীক।

'হিন্দু পুনরভ্যুত্থান'বাদেব ক্ষেত্রে ভক্তিবাদ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এ-যুগের বহু ব্রাহ্ম নেতাও যে এই ভক্তিবাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন তার কারণ তাঁদের বংশপবিচয় ও জীবন-চর্চার মধ্যেই পাওয়া যাবে। রাজনারায়ণ বসুর পিতা এবং রামমোহন-শিষ্য নন্দকিশোর বসুর তুলসী মালা জপ করার ঘটনা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের শেষ জীবনে ভক্তি-বাদের যে স্বরূপ ফুটে উঠেছে, তার বীজ তাঁর জীবনেই নিহিত ছিল। চৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি যে নগবসংকীর্তনের রীতি প্রবর্তন করেন, তার গান হল, 'যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।' এই 'ভক্তি'ই তাঁর জীবনের প্রধান সাধনা—যুক্তিবাদ নয়। 'হিতবাদ' (Utilitarianism) ও কঁতের প্রত্যক্ষবাদের (Positivism) বিরোধিতা তিনি এজন্যই করেছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রভাব তাঁব জীবনে ছিল বলে 'সাধু সমাগম' পর্যায়ে তিনি 'চৈতন্য সমাগম' সম্পর্কেও ভাষণ দিয়েছিলেন। ভক্তি-নির্ভর এই বৈষ্ণবীয় ভাব তাঁব কুলধর্ম। তাঁর পিতামহ রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪) নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন।[৮]

কেশব-পিতা প্যারীমোহন সেনও বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ভোব চারটায় উঠে হবিনাম জপ করতেন, তারপর পূজা-আহ্নিক সেরে শ্রদ্ধা সহকারে সারা গায়ে হবিনামের ছাপ পবতেন, কপালে তিলক কেটে নামাবলী গায়ে দিতেন। অফিসে যাবার সময় নামেব ছাপেব উপবেই পোষাক পরতেন, কিন্তু কপালের তিলক ধুয়ে ফেলতেন। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় সকলে বলতো 'গোঁসাই যাচ্ছে।' রামকমল সেন পরিবারের সন্তানদের কৌলিক ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। 'কেশবচন্দ্র', 'কৃষ্ণবিহারী' প্রভৃতি নাম-করণেব মধ্যে সে ইঙ্গিত নিহিত আছে। তাছাড়া, পাঁচ বছর বয়স হলেই প্রত্যেক ছেলের হাতে একছড়া তুলসীর মালা দিয়ে তিনি হরিনাম দিতেন। কেশবচন্দ্রকেও সেরকম দিয়েছিলেন। বাড়ির অন্যান্য ছেলেরা কিন্তু সব সময়

নাম জপ করতেন না। কেশবচন্দ্র সারা জীবন সে নামজপ ছাড়েননি। সব সময় তিনি হরিনাম নিয়ে থাকতেন, 'শেষে এই হরিনামে জগৎ মোহিত করলেন।'[৯]

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবনেও যুক্তি-ভক্তির দ্বন্দ্বে ভক্তিই জয়লাভ করেছে। সংস্কৃত কলেজের বৈদান্তিক শিক্ষা তাঁকে প্রগাঢ় ভক্তিবাদ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। তারপর মেডিকেল কলেজে বাঙলা ভাষায় **'Anatomy, Materia Medica'** প্রভৃতি পড়ার সময় তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। ব্রাহ্মসমাজে উপবীত ত্যাগ আন্দোলনের তিনিই ছিলেন অন্যতম প্রধান নেতা। অদ্বৈতাচার্যের বংশধর হিসাবে এ প্রচেষ্টা দুঃসাহসিক বৈ-কি! গোস্বামী মহাশয় উপবীত ত্যাগের জন্য কেশবচন্দ্রের নিকট আবেদন পত্র পেশ করলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ পর্যন্ত সেই আবেদনে সাড়া দিতে বাধ্য হন। এর পর ব্রাহ্ম সমাজের সমস্ত সংস্কার আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। জাতিভেদের কঠোরতাকে আঘাত করতে হলে অসবর্ণ বিবাহ অপরিহার্য; এজন্য গোস্বামী মহাশয় তাঁর আত্মীয় কিশোরীবাবুর কন্যা রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে প্রসন্নকুমার সেন-এর বিবাহের প্রস্তাব করেন। এর ফলে ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহের প্রবর্তন হয়েছিল।

কিন্তু সংগ্রামী বিজয়কৃষ্ণও শেষ পর্যন্ত গৌর-ভক্তিবাদের স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন। শেষজীবনে তিনি গুরুবাদ, অলৌকিকতাবাদ, জাতিভেদ প্রভৃতি সব মেনেছিলেন। এই ভক্তিবাদী পুনরভ্যুত্থানের বীজ তাঁর কুলধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল।[১০]

ব্রাহ্মসমাজে হরি সংকীর্তনের অনুকরণে নগর-সংকীর্তনের প্রবর্তনে গোস্বামী মহাশয়ের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এই ঘটনার পর থেকেই তাঁর মনের সুপ্ত ভক্তি স্রোত ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। ক্রমে তিনি যোগ ও মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে নির্জন সাধন ব্রতে মগ্ন হন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য গুরুলাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার পর রঘুবর দাস বাবাজীর কাছে তিনি দীক্ষালাভ করেন। একদা গুরুবাদ বিরোধী (মুঙ্গেরে কেশবচন্দ্রের প্রতি ব্রাহ্মদের ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি) গোস্বামী মহাশয়ের গুরুবাদ-সমর্থনের যুক্তিগুলি খুব কৌতূহলজনক। তিনি বলেন 'ক, খ, শিখিতে

গুরুর প্রয়োজন, অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন ; কৃষি বা বাণিজ্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন ; রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন, কেবল ধর্ম শিখিতে গুরুর প্রয়োজন নাই, ইহার পর আশ্চর্যের কথা আর নাই।'[১১] সাধারণ ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পালও (১৮৫৮–১৯৩২) শেষে বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ মাঝামাঝি তিনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে শিবনাথ শাস্ত্রীর বিশিষ্ট সাধক দলে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কতকটা প্রাচীন হিন্দু-যজ্ঞের অনুকরণে এই দীক্ষাদানপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার (১৮৭৮) পর বিপিনচন্দ্র তার সঙ্গে যুক্ত হন। পরে স্বামী বিবেকানন্দের নব্য-বৈদান্তিক আন্দোলনের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। জাতীয় আন্দোলনকে তিনি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক রূপদান করেন। ১৯০৭ খৃঃ মাদ্রাজে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন—'**The supreme message of the Vedanta is this : that every man has within himself the spirit of God ; and as God is eternally free, self-realized, so is every man eternally free and self-realized.**' দীর্ঘকাল বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে শেষ জীবনে তাঁকে বলতে শোনা যায় : 'এ জীবনে একটি শিক্ষা পাইয়াছি, তাহা সকলের চাইতে বড। সকল সময় মনে রাখিতে পারি বা না পারি, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না যে, এ জীবনের কর্তা আমি নিজে নহি। নিজে যাহা করিতে চাহি নাই বা করিব ভাবি নাই, বহুবার তাহাই করিয়াছি ও তাহাই হইয়াছে। দীর্ঘ জীবনের শেষ সীমানায় আসিয়া যখন পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, তখন সত্যই বলিতে পারি—

হরি হে, তুমি আপনি নাচ আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে,
মানুষতো সাক্ষীগোপাল কেবল আমার আমার বলে।

বারম্বার ইহা দেখিয়া কহিয়াছি—

'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি !
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'[১২]

এই মনোভাবের ফলে তাঁকে অবতারবাদ, গুরুবাদ প্রভৃতি মানতে হয়েছিল। তবে তিনি বৈষ্ণবতত্ত্ব ও বৈষ্ণব ধর্মকে একটি যুক্তিগ্রাহ্য রূপ দিতে চেয়েছিলেন।

অবতারবাদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা একেবারে গতানুগতিক ছিল না। 'Sri Krishna' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—

Sree Krishna who is worshiped by the Vaishnava Hindus all over India is a prominent figure in the great Sanskrit epic, the Mahabharata. He is regarded by our people as an avatara or what you would call an incarnation of God. But the English word incarnation conveys a very imperfect meaning of what we understand by avatara. The root meaning of the two words is different. Incarnation is from 'Carnis', flesh; avatara is from 'ava' which means down, and 'taran' to come. Avatara means, thus, that which has come down. You read in Mathew that the spirit of the Lord 'descended' upon Jesus immediately after his baptism by John the baptist. The Hindu say that before his baptism Jesus was only a natural man. It was only after he was baptised and the spirit of the Lord descended on him, that he became an avatara, you will thus see, in much broader and indeed more universal, so to say, than what is understood by the term incarnation.'[১৩]

'অবতারবাদ'-এর পরে 'গুরুবাদকে' তিনি বড়ো বলে মেনেছেন। কারণ, বাঙ্গালীব ধর্মাচারে, তান্ত্রিকতায় বৈষ্ণবধর্মে গুরুর স্থান মুখ্য। তিনি ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য। বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

'I have myself had the supreme good fortune of sitting at the feet of a holyman, Pandit Bijoy Krishna Goswami.' ('The Soul of India, P. 52) তিনি মনে করতেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উভয়ই ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করেছেন। 'Saint Bijoy Krishna Goswami' গ্রন্থে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা উল্লেখ করেছেন। মৃত আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ, দেব-দেবীর সঙ্গে নিভৃত আলাপ প্রভৃতি ঘটনা যুক্তিবাদী মনকে হয়তো পীড়িত করতে পারে।

এই বৈষ্ণব ভক্তিবাদী 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থানে' আরো অনেক উন্নতিশীল ব্রাহ্ম শেষ পর্যন্ত এ-ভাবে নব্যবৈষ্ণবতাকে আশ্রয় করেছিলেন। শিশিরকুমার ঘোষ

(১৮৪০-১৯১১) যাঁর পাল্‌কির বাঁশের সঙ্গে মুর্গি বাঁধা থাকত (আমার জীবন, ২য় ভাগ, পৃঃ ২০৪), তিনিই 'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থ রচনা করেন। তারাকিশোর চক্রবর্তী 'কাঠিয়া বাবার' শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শেষে 'ব্রজবিদেহী সন্ত দাসে' পরিণত হন। সুকিয়া স্ট্রীটের অন্যতম ব্রাহ্ম রাখালচন্দ্র রায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শুধু উপবীত গ্রহণই করেন নি; গলায় রুদ্রাক্ষের মালাও ধারণ করেছিলেন।

ভক্তিবাদী পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-৮৬)। তিনি শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের মতো অদ্ভুত যুক্তিবাদী ধর্মব্যাখ্যার পথ গ্রহণ করেননি। অহৈতুকী নারদীয় ভক্তিপ্রচার করে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর আচরণ, জীবনচর্যার মধ্যে যে অসাধারণ ভক্তিভাব ফুটে উঠত তা সমসাময়িক মানুষের মনে নিঃসন্দেহে গভীব রেখাপাত কবেছিল।

এই ভক্তিবাদের পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক, ভক্তিমূলক নাটকেরও আবির্ভাব হয়। পৌরাণিক নাটকগুলি ভাববাদী 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থানকে' আরো এগিয়ে নিয়ে যায়। দেশের অশিক্ষিত জনসমাজ ভক্তি রসে আর্দ্র হয়ে আধুনিক প্রগতিশীল আন্দোলনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল। মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) ও রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) পৌরাণিক ভক্তিমূলক হিন্দুধর্মকে জাগাবার জন্যে অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন।

উনবিংশ শতকের মানুষের দৃষ্টিকে বাস্তব জগৎ থেকে রামায়ণ-মহাভারতের ভক্তিরসের দিকে প্রথমে সরিয়ে নিয়ে যান মনোমোহন বসু। তাঁর 'রামাভিষেক' (১৮৬৭), 'সতী' (১৮৭৩), 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৫১), 'পার্থপরাজয়' (১৮৮৯), 'রাসলীলা' (১৮৭৯) গীতাভিনয় এই উদ্দেশ্যে লেখ হয়েছিল।

কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের ভক্তিরসের সঙ্গে গৌড়ীয় অহৈতুকী ভক্তিবাদ যোগ করে গিরিশচন্দ্র ঘোষই এযুগে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। উনিশ শতকের মধ্যভাগের ধর্মবিরোধী যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা কয়েছিলেন. 'হিন্দুস্থানের মর্মে-মর্মে ধর্ম। ধর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।'[১৪] ধর্মপ্রাণ পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন, 'ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, প্রভৃতিকে

চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব।' শোনা যায়, গিরিশচন্দ্রের খুল্ল পিতামহী রামায়ণ, মহাভাবত প্রভৃতি পুরাণের কথা অতি চমৎকার করে বলতে পারতেন। বালক গিরিশচন্দ্র সন্ধ্যার পর তাঁর কাছে বসে সেই গল্প শুনতেন এবং সেগুলি তাঁকে এতই অভিভূত করতো যে তিনি সব সময় কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকতেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকের পটভূমি এখানেই রচিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম পর্বের নাটকগুলির বিষয়বস্তু রামায়ণ, মহাভারত অথবা অন্য কোনো পুরাণ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এসব নাটকে ভক্তিরসের প্রাবল্য থাকলেও নাট্যকাব নিজেকে দূরে সবিয়ে রেখে-ছিলেন। দ্বিতীয় পর্বে তিনি রামকৃষ্ণদেবেব সংস্পর্শে এসে তাঁরই আদর্শে নাট্যবচনায় ব্রতী হন। এরপব থেকে নাটকে তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধিরও প্রকাশ ঘটতে থাকে। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এ-যুগকে 'নাম ভক্তি প্রচারেব যুগ' বলে অভিহিত কবেছেন। প্রথম পর্বে 'রাবণ বধ' (১৮৮৯), 'সীতার বনবাস' (১৮৮১), 'লক্ষ্মণ বর্জন' (১৮৮১), 'সীতাব বিবাহ' (১৮৮২), 'রামেব বনবাস' (১৮৮২) প্রভৃতি নাটক লিখলেও 'ধ্রুব চবিত্র' (১৮৮৭) ও চৈতন্য লীলার' পর তিনি ভক্তি বসেব প্রবাহে ভেসে যান। যুক্তিবাদবিরোধী অহৈতুকী ভক্তি—'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর' জাতীয় মনোভাবে তিনি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ছিলেন। 'চৈতন্য লীলা' নাটকেব ভক্তিবাদ 'হিন্দু পুনবভ্যুত্থানে' বিশেষ সাহায্য করেছিল। থিওসফিষ্ট অন্দোলনের অন্যতম নেতা কর্ণেল অল্‌কট্ গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা নাটকেব ভূয়সী প্রশংসা করেন। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'চৈতন্য লীলার অভিনয় দর্শনে সমস্ত বঙ্গদেশ হবিনামে মাতিয়া উঠিয়াছিল।' 'পাণ্ডব গৌরব' (১৯০৯), 'জনা' (১৮৯৪), 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৭) প্রভৃতি নাটকে বৈষ্ণবভক্তি প্রকাশ পেলেও রামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ তাঁকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করেছিল। রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'অহেতুকী কৃপাসিন্ধুব অপার কৃপা পতিত-পাবনের অপার দয়া-সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার চিন্তার কোন কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ।'[১৫]

গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য' (১৯০৯) নাটকটিব মধ্যে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য যে প্রকাশ পায়নি তা নয়। এ-যুগে শঙ্করাচার্যকে নিয়ে 'শঙ্কর বিজয়' কাব্য-নাটক ইত্যাদি লেখা হয়েছিল। শঙ্করাচার্য 'নাস্তিক' বৌদ্ধ ধর্মকে প্রতিরোধ করে সনাতন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রও 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের'

জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে নাটক রচনা করা খুব স্বাভাবিক। তাছাড়া, এই নাটক রচনা প্রসঙ্গে 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদী আন্দোলনের' দু'জন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তিনি স্মরণ করেছেন। এই নাটকখানি স্বর্গীয় কালীপদ ঘোষকে উৎসর্গ করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন —'আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ তুমি নরদেহে আমার 'শঙ্করাচার্য' দেখলে না।' তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এই নাটক প্রসঙ্গে। তিনি বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে তিনি শঙ্করাচার্য নাটক লিখেছিলেন। মন্তব্যটি খুব অর্থপূর্ণ। বিবেকানন্দ বিশ্বধর্ম সম্মেলনে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করে হিন্দু পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। শঙ্করাচার্যের ভূমিকাও অনেকটা তাই ছিল। এজন্যই হয়তো তিনি বিবেকানন্দের আদর্শে শঙ্করাচার্যের চিত্র অঙ্কিত করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের ধারা, মনোমোহন বসুর যাত্রা বা গীতাভিনয়ের ধারা অনুসরণ করে বাংলাদেশে ভক্তিরসের প্লাবন সৃষ্টি করেছিলেন রাজকৃষ্ণ রায়। 'ভক্তি'র বাড়াবাড়িতে তাঁর নাটকের নাট্যরস ব্যাহত হয়েছে; কিন্তু সে যুগের অশিক্ষিত মানুষকে ভক্তিরস পরিবেষন করে তিনি স্বধর্মকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মতোই তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তিবাদ প্রচার করেছিলেন। রামভক্ত তরণীসেন চরিত্র অবলম্বনে 'তরণীসেন বধ' (১৮৮৪), সীতার অগ্নি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮) নাটক লিখে সমসাময়িক দর্শক-মনকে তিনি তৃপ্ত করেছিলেন। 'মীরাবাঈ' (১৮৮৯), 'হরিদাস ঠাকুর' (১৮৮৮), 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (১৮৮৪), 'প্রহ্লাদ মহিমা' (১৮৯০) প্রভৃতি নাটকের বিষয়বস্তুও নিছক ভক্তিরস।

আরো একটি কারণে ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে ভক্তিধর্মের বন্যা দেখা দিয়েছিল। ১২৯৩ সালে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা 'শাস্ত্র প্রকাশ বিভাগ' প্রবর্তন করে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের উপর বিভিন্ন শাস্ত্র (ভক্তিশাস্ত্রের সংখ্যা এতে নিতান্ত কম ছিল না) অনুবাদের ভার অর্পণ করে। ফলে 'বিষ্ণু সংহিতা', 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'যোগবাশিষ্ঠ', 'ব্রহ্মবৈবর্ত', 'শিব' 'কূর্ম', 'দেবী ভাগবত', 'দেবীপুরাণ' 'কালিকা-পুরাণ', 'পদ্মপুরাণ', 'বাল্মীকির রামায়ণ' প্রভৃতি অনূদিত হয়েছিল। এসব গ্রন্থে

পাপমুক্তির পথনির্দেশও লক্ষ্য করা যায়। অনুতাপবাদী খৃষ্টধর্ম এবং নিরীশ্বর-বাদী মানুষকে এরকম সহজ ব্যবস্থাপত্র (Prescription) দিতে পারে নি। অবশ্য এই ভক্তিবাদী আন্দোলন পরোক্ষভাবে প্রগতিশীল আন্দোলনকে যে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের' আর একটি বৈশিষ্ট্য হল—ইংরাজী শিক্ষিত কিছু সংখ্যক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কর্তৃক হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয়চন্দ্র সবকার ও বঙ্কিমচন্দ্রেব মতো ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের এ-প্রচেষ্টা জনগণমনে গভীব প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দু কলেজের একজন সেরা ছাত্র ছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের তিনি সহপাঠী। কিন্তু ইয়ংবেঙ্গলদেব মতো হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি শ্রদ্ধা হাবান নি। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) ভাষায় তাঁকে বলা যেতে পারে, 'ইংরাজী শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে'। তিনি বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন নি, 'সহবাস সম্মতি বিধি'র বিরোধিতা করেছিলেন। হিন্দুধর্ম উদ্ধাবের জন্য তিনি 'ধর্মমহামণ্ডলী' স্থাপন করেছিলেন। হিন্দু আচার-ব্যবহাব, পবিবার প্রথা, সামাজিক অনুশাসনগুলির যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য তিনি 'আচাব প্রবন্ধ' (১৮৯৪), 'পারিবাবিক প্রবন্ধ' (১৮৮১) ও 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) নামক তিনখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই গ্রন্থ গুলিতে তিনি হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিব সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর কত সমাজ-ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা যুগ ও কাল অতিক্রম কবে এখনও অক্ষয়, অমর হয়ে আছে। ইউরোপীয় সভ্যতা ভোগবাদী, জড়বাদী, ভারতীয় সভ্যতা অধ্যাত্মবাদী—এক কথায় তাঁর ধারণা ছিল—'সনাতন ধর্ম, বর্ণভেদ, সম্প্রদায় ভেদ, আচার ভেদ, অধিকারী ভেদ, রুচি ভেদ প্রভৃতি স্বীকাব করিয়া মৌলিক একতার উপরেই লক্ষ্য রাখিয়া যে সম্মিলনের সকল ব্যবস্থা হিন্দু সমাজে দিয়েছেন তাহা মানব-সমাজ সকলের ভবিষ্যৎ বিরাট সম্মিলনের আদর্শ।'

হিন্দুধর্ম ও রীতিনীতির আর একজন সমর্থক ও ব্যাখ্যাতা ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪—১৯১৯) মহাশয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং বিশিষ্ট পদার্থবিদ্ হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, বর্ণাশ্রম ধর্মের উপকারিতা, ব্রাহ্মণ্য গৌরব, আহারাদি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিন্দুদের বাছবিচারের যৌক্তিকতা তিনি সমর্থন করেছিলেন। ১৩০১ সালের

(আষাঢ়) 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'অ্যানি বেসান্ত'-শীর্ষক একটি নিবন্ধে হিন্দুচিন্তা-ধারার স্থায়িত্ব এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারার অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, 'ইউরোপ কর্মপ্রবণ, আর ভারতবর্ষ বৈরাগ্য প্রবণ, কর্ম হইতে ঐশ্বর্য, জ্ঞান, গৌরব ইউরোপ লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। আর বৈরাগ্য হইতে ভারতবর্ষ তৃপ্তি, শান্তি, অনাসক্তি লাভ করিয়া ঐশ্বর্য, জ্ঞান, গৌরব বিসর্জন দিতে বসিয়াছে। তাই হিন্দু জাতির তৃপ্তি ও শান্তি স্থিতিশীলতায় হিমালয়ের স্পর্দ্ধা করে। অক্ষুব্ধতায় প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনীয় হয়। আর ইউরোপের জ্ঞান গৌরব পবাক্রম হয়ত আকাশবাহী উল্কার মত অগ্নিগিরির উদ্‌গীরিত বহ্নির মত ক্ষণস্থায়ী শোভা বিস্তার কবিয়া নির্বাণ হইতে পারে। ..'

বর্ণাশ্রম ধর্মের যৌক্তিকতা সমর্থন করতে গিয়ে তিনি যে যুক্তিগুলি দেখিয়েছেন সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম বিলুপ্ত করে কোন বিপ্লব ঘটাবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। 'পুবাতন আদর্শ পুবাতন ভিত্তির উপর' যাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে সে বিষয়ে তাঁব সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁব মতে, বর্ণাশ্রম ধর্ম কতকটা 'Discipline'-এব কাজ করে। বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোবতার ফলে সকল শ্রেণীর ভারতবাসীব মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধতে পারে না বলে ভাবতবর্ষে অশান্তি কম। ইউবোপেব যে-কোন লোক যে কোন স্থানে বসতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশেব ব্যবস্থা কতকটা অন্যরূপ।[১৬]

ব্রাহ্মণ্য গৌরবকে তিনি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ভাবতের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে ইউবোপেব 'পৃস্‌ট' (Priest) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক উন্নত শ্রেণী বলে নির্ণয় করেছিলেন। তিনি বলেন, ডারুইনের প্রাকৃতিক অভিব্যক্তিবাদ আবিষ্কারেব অনেক পূর্বে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এর স্বরূপ জ্ঞাত হয়েছিলেন।[১৭]

ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন তা অনেক সময় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলে মনে হতে পারে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এদিক থেকে অনেক বেশি পরমতসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শ্বেত-চর্মের কোনো মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ থাকতে পারে বলে রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্বাস করতেন না। 'আমিষ ভোজন'-শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এ-বিষয়ে উল্লেখ কবেছেন—'পাঠক মহাশয় ক্ষমা করিবেন, শ্বেত চর্মের অভ্যন্তরে যে বিশুদ্ধ মানবপ্রেম বর্তমান থাকিতে পারে সহস্র ঐতিহাসিক উদাহরণ সত্ত্বেও আমি ইহা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে পারি না। এই ভয়ানক অবৈজ্ঞানিক

কুসংস্কার হইতে মুক্তিলাভ আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব।' পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্মের জীব-অহিংসার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও খুঁজে পাননি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এই চরম মনোভাবের জন্য শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আনুকূল্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। 'দেশের কথা' পত্রিকার এক সংখ্যায় লেখা হয়েছিল, 'স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি তৎকালিক মনীষিগণ চূড়ামণির তর্কবলে তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইয়া তাঁহার অনুকূলতা করিতে লাগিলেন।'[১৮] এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে রামেন্দ্রসুন্দর-লিখিত 'সামাজিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং এ-জাতীয় ধর্মপ্রচারকে প্রকারান্তরে সমর্থন করে লিখেছিলেন, 'যাঁহারা সনাতন ধর্মের বা জাতীয় আচরণের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঈদৃশ কৌতুকের অভিনয় করিতেছেন, তাহাদের অভিনয় দেখিয়া রসগ্রাহী লোকের হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয় বটে, কিন্তু তাহাদের আন্তরিক উদ্দেশ্যকে আমি শ্রদ্ধা করি।' এই মনোভাবের ফলেই হিন্দু-আচারগুলির আশু পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেননি।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৪৯-১৯০২) ও শশধর তর্কচূড়ামণির (১৮৫১-১৯২৮) হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন অনেক সময় 'অমার্জিত' প্রথার আশ্রয় নিয়ে যেভাবে খৃষ্টবিরোধী বক্তৃতা দিতেন, তা হিন্দু-সমাজকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য অনেক সময় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্য নিয়েছিলেন ('ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ প্রবন্ধ')। শশধর তর্কচূড়ামণি হাঁচি, টিকটিকির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনিও জলবায়ু, সমাজ-ব্যবস্থা ভৌগোলিক পরিবেশের দিক থেকে ভারতকে জগতের শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছিলেন। ('ধর্মব্যাখ্যা' ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভূদেব-রামেন্দ্রসুন্দর-বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদী' দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি বিশেষ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) 'অভিব্যক্তিবাদ', 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'-তত্ত্ব ও হার্বার্ট স্পেনসারের 'সামঞ্জস্য তত্ত্ব' এঁদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৬) গ্রন্থে ঈশ্বরভক্তির পরেই দেশ-

প্রীতিকে গুরুতর ধর্ম আখ্যা দিয়েছিলেন। ব্যাখ্যা স্বরূপ তিনি বলেছেন—'ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন; এই জন্য সর্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।

আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা কবিয়া স্বদেশ-প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।' বঙ্কিমচন্দ্রের মূল কথা আত্মবক্ষা, বংশ রক্ষা ও স্বজন রক্ষা। এ সম্বন্ধে ডারউইন, স্পেনসারের ব্যাখ্যাত মতকে হয়তো তিনি তাঁর সামাজিক উপন্যাসের ভিত্তি কবেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে 'প্রবৃত্তি' ও 'ধর্মবুদ্ধির' দ্বন্দ্ব হয়তো এখান থেকেই এসেছিল। কারণ আত্মরক্ষা ও সমাজ-রক্ষার জন্য 'ধর্মবুদ্ধি' ও 'সংযম' প্রয়োজন। এই দুই বৃত্তির অভাব ঘটলে সমাজে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলের প্রাধান্য ঘটে।

বিপিনচন্দ্র পাল ডারউইনের মতবাদে 'ব্যষ্টিব' চেয়ে সমষ্টিব স্থান বেশি আবিষ্কার কবেছিলেন। তিনি 'ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতা' ও 'সমাজানুগত্যকে' পরস্পব-বিবোধী মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত কবেছেন। বামেন্দ্রসুন্দর 'ব্যক্তিকে' একেবারে নস্যাৎ না করে ব্যক্তির সেই 'ব্যক্তিত্ব' বা 'ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বলাধান'কে স্বীকাব কবেছেন যা সমাজদেহকে বলিষ্ঠ ও শুভময় করে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই 'আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা স্বজন রক্ষা'-র তত্ত্বটি স্থিতিবাদী মনোভাবেব পরিপোষক। সমাজের যা আছে তার পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই, নতুনত্ব বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে—এ ধরনের মনোভাব সেদিন যে অনেকের মনে দানা বাঁধতে পেবেছিল, তার মুল কারণ হচ্ছে এই। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য দেশাচার ও লোকাচারকে স্বীকার করেন নি। উদার পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনেব প্রভাব হয়তো এ বিষয়ে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তিনি স্থিতিবাদকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এ মনোভাবের বশবর্তী হয়ে হিন্দুর সব কিছুর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। এক কথায়, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ'—এটাই ছিল এঁদের জীবন-দর্শন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও এ মনোভাবের বশবর্তী হয়ে 'দেশাচার' 'লোকাচার'কে অলঙ্ঘ্য বলে মনে করেছিলেন। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দও (১৮৬৩-১৯০২) পরবর্তীকালে যে আচারগুলিকে মূঢ়তা বলে অভিহিত করেছিলেন, এঁদের

শিক্ষিত-মন সেগুলিকেও আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। এ কারণেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সর্বপ্রধান গ্রন্থ 'সামাজিক প্রবন্ধের' শীর্ষদেশে 'মনুসংহিতা'র 'সর্বত্র সমবেক্ষেদং নিখিলং জ্ঞান চক্ষুষা। শ্রুতি প্রামাণ্যতো বিদ্বান্, স্বধর্ম নিবিশেত বৈ॥'—শ্লোকটি স্থাপিত হয়েছিল। এই 'স্বধর্ম প্রীতি' ও 'আত্মরক্ষা-সমাজরক্ষার' নীতি ব্রাহ্মসমাজের পাশ্চাত্যের অনুকরণে সমাজ-সংস্কারের গতিকে রুদ্ধ করেছিল। 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের' এও একটি কারণ।

শুধু ভারতবাসী নয়, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু সংখ্যক পাশ্চাত্য পণ্ডিতও ভাবতের অতীত জ্ঞান-গবিমা আবিষ্কার করে 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থানকে' পবোক্ষ সাহায্য করেছিলেন। মোক্ষমূলবেব ঋগ্বেদ-ভাষ্য, প্রিন্সেপ ও কানিংহামের ভারতীয় কলাবিদ্যা, প্রত্নবিদ্যা প্রভৃতির পুনবাবিষ্কার হিন্দু সমাজকে উদ্দীপিত কবেছিল। এঁদের পদাঙ্ক অনুসবণ করে কয়েকজন বাঙ্গালী ঐতিহাসিক আরো গবেষণা শুরু কবেন। বাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২—৯১), ডাঃ রামদাস সেন (১৮৪৫—৮৭) ঊনবিংশ শতকেব সপ্তম দশকে গ্রামীণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক অমূল্য তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করেন। এসব আবিষ্কারের ফলে এবং মোক্ষ-মূলাবেব 'ভাবতবাসী আযজাতির বংশধর'—এ-উক্তির পর ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'আর্যামির আস্ফালন' দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমে এর সর্বগ্রাসী প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী তাঁর 'চরিতকথায়' (১৯১৩) এজন্য মোক্ষমূলবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কবেছিলেন। কিন্তু আর্যত্বলাভের কঠোর সাধনা অপেক্ষা, আস্ফালনই বেশি হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাই এই 'নব্য হিন্দুয়ানির' বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় লিখেছিলেন—'বাংলার নব্য হিন্দুয়ানিই আমার কাছে অসহ্য। কেন না তার মূলে কোনরূপ সবল বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস যে নেই তার প্রমাণ নব্য হিন্দুরা তাঁদের মত খাড়া করবার জন্য একবার যান দৌড়ে স্পেন্সারের কাছে আর একবার শঙ্করের কাছে—তারপর Hegel, Eucken, Bergson, কবিরাজ গোস্বামী, দাশরথি রায়, শশধর তর্কচূড়ামণি, Hertz Poincare-এ সবই তাঁদের গুরু। একটু দাঁড়াবার জায়গা পাবার জন্য তাঁরা একবার এর পায়ে ধরছেন, আর একবার ওর পায়ে ধরছেন; শুধু এক কাজ করতে এঁরা একান্তই অক্ষম। সে হচ্ছে মনোরাজ্যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। এই মানসিক কাপুরুষতা যেমন কমিক তেমনি ট্র্যাজিক।'[১৯]

এই আর্যামির প্রবল স্রোতে অনেক শিক্ষিত প্রগতিপন্থী ব্যক্তিও ভেসে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'আর্যামি'র বাড়াবাড়িতে যোগদান না করলেও, এ-স্রোত আসার পর থেকে কিছুটা রক্ষণশীল হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'র (১৮৯০) 'পরিত্যক্ত' কবিতায় সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করেই যা লিখেছেন এ-প্রসঙ্গে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

'বন্ধু,—
মনে সেই প্রথম বয়স
নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে
বহিয়া নূতন আশা।
নিমেষে নিমেষে আলোক রশ্মি
অধিক জাগিয়া উঠে
বঙ্গ হৃদয় উন্মীলি যেন
রক্ত কমল ফুটে।

প্রতিদিন যে পূর্ব গগণে
চাহি রহিতাম একা,
কখন ফুটিবে তোমাদের ওই
লেখনী অরুণ-লেখা।

তোমাদের ওই প্রভাত-আলোক
প্রাচীন তিমির নাশি
নবজাগ্রত নয়নে আনিবে
নূতন জগৎরাশি।

* * *

কোথা গেল সেই প্রভাতের গান
কোথা গেল সেই আশা।
আজিকে বন্ধু তোমাদের মুখে
এ কেমনতরো ভাষা।

ক

আজি বলিতেছ, "বসে থাকো, বাপু,—
ছিল যাহা তাই ভালো,
যা হবার তাহা আপনি হইবে,
কাজ কি এতই আলো।"
কলম মুছিয়া তুলিয়া রেখেছ,
বন্ধ করেছ গান,
সহসা সবাই প্রাচীন হয়েছ
নিতান্ত সাবধান।

*　　　　*　　　　*

তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমবা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।
নিজের জীবন মিশায়ে যাহারে
আপনি তুলিছ গড়ি
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙিছ কেমন করি।'

এই 'উজান স্রোতের' ফলে যে 'হিন্দু পুনবভ্যুত্থান' দেখা দিল তাতে একদিকে 'আর্যামি'ব আস্ফালন, আর এক দিকে ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষা সমন্বিত অথচ ছদ্ম আচারনিষ্ঠ একটি সম্প্রদায়েব সৃষ্টি হল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কল্পনাব' 'উন্নতি লক্ষণ' কবিতাটি নব্য হিন্দু ও গোঁড়া হিন্দুকে লক্ষ্য করেই লিখেছিলেন। একদিকে 'কালিয়া বরণ' কোট-প্যাণ্ট দুরস্ত, মনু-নিষিদ্ধ পক্ষী ভক্ষণে অভ্যস্ত প্রকৃত ভারতদ্বেষী অথচ প্রাচীন হিন্দু গরিমায় বিশ্বাসী নব্য হিন্দু আর একদিকে হাঁচি, টিকিতে ম্যাগ্‌নেটিজমে বিশ্বাসী প্রবল রক্ষণশীল হিন্দু-উভয় সম্প্রদায়কে কবি নির্মম কটাক্ষ করেছেন এই কবিতায়।

'হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদ' অনেক প্রগতিবিরোধী কাজ করলেও ভারতে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করেছিল। পরবর্তীকালে এই জাতীয়তা সঙ্কীর্ণরূপ ধারণ করে 'হিন্দু জাতীয়তা'য় পর্যবসিত হয়েছিল। পরবর্তীকালের

হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'হিন্দুরাষ্ট্র' বা 'হিন্দুরাজ' প্রতিষ্ঠা করা। ভারত যে এক বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ 'বিভিন্ন ধর্ম সমন্বিত দেশ একথা তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন। ফলে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদ ভারতের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় বিশেষতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে সন্দেহ ও ভীতির ভাব জাগ্রত করে। মুসলমান সম্প্রদায়ও নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য বিশেষ তৎপর হয়। ১৯০৬ খৃঃ ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হবার পর হিন্দু সমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভি, ডি সাভারকারের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ এবং হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদী প্রতিষ্ঠান মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে রোধ করার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হয়। অধ্যাপক এম. এ. বাক্ তাঁর 'Rise and Growth of Indian Militant Nationalism' (পৃঃ ১৯১) গ্রন্থে সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন, 'The strong Hindu character of both the Maharashtrian and the Bengal nationalism gave a great impetus to the revival of Hindu life,' but at the same time intensified the gulf between the Hindus and the Mahommedans considerably, The Mahommedan would not care to be back in the India of the Vedas ; he would equally insist that the New Raj should be Muslim Raj rather than Hindu Raj, and if the Muslim Raj is not possible, the present British Raj is preferable to the Hindu Raj of Tilak and Pal. There is no doubt that the Hindu nationalism gave rise to a powerful movement of Muslim nationalism during these troublesome years.' পাকিস্তান সৃষ্টি কি এরই পরিণতি নয়?

রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬—১৮৮৬)

হিন্দুধর্ম পুনরভ্যুত্থান-প্রচেষ্টায় সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের। কথায় ও কাজে হিন্দুধর্মকে নিম্নস্তর থেকে তুলে এনে তিনি উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত করে গেছেন। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন পরমহংসদেবের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে লিখেছেন, **'He had helped to raise from the dust the fallen standard of Hinduism, not in words merely, but in works also.'**[১]

হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, মাতা চন্দ্রমণি। রামকৃষ্ণদেবের বাল্যনাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া করার পর বাড়িতে থেকে তিনি গৃহদেবতা 'রঘুবীর'-এর সেবা করতেন। পিতার মৃত্যুর পর সতেরো বছর বয়সে তিনি কলকাতায় আসেন। ১৮৫৫ খৃঃ দক্ষিণেশ্বরে এলেও তাঁর প্রকৃত কর্মজীবন শুরু হয় ১৮৭৫ খৃঃ থেকে। এই বছর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) সঙ্গে তিনি নিজে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। (গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় তাঁর 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থের ১০৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, এই সাক্ষাৎকার হয়েছিল বেলঘরিয়ার 'তপোবনে' ১৫ই মার্চ, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে)। এই সময় থেকে তিনি তাঁর মতবাদ সাধারণের কাছে প্রকাশ করতে থাকেন।

পরমহংসদেবের মৃত্যুর দু'বছর আগে (১৮৮৪) বাংলা দেশে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। পূর্বেই বলা হয়েছে, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা। শিক্ষিত, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনেকেই প্রথম দিকে এঁদের সমর্থক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রথমদিকে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির 'নব্য-হিন্দুত্ব' আন্দোলনের প্রতি অনুকূল থাকলেও পরে তর্কচূড়ামণির যুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করে তাঁর মতের বিরোধিতা করেন। তবু তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের জনপ্রিয়তা সে-সময়ে কম ছিল না। এই জনপ্রিয়তার কথা শুনেই সম্ভবতঃ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন (২৫ শে জুন, ১৮৮৪)। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পরমহংসদেবের

সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন (৩০শে জুন, ১৮৮৪)। অবশ্য বহুকাল পরে বহরমপুর থেকে পদ্মনাথ দেবশর্মাকে লিখিত (২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫) একখানি পত্রে তর্কচূড়ামণি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস উপাধি নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের হিন্দুধর্মবিষয়ক বক্তৃতাও সেকালে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে তিনি দেখতে গিয়েছিলেন ('সাহিত্য' পত্রিকা, 'বৈঠকী' অংশ, আষাঢ়, ১৩২৮)। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের হিন্দুধর্ম পুনরুদ্ধার-প্রচেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮৯৫ খৃঃ তিনি মিস ষ্টার্ডিকে লিখেছিলেন, 'স্বামী কৃষ্ণানন্দ ইংলণ্ড আসছেন, তাই যদি হয়, তবে আমি যাঁদের পেতে পারি তাঁদের মধ্যে ইনিই হবেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী' (পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১)।

পরবর্তীকালে শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের খ্যাতি ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। একথা স্বীকার্য যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সমসাময়িক কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির দৃষ্টি গভীরভাবে আকর্ষণ করতে পারেন নি। পরমহংসদেব স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নিজে গিয়ে সাক্ষাৎ করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তিনিই দেখা করেছিলেন। শ্রীম লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। যুক্তিনিষ্ঠ ও সংশয়বাদী (agnostic) বিদ্যাসাগরের পক্ষে পরমহংসদেবের ভক্তিবাদের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরমহংসদেবের ভক্তিভাব, সরলতার দ্বারা আকৃষ্ট হলেও ভবতারিণীর সেবকের প্রতি নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মসাধক অনুরক্ত হন নি। দেবেন্দ্রনাথ পুরাণের পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁর বিপরীতপন্থী। বেন্থাম-মিল-কোঁৎ পাঠক বঙ্কিমচন্দ্র পরমহংসদেবের কথাবার্তায় বা আচার-আচরণে কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন, গভীর শ্রদ্ধা তাঁর মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। জৈবধর্মই যে জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য—বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে (বঙ্কিমচন্দ্র পরিহাসচ্ছলেই বলেছিলেন) একথা শুনে রামকৃষ্ণ পরমহংস অবাক হয়েছিলেন। শ্রীম অবশ্য লিখেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের শেষাংশ (নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব আলোচনা)

পরমহংসদেবকে শুনিয়েছিলেন। এই উক্তির সত্যতা প্রমাণসাপেক্ষ। অবশ্য 'ব্রহ্মানন্দ' কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮—৮৪) পরমহংসদেবের অনুরাগী হয়েছিলেন। উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতি ও সৌহার্দ্য ছিল। কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবের যোগ, ভক্তি, মাতৃভাবে ঈশ্বর-উপাসনা ব্রাহ্ম সমাজে প্রবর্তন করেন। পরমহংসদেবকে লোকসমাজে প্রকাশ করার কৃতিত্বও অনেকটা কেশবচন্দ্রের প্রাপ্য ('পরিচারিকা', ভাদ্র ১২৯৩)। তিনি পরমহংসদেবের কথা ও উপদেশাবলী 'মিরার', 'ধর্মতত্ত্বে' লিখে সাধারণের গোচরে আনেন। 'পরমহংসের উক্তি' নামক পুস্তিকা কেশবচন্দ্র নিজে সংগ্রহ করে প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন ('সখা' নভেম্বর ১৮৮৬)।

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে অনুরাগ সৃষ্টি করতে না পারলেও পরমহংসদেব শিক্ষিত হিন্দু সমাজের বৃহদংশের মন জয় করেছিলেন। লাল-পেড়ে কাপড়, জামা, বার্ণিশ করা জুতা পরিহিত, বাহ্যিক ফোঁটা তিলক চিহ্নবিহীন অন্তরে বৈরাগী এ মানুষটি তাঁদের মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম উদ্রেক করেছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর বেশি ছিল না। কিন্তু পারিপার্শ্বিক তুচ্ছ ঘটনা থেকে উপমা সংগ্রহ করে, গ্রাম্য উচ্চারণের মাধ্যমে তিনি যেভাবে অনর্গল হিন্দুধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন তা শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে প্রীতিকর বলে মনে হয়েছিল। বিভিন্ন শাস্ত্রের আপাতবিরোধী মন্তব্যগুলি তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় পরিস্ফুট করে তুলতেন। প্রবাদ বাক্য, রূপকথা, উপকথা, ব্যঙ্গ, হাস্যরস-মিশ্রিত তাঁর বাণীভঙ্গি ছিল মনোরম ও অপূর্ব। 'দি ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকা এ প্রসঙ্গে লিখেছিল, Facts drawn from the commonest incidents of life, familiar sights and common place details are combined and enlarged upon with such infinite sagacity and humour as suffice to suggest, as soon as you have taken your seat before him for a few minutes, that you are before no ordinary person'[২] বক্তব্য বিষয় বিশ্লেষণ করার সময় প্রসঙ্গক্রমে মধ্যে মধ্যে তিনি মধুর কণ্ঠে যে ভক্তি সংগীতগুলি গাইতেন তাঁর প্রভাবও কম ছিল না। তাঁর কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি ঔদাসীন্য শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। শুধু এগুলি নয়, যে কারণে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিও পরমহংসদেবের কাছে যাতায়াত করতেন তার সম্যক ইতিহাস এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

পরমহংসদেবের পবিত্রতা ও সারল্য ছিল আদর্শস্থানীয়। ইংরাজী শিক্ষিত যুবকেরা তাঁর পবিত্রতা ও সারল্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ব্রাহ্ম সমর্থক 'পরিচারিকা' পত্রিকার (ভাদ্র ১২৯৩) মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—'বর্ত্তমান সময়ের ঘোর বিলাসিতা নাস্তিকতা ও ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার মধ্যে ইঁহার- (পরমহংসদেবের) পবিত্র জীবন মুমুক্ষু নরনারীর আশা স্থল ছিল।' সারল্য ও পবিত্রতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নম্রতা ও বিনয়। কেউ প্রণাম করলে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-নমস্কার করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে পরমহংসদেবের পরধর্মমত সম্পর্কে উদার দৃষ্টির দৃষ্টান্ত স্বরূপ লিখেছেন—'একবার আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ বাড়ীর সন্নিকটস্থ ভবানীপুরের এক খৃষ্টীয় পাদরী আমার সাথে গেলেন। দক্ষিণেশ্বর পৌঁছিয়া যেই বলিলাম—মশায়, এই আমার একটি খৃষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন। এই কথা শুনামাত্র রামকৃষ্ণ অমনি প্রণত হইয়া মাটিতে মাথা ছোঁয়াইয়া বলিলেন, যীশুখৃষ্টের চরণে শত শত প্রণাম।' রামকৃষ্ণদেবের বৈরাগ্য ও নিষ্ঠার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী আর একটি গ্রন্থে লিখেছেন, 'অনন্যসাধারণ বৈরাগ্য, কঠোরতা ও নিষ্ঠার দ্বারা তিনি এমন এক পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলেন যা কমই দেখা যায়।[৩] তিনি যে একজন সিদ্ধপুরুষ এবং পরমার্থ সত্য লাভ করেছেন, সে বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের কোন সংশয় ছিল না।

সর্বধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর সাফল্যের আর একটি কারণ। 'যত মত তত পথ'—সব ধর্মের মধ্যে সত্য আছে বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। বৈষ্ণব, শাক্ত শৈব ভাব-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মালা-মন্ত্র জপ ও যীশুখৃষ্টের চিন্তাও করেছিলেন। যে ঘরে তিনি থাকতেন সেখানে বুদ্ধদেবের ছবির সঙ্গে জলমগ্ন পিতরের উদ্ধার-চিত্র এবং ক্রুশবিদ্ধ যীশুর পদতলে মেরী ম্যাগডলেনের চিত্রও ছিল।[৪] বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের ভেদবুদ্ধি ও বিরোধকে তিনি 'মতুয়ার বুদ্ধি' বলে নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে, ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছান যায়। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্ছে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে, হিন্দুরা একঘাট থেকে জল নিচ্ছে কলসী করে—বলছে 'জল'। মুসলমানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে, চামড়ার ডোলে করে—তারা বলছে 'পানী'। খৃষ্টানরা আর এক ঘাটে জল

নিচ্ছে—তারা বল্‌ছে 'ওয়াটার।'[৫] পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি 'ডিস্‌কভারি অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন, Essentially religious and yet broad-minded in his search for self-realization he went to Moslem and Christian mystics and lived with them for years, following their strict routines..... Indeed he brought within his fold other religions also. Opposed to all sectarianism, he emphasized that all roads lead to Rome.'[৬]

এই পরমত-সহিষ্ণুতা নিঃসন্দেহে অনেকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'সাকার', 'নিরাকার' প্রশ্নেও তিনি যে সহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তা বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। তিনি মনে করতেন, নিরাকার সত্য, আবার সাকারও সত্য। বিশ্বাসই বড় কথা। যে যার বিশ্বাস অনুযায়ী সাধনা করলে সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হবে। এ বিষয়ে তিনি দুটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। প্রথমটি হল, 'সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধরে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে যায়, আগেকার যেমন জল তেমনি জল। অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ। জলে জল।' (শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯—৩০)। দ্বিতীয় উপমাটি হল—'এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করেছেন —যার যা পেটে সয়। কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চচ্চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব করেছেন। যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয়' (শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬)। এ ধরনের মতবাদ তরুণ ব্রাহ্মমনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। রামকৃষ্ণ-ভক্ত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতেন। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তিনি সমাজে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। কারণ, রামকৃষ্ণদেবের 'সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা শুনিয়া ও ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন' (শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮০)। শিবনাথ শাস্ত্রী পরমহংসদেবের উদারতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—'রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে,

ধর্ম এক ; রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন।"[৭]

কামিনী ও কাঞ্চনের প্রতি অনাসক্তি এবং কঠোর আত্ম-সংযম শিক্ষিত অশিক্ষিত সমাজে তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এই শক্তির দ্বারা তিনি কেশবচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রখ্যাত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। কামিনী ও কাঞ্চনে অনাসক্তি থাকলেও তিনি সকলকে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে বলেন নি। তিনি জানতেন, রূপ-রস-বর্ণ-স্পর্শ-গন্ধ ভরা এ পৃথিবীতে সাধারণের পক্ষে সন্ন্যাস ব্রত পালন করা খুব কঠিন। তাই তিনি গৃহীকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা নেবার কথা বলেন নি। তিনি মনে করতেন, 'কলিতে বেদমত চলে না' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫ম ভাগ, পৃঃ ৬৯)। সাধারণ গৃহীদের জন্য তাই তিনি 'ভক্তি'র ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। ভক্তদের তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করার উৎসাহ দেন নি। তাঁর অনেক গৃহী ভক্তও ছিলেন। সংসারকে তিনি অবজ্ঞা করেন নি। রামপ্রসাদের একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করে তিনি বলতেন, সংসার ধোঁকার টাটী, আবার মজার কুটিও বটে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ৬৮)। ভক্তি-বিশ্বাসহীন ইন্দ্রিয়সর্বস্বতাকেই শুধু তিনি কটাক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, সংসারে মানুষের থাকা উচিত পাঁকাল মাছের মত— 'সংসারে থাকবে বটে কিন্তু কাদা গায়ে লাগবে না'। সাংসারিক মানুষের প্রতিও তাঁর প্রীতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। নরেন্দ্র নির্বিকল্প সমাধির জন্য পরমহংস-দেবকে উত্যক্ত করলে তিনি ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলেন, 'এই বুঝি তোমার পৌরুষ এই বুঝি তোমার আত্মগৌরব—এই বুঝি বীরত্ব। তুমি জগতের আর সকলকে ফেলিয়া নিজের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছ।' জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করা, সকলের দুঃখ-তাপ মোচন করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এটাই তাঁর মানবতাবোধ। নরেন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন 'আজ তাহার বড় আশ্চর্য বোধ হইল—যে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া ব্রহ্মভূত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহারও মুখে এ কি কথা। মানুষের সেবাকে সেও মুক্তি-সন্ধানের তুল্যই, অথবা তাহারও অধিক মূল্যবান মনে করে। অথবা তাহার মতে, সে-ই যথার্থ মুক্তি ও শ্রেষ্ঠজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে—যে জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করে না ; এ বড় অপূর্ব্ব কথা।'[৮] এই ঐহিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর জনপ্রিয়তার একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

রোগ-শোক, লোভ-লালসাগ্রস্ত সাধারণ মানুষ সংসারের মধ্যে মুক্তি আছে কি-না সেটাই জানতে চায়। রামকৃষ্ণদেব তাদেব কৌতূহল মেটাতে পেরেছিলেন। তিনি বাহ্যিক অনুষ্ঠান পছন্দ করতেন না। সন্ধ্যা, জপ, তপ তিনি শেষদিকে প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, শুধু বিশ্বাস ও ভক্তি থাকলেই যথেষ্ট, বাহ্যিক আড়ম্বরেব বিশেষ প্রয়োজন নেই। এই সহজ ব্যবস্থাও সংসারী মানুষকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

লোকাচার, জাতিভেদ, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন উদাব মতাবলম্বী। 'রামকৃষ্ণ পোষাক, পৈতে ও উপাধিকে বলেন ছেলের হাতের চুষিকাঠি। শিশু যতক্ষণ চুষি চুষে ততক্ষণ মা কোলে নেয না তাকে, কিন্তু যখনই শিশু ত্রাহি-ত্রাহি কবে কেঁদে উঠবে তখনই মা ছুটে এসে সন্তানকে কোলে টেনে নিয়ে স্তন্যদান কববেন। সরলতা, আকুলতা ও ব্যাকুলতা না হলে মাযেব কৃপা হয না।'[৯] আচাব সম্বন্ধে তিনি হাজবাকে বলতেন, 'বেশী খেয়ো না। আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবাই, তাদের জ্ঞান হয় না। আচার যতটুকু দরকার, ততটুকু করবে। বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না' ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৬)। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অভিনেত্রী বিনোদিনী প্রভৃতির সঙ্গে মেলামেশা করতেও তিনি পশ্চাদপদ হননি।

খাদ্যাখাদ্যেব বাছ-বিচার তাঁব ছিল না। অন্তরে বৈরাগী হযেও তিনি মাছ-মাংস অপছন্দ করতেন না। এদিক থেকে জাতিভেদেব নিয়ম-কানুনও তিনি মেনে চলতেন না। দিব্যোন্মাদবস্থায তিনি নীচ জাতিব রান্না খেতেন। কালী-বাড়ীতে কাঙালীদের উচ্ছিষ্টও খেযেছিলেন। তাঁব স্ব-গ্রামের এক কামারণীর হাতেব রান্নাও তিনি খেয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রের বাড়িতে লুচি, চচ্চড়ি, খেয়েছিলেন।[১০] অনেক অব্রাহ্মণ ভক্তের সঙ্গে খেতেও তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। নিজের থেলো হুঁকাটিতে তিনি নরেন্দ্রনাথকে তামাক খেতে দিয়েছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন-দর্শনে খৃষ্টধর্ম বা কেশব সেন-ব্যাখ্যাত ব্রাহ্মধর্মের মত পাপবোধ ও অনুতাপের কোন স্থান ছিল না। মানুষকে তিনি পাপী মনে করেননি। তিনি মনে করতেন, মানুষ যখন অমৃতের অংশ, তখন পাপের প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া 'পাপ', 'পাপ' বলতে বলতে মানুষ শেষ পর্যন্ত 'পাপী' হয়ে যায়। কেশবচন্দ্রের প্রতিবাদে ব্রাহ্ম-সমাজেও শিশির কুমার ঘোষের (১৮৪০—১৯১১) নেতৃত্বে এক 'আনন্দবাদী' দল গড়ে উঠেছিল (আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ১৬৮)। মানুষ নিরন্তর পাপের কথা শুনতে

ভালবাসে না। সংসার যদি এত ভয়াবহ হয়, তবে এখানে মানুষ কোন সান্ত্বনাই খুঁজে পায় না। পরমহংসদেব আনন্দমন্ত্র উচ্চারণ করে ব্রাহ্ম-অব্রাহ্ম সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও(১৮১৭—১৯০৫) কেশবচন্দ্র সেন-ব্যাখ্যাত খৃষ্টীয় পাপতত্ত্বকে স্বীকার করেননি। তিনি ছিলেন 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' মতবাদে স্বপ্রতিষ্ঠ।

আর একটি বিষয়ও শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংস অন্যান্য 'গুরু'দেব মতো 'সিদ্ধাই'দেব অলৌকিক ভোজবাজি পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন, হীনবুদ্ধি ব্যক্তিরাই 'সিদ্ধাই'চায়। রোগের উপশম করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলেব উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে চমক লাগান প্রভৃতি কার্যকলাপকে তিনি নিন্দনীয় বলে মনে করতেন।

এই-ধবণেব মতবাদের ফলে পবমহংসদেব ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন হযেছিলেন ; দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠেছিল অনেকের তীর্থস্থল। শিক্ষিত তরুণ ব্রাহ্মদেব অনেকেই বামকৃষ্ণেব প্রতি আকৃষ্ট হন। এঁদেব মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম-সমাজ ত্যাগ কবে বামকৃষ্ণদেবের শিষ্য হন। সুবেন্দ্রনাথ মিত্র, তারকনাথ ঘোষাল, শবৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সকলেই প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত ছিলেন। বামচন্দ্র দত্ত প্রথমে ছিলেন নিরীশ্বরবাদী (agnostic), পবে পবমহংসদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত হন ও তাঁব জীবনী বচনা কবেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেব প্রধান কীর্ত্তি কেশবচন্দ্রেব সাহচর্য এবং তাঁব উপব প্রভাব বিস্তার। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীব অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং তরুণ সমাজের নেতা। ১৮৭৫ খৃঃ বেলঘবিযার বাগান বাড়িতে পরমহংসদেব তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এবপব উভয়েব মধ্যে গভীর প্রীতি ও সৌহার্দ্যেব সম্পর্ক গড়ে উঠে।[১১] ১৮৭২ খৃঃ 'ব্রাহ্ম-বিবাহ বিল', ১৮৭৮ খৃঃ 'কুচবিহার বিবাহেব' ফলে কেশবচন্দ্রেব জনপ্রিযতা অনেকাংশে হ্রাস পাবাব পব তিনি যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ-ব্যাপাবে তিনি পবমহংসদেবেব দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হযেছিলেন। তাছাড়া মাতৃভাবে ঈশ্বরসাধনা, হিন্দু পৌত্তলিকতার নব ব্যাখ্যাদান এবং নববিধান (১৮৮১) প্রচাবেব মধ্যেও তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বলিলেন সকল ধর্মই সত্য এবং সর্বধর্ম সমন্বয় দেখাইবাব জন্য হিন্দুব দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির ব্যাখ্যা এবং হোম ও আহুতি, খৃষ্টীয়ের জলাভিষেক প্রভৃতি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।'[১২] শিবনাথ শাস্ত্রীর এ মন্তব্য অযথার্থ নয়। কেশবচন্দ্র নিজেও

বলেছেন, 'কখনো লক্ষ্মী, কখনো সরস্বতী, কখনো মহাদেব, কখনো জগদ্ধাত্রী— এই নানাভাবে কখনো এক নামে কখনো অন্য নামে হরিকে নিত্য নবীন বেশে দেখিব।' ১৮৮০ খৃঃ ১লা আগষ্ট 'দি সান্‌ডে মিরার' পত্রিকায় 'পৌত্তলিকতার দর্শন' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেশবচন্দ্র লিখেছিলেন: Hindu idolatry is not altogether to be rejected or overlooked. As we explained, sometime ago, it represents millions of broken fragments of Gods. Collect them together, and you get indivisible Divinity . we have found out that every idol worshiped by the Hindu represents an attribute of God, and that each attribute is called by a peculiar name. The believer in the New Dispensation is required to worship God as the possessor of all those attributes, represented by the Hindu as innumerable, or 330 millions.'[১৩]

কেশবচন্দ্র সহচর, বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও পরমহংসদেবকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। অদ্বৈতাচার্যের বংশধর হয়েও তিনি পৈতা ত্যাগ করে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলভুক্ত হয়েছিলেন। জাতিভেদের প্রশ্নে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তাঁরা 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। আবার 'কুচবিহার বিবাহে'র পর কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে তিনি 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে' যোগদান করেছিলেন। পরমহংসদেব কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। পরবর্তীকালে 'জটিয়াবাবা' নামগ্রহণ করে তিনি ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে যোগ ও বৈরাগ্যে দিনাতিপাত করেন। এই যোগসাধনায় রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য।

হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বিবেকানন্দকে আবিষ্কার এবং দীক্ষাদান। বিবেকানন্দের জীবন-সংগ্রাম, সংশয় ও অবিশ্বাস দূর করে তিনি যেভাবে তাঁকে সনাতন হিন্দু ধর্মের পথে টেনে এনেছিলেন তা সংঘাতবহুল একটি নাটকের মতোই নাটকীয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী বুদ্ধিদীপ্ত নরেন্দ্রনাথ সহজে আত্মসমর্পণ করেন নি। অনেক তর্ক-বিতর্ক, সংশয়, অবিশ্বাসের পথ অতিক্রম

করে তিনি পরমহংসদেবের শরণ নিয়েছিলেন। প্রথমে কেশবচন্দ্রের সংস্কার আন্দোলনের তিনি ছিলেন সমর্থক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। বিবেকানন্দের মধুর কণ্ঠ ও ভক্তিবাদের তিনি প্রশংসা করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেও ব্রাহ্মদের ধর্মীয় জীবন সাধনায় নরেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আস্থা হারিয়ে তিনি ধীরে ধীরে সংশয়বাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতির রচনা তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে থাকেন।[১৪] ১৮৮০ খৃঃ জেনারেল এসেমব্লি'স ইন্‌সটিটিউসনের অধ্যক্ষ মিঃ হেষ্টির মুখে রামকৃষ্ণদেবের কথা তিনি শুনেছিলেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, এই রেভারেণ্ড হেষ্টির সঙ্গেই হিন্দুধর্ম বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী যুদ্ধ হয়েছিল ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় (১৮৮২ খৃঃ অক্টোবর—নভেম্বর)। তা সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বর যাবার জন্য কোন উৎসাহ বোধ করেন নি। ১৮৮১ খৃঃ সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাসভবনে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেদিন তিনি কয়েকটি গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। প্রথম দর্শনেই পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন। দক্ষিণেশ্বর যাবার জন্যে রামকৃষ্ণদেব তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। ইতিমধ্যে সংশয় অবিশ্বাস আরো বেড়ে যাওয়ায় নরেন্দ্রনাথ মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলেন। অবশেষে রামচন্দ্র দত্তের পরামর্শে তিনি দক্ষিণেশ্বর গমন করেন। অবশ্য এর আগে একদিন অস্থির হয়ে দেবেন্দ্রনাথকে ঈশ্বর দেখেছেন কিনা তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন (Ramkrishna and his disciples—C. Isherwood, পৃঃ ১৯২)। দেবেন্দ্রনাথ নঙর্থক উত্তরদানের সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথকে সাধনা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।[১৫] তাঁর দক্ষিণেশ্বর যাত্রার এটাও একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু কলকাতার কাছে, বাস্তব জগতের কল-কোলাহলের মধ্যে কি করে সত্যিকারের ভগবদ্‌ভক্ত থাকতে পারে, এটাই ছিল নরেন্দ্রনাথের বিস্ময়ের বিষয়। পরমহংসদেবের বৈরাগ্য ও পবিত্র ভাব নরেন্দ্রনাথের মনে রেখাপাত করেছিল। 'Well, he may be mad—but this is indeed a rare soul who can undertake such renunciation. Yes, he is mad—but how pure! And what renunciation! He is truly worthy of reverence.'[১৬] পরমহংসদেবের মতবাদ গ্রহণে নরেন্দ্রনাথের পক্ষে দুটি বাধা ছিল—অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতায় দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব।

সম্ভবতঃ ব্রাহ্মসমাজ থেকেই এ সংস্কার তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংস এই অবিশ্বাসের মূল ধীরে ধীরে শিথিল করে দেন। নরেন্দ্রনাথকে জয়ের মধ্যেই হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ব্রাহ্ম মুহূর্ত সূচিত হয়। কারণ, বিবেকানন্দই 'পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়নস্'-এ (১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব এবং রামকৃষ্ণদেবের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে আক্রমণাত্মক (aggressive) হিন্দু মনোভাবকে প্রকাশ করেছিলেন তা হয়তো ভগিনী নিবেদিতাকে উদ্দেশ্য করেই লিখিত। 'গোরা'র সঙ্গে নিবেদিতার নানাদিক থেকে সাদৃশ্য আছে। নিবেদিতার মত গোরাও আইরিশ পিতামাতার সন্তান। নিবেদিতা বিবেকানন্দ-প্রচারিত হিন্দুধর্মের প্রবল সমর্থক ছিলেন। তিনি 'Aggressive Hinduism' নামে একটি বই লেখেন। 'গোরা' উপান্যাসে বর্ণিত গোরার হিন্দুধর্ম বিষয়ক বিভিন্ন উক্তি ও মন্তব্যের সঙ্গে নিবেদিতার বক্তব্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য গোরার পরিণতির সঙ্গে নিবেদিতার জীবনের সামঞ্জস্য সন্ধানে প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে নিবেদিতার গোঁড়ামি ছিল না। জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে নিবেদিতার গভীর সৌহার্দ্য ছিল।[১৭]

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উদার মতবাদের দ্বারা সকল ধর্ম সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করলেও হিন্দুধর্মের মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হননি। শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন নি। পরমহংসদেব সকলের সঙ্গে মিশে, সকলের মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েও, নিজের বিশ্বাসের প্রতি শুধু অটল ছিলেন না, অপরের মধ্যেও সেই বিশ্বাস সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল 'ভক্তি' ও 'বিশ্বাস'। উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদকে তিনিই কার্যকরভাবে আঘাত করেছিলেন। তাঁর হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্যই হল যুক্তির (Reason) বিরোধী শক্তি হিসাবে 'ভক্তির' পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অবশ্য কেশবচন্দ্র সেন যখন মিল ও কোঁতের বিরুদ্ধে বলেন এবং ভক্তি ও 'Grace'-এর প্রচলন করেন, তখন তিনিও 'Reason'-এর চেয়ে 'Faith' কে বড়ো করে দেখেছিলেন।

পরমহংসদেব বলতেন, কলিতে নারদীয় ভক্তিই সর্বসাধ্যসার। অবশ্য তাঁর ভক্তিবাদে শাক্ত-বৈষ্ণবের ভেদ ঘুচে গিয়েছিল। তিনি কখনো রাধাকৃষ্ণের পদ

গান কবতেন, পরক্ষণেই বা কালীকীর্তনের পদ। তাঁর বক্তব্যকে সুবোধ্য করবার জন্যই তিনি সংগীতেব আশ্রয় নিতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রামপ্রসাদেব সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁব বহু বিষযে মিল লক্ষ্য কবা যায়। পবমহংস-দেবের মতো বামপ্রসাদও ছিলেন ভক্তিবাদী সহজ-সাধক। সেজন্য বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজনীযতা তিনি উপলব্ধি কবেন নি। একটি পদে বামপ্রসাদ বলেছেন,—

'জাঁক-জমকে কবলে পূজা, অহঙ্কার হয মনে মনে।
তুমি লুকিযে তাঁবে করবে পূজা, জানবে নাবে জগজ্জনে॥
*　　*　　*　　*
ধাতু-পাষাণ মাটির মূর্তি, কাজ কি বে তোব সে গঠনে?
তুমি মনোমব প্রতিমা কবি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে।
আলোচাল আব পাকা কলা, কাজ কি বে তোব আযোজনে?
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাবে, তৃপ্তি কব আপন মনে।
মেষ-ছাগল-মহিষাদি কাজ কি বে তোব বলিদানে,
তুমি 'জয় কালী' 'জয় কালী' বলে, বলি দেও ষড রিপুগণে॥'

রামপ্রসাদ তন্ত্র ও জ্ঞানেব চেযে ভক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বামকৃষ্ণও তাই। বামপ্রসাদ বলেছেন—

'ষড্ দর্শনে পেলেম না, আগম-নিগম তন্ত্রসাবে।
সে যে ভক্তিবসেব বসিক, সদানন্দে বিবাজ কবে পূবে॥'

অথবা

'যেখানে আনন্দ ছটা, গুরুশিষ্য নাস্তিপাঠ
ওবে যাব নেটো তাব নাট, তত্ত্বে তত্ত্বে কে পাইবা।'

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্ম সমন্বযেব কথা বামপ্রসাদ প্রচাব কবেছিলেন।

'আমি বেদাগম পুবাণে কবিলাম কত খোঁজ-তালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমাব এলোকেশী।'

বামপ্রসাদ নিবাকাব সাধনাব কথাও বলেছেন একটি পদে—

'ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কি তাই জান না?
মাটিব মূর্তি গডিযে মন কবতে চাও তাঁর উপাসনা॥'

নিরাকাবের সঙ্গে সঙ্গে সাকারেব কথাও আছে। তাই তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়, 'সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্বাণে কি গুণ বল না।' রামকৃষ্ণ মধুর কণ্ঠে

সময়োপযুগী প্রসাদী-সংগীত গাইতেন আবার কীর্তনেও যোগদান করতেন। এই ভক্তিরসের দ্বারা তিনি বহুলাংশে কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মন জয় করেছিলেন। কেশবচন্দ্র বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন অদ্বৈতাচার্যের বংশধর। বোধ করি সেইজন্যই রামকৃষ্ণের সঙ্গে সহজেই তাঁদের অন্তরের মিল হয়েছিল। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজে খোল করতাল সহ হরিকীর্তনের প্রবর্তন করেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও ভাবাবেগে উদ্দণ্ড নৃত্য করতেন। কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ পরমহংস উভয়েই ছিলেন যুক্তিবাদ বিরোধী। কেশবচন্দ্র বেন্থামের 'হিতবাদ' (Utilitarianism) ও কোঁতের 'প্রত্যক্ষবাদ' (Positivism)-এর বিরোধিতা করেছিলেন; তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, 'The politics of the age is Benthamism, its ethics Utilitarianism, its religion Rationalism; its philosophy Positivism.'[১৮] রসবাদ থেকে লীলাবাদ, লীলাবাদ থেকে অতি সহজে গুরুবাদ ও অবতারবাদে পৌঁছান যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অবতারবাদ ও গুরুবাদে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে, অবতার যুগে যুগে আসেন, অনেক মানুষ তাঁদের চিনতে পারে না—'অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। নারদ যখন রামচন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন, রাম দাঁড়িয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কল্লেন আর বল্লেন, আমরা সংসারী জীব, আপনাদের মত সাধুরা না এলে কি করে পবিত্র হবো? আবার যখন সত্য পালনের জন্য বনে গেলেন, তখন দেখলেন, রামের বনবাস শুনে অবধি ঋষিরা আহার ত্যাগ করে অনেকে পড়ে আছেন। রাম যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তা তারা অনেকেই জানেন নাই' ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭২)। কেশবচন্দ্র অবশ্য প্রকাশ্যে অবতারবাদ স্বীকার করেন নি। ১৮৭৯ খৃঃ ব্রাহ্ম ভক্তদের সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে ষ্টীমার ভ্রমণের সময় পরমহংসদেব কেশবচন্দ্রকে 'গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব' বলতে অনুরোধ জানালে কেশবচন্দ্র নাকি হেসে বলেছিলেন, 'মহাশয়, এখন অতোদূর নয়; 'গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব' আমরা যদি বলি লোকে বলিবে গোঁড়া' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ৫ম খণ্ড পৃঃ ১০)। গুরুবাদেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছেন, 'গুরুর কাছে সন্ধান নিতে হয়। একজন বাণলিঙ্গ শিব খুঁজতে ছিল। কেউ আবার বলে দেয়, অমুক নদীর ধারে যাও, সেখানে একটি গাছ দেখবে, সেই গাছের কাছে একটি ঘুর্ণি জল আছে, সেইখানে ডুব মারতে হবে, তবে বাণলিঙ্গ শিব পাওয়া যাবে। তাই গুরুর কাছে সন্ধান জেনে নিতে হয়,'

('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ৫ম ভাগ, পৃঃ ৭২)।

যুক্তিব বিরুদ্ধে ভক্তি ও লীলাবাদের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে চমৎকাবভাবে পরিবেশন করেছেন। জগমোহন (জ্যাঠামশাই) ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) নাস্তিক। ইংবাজী শিক্ষায় শিক্ষিত শচীশ জ্যাঠামশায়ের কাছে সেই শিক্ষাই পেয়েছিল। জ্যাঠামশায়ের সাহচর্যে অল্প দিনের মধ্যে শচীশের 'মগজেব মধ্যে মিল-বেন্‌থামের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া সে যেন নাস্তিকতার মশালেব মতো' জ্বলতে লাগল। বেন্‌থামের 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখ সাধনের' নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠল শচীশ। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর শচীশেব জীবনেও পবিবর্তন আসে। লীলানন্দ স্বামীব শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, সে বস সাধনায় মগ্ন হয়। 'লীলানন্দ স্বামীব সঙ্গে কীর্তনে মাতিয়া কবতাল বাজাইয়া' পাড়া অস্থির কবে তুলল শচীশ। গুরুর মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে সে দামিনীকে বলে, 'তোমরা গুরু মান না বলিয়াই জান না যে, গুরুই আমাদের সেই হাল। সাধনাকে নিজের খেয়াল মত গডিতে চাও? শেষকালে মবিবে।' নাস্তিক শচীশ হয়ে উঠল লীলারসবাদী। 'একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম; তাব পরে আব একদিন অতি উচ্চৈঃস্ববে সে খাওয়া ছোঁওযা স্নান-তর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না।' এই উপন্যাসে আসলে ববীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছিলেন উনবিংশ শতকেব যুক্তিবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ অর্থাৎ 'Reason'-এর পথ নির্বিচার ভক্তিবাদ ও গুরুবাদে অর্থাৎ 'Faith'-এ অবসিত হল।

শচীশেব মধ্যে অংশতঃ বিবেকানন্দেব জীবন-সংগ্রামেব প্রতিফলন লক্ষ্য কবা যায়। শচীশেব মতো বিবেকানন্দও গুরুবাদ, লীলাবাদ ও পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। পববর্তীকালে জনৈক ভক্ত 'মুক্তি কিসে হয়' এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে, স্বামীজী অনেকটা শচীশেব মতোই উত্তব দিয়েছিলেন, 'গুরুসেবায়'। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনেব সঙ্গেও শচীশ চরিত্রের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। বিজয়কৃষ্ণ ইংবাজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। শচীশের মতো নাস্তিক্যবাদী না হলেও তিনি কৌলিক ধর্ম—বৈষ্ণব ভাবসাধনার প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হয়েও পরবর্তীকালে তিনি আবার হিন্দু ভক্তি-সাধনাকে অবলম্বন করেন। কেশবচন্দ্রেব মতো তিনিও পরমব্রহ্মকে কালী, কৃষ্ণ দুর্গানামে ধ্যান করতে থাকেন। গুরুবাদেও তিনি আস্থা স্থাপন কবেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামী (পরমহংস) ছিলেন তাঁর গুরু।

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁর বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতা ও গুরুবাদ সমর্থনের অভিযোগ আনলে ১৮৮৬ খৃঃ তিনি পদত্যাগ করেন। এরপর দেবদেবী দর্শন, মৃতব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্ত্তা প্রভৃতি নানা অলৌকিক কার্যকলাপে তাকে লিপ্ত হতে দেখা যায়; রোগ সারাবার জন্য ব্রাহ্মণের চরণোদক পানের ব্যবস্থাও তিনি দিতেন।[১৯]

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শুধু ভক্তিরসের প্রতিষ্ঠা করে ক্ষান্ত থাকেন নি, পাণ্ডিত্যকেও তিনি চরম আঘাত করেছিলেন। ভক্তিবাদভিত্তিক হিন্দু-জাগরণের দিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তা তিনি হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন। পাণ্ডিত্যাভিমানীদের সঙ্গে শকুনির তুলনা দিয়ে তিনি বলতেন, শকুনি যত উপরেই উড়ুক না কেন, তার নজর যেমন সব সময় ভাগাড়ের দিকে থাকে, তেমনি পণ্ডিতেরাও কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারে না। তিনি মনে করতেন, বেশি পড়াশুনার প্রয়োজন নেই—ভক্তি থাকলেই হল। 'গীতা পড়লে কি হয়? দশবার 'গীতা গীতা' বলে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা' বলতে 'ত্যাগী' হয়ে যায়। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যার ত্যাগ হয়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম বুঝেছে। গীতা সব বইটা পড়বার দরকার নাই। 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' বলতে পারলেই হলো।'[২০] এ বিষয়ে তিনি আরো বলেছেন, 'পাণ্ডিত্যে কি আছে? ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়। নানা বিষয় জানবার দরকার নাই।' এই পাণ্ডিত্যবিরোধী মনোভাবের জন্য তিনি শশধর তর্কচূড়ামণি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি কিছুটা কটাক্ষ করেছিলেন। ১৮৮৪ খৃঃ ৩০শে জুলাই শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনে পরমহংসদেব তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বলেছিলেন, 'বেদাদি অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু সাধনা না করলে, তপস্যা না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন আগম নিগম তন্ত্রসারে।··· ·পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। গুরুমুখে বা সাধুমুখে শুনলে ধারণা বেশী হয়, আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না। হনুমান বলেছিল, ভাই, আমি তিথি নক্ষত্র অত সব জানি না, আমি কেবল রাম চিন্তা করি' ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভক্তিবিহীন পাণ্ডিত্যকেও তিনি নিন্দা করেছিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎকারের সময় বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করেছিলেন, ন্যায়পরায়ণ ভগবানের

অস্তিত্ব যদি থাকতো,তবে মানুষের মধ্যে শক্তির এই বৈষম্য কেন ? পরমহংসদেব এ মনোভাবের নিন্দা করে পরে বলেছিলেন, 'বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্তু এমন কাঁচা কথা বলে ফেল্লে. তিনি কি কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ? কি জানো, জালে প্রথম প্রথম বড বড মাছ্ পড়ে, রুই কাত্লা। তারপর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন চুনোপুটি, পাঁকাল এই সব মাছ্ বেরোয়, একটু দেখতে দেখতে ধরা পড়ে। ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশ: ভিতরের চুনোপুটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে ?' ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৮)।

পরমহংসদেব তর্ক-প্রশ্নহীন জলন্ত বিশ্বাসের দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—'বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই। (কেদারের প্রতি) বিশ্বাসের যত জোর তা তো শুনেছ ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হল, কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে পড়ল। তার আর সেতুর দরকার হয় নাই' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬)। একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, পরমহংসদেব বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা, বিভিন্ন ধর্মের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করলেও সনাতন হিন্দুধর্মের মূল নীতি থেকে বিচ্যুত হন নি। 'যত মত তত পথ' কথাটি পরমত-সহিষ্ণুতার দিক থেকে প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব অন্যান্য ধর্মাদর্শের চেয়ে হিন্দুধর্মকেই শ্রেষ্ঠ এবং সনাতন বলে মনে করতেন। 'হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম। ইদানীং যে সকল ধর্ম দেখছো, এসব তাঁরই ইচ্ছাতে হয়ে যাবে—থাক্‌বে না। তাই আমি বলি, ইদানীং যে সকল ভক্ত, তাদেরও চরণেভ্যো নমঃ। হিন্দুধর্ম বরাবর আছে আর বরাবর থাকবে' ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৭)।

'সাকার' 'নিরাকরের' প্রশ্নেও তিনি 'সাকার' সাধনাকে পরোক্ষভাবে উৎকৃষ্ট বলেছেন। তিনি নিজে ছিলেন সাকারবাদী। কালীমূর্তিকে তিনি শুধু ধ্যান করতেন না—মাতৃরূপে তাকে আবার প্রত্যক্ষও করতেন. নিরাকার সাধনাকে তিনি খুব কঠিন এবং সর্বজনগ্রাহ্য নয় বলে অভিমত প্রকাশ করে ছিলেন ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৭)।

হিন্দু জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদের তিনি একজন সমর্থক ছিলেন। জনৈক ভক্তকে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'হাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে।

ঈশ্বরের কার্য আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝবো, অনেকে বলে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না' ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম খণ্ড, : ৮২)। জনৈক তান্ত্রিক ভক্তের সঙ্গে কথোপকথনের সময় কর্মফলবাদ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'তান্ত্রিক ভক্ত—তবে কর্মফল আছে? শ্রীরামকৃষ্ণ—তাও আছে। ভাল কর্ম করলে সুফল, মন্দ কর্ম করলে কুফল ; লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে না? এসব তাঁর লীলা-খেলা' ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫৮)।

সমস্ত ধর্মীয়-সাধকদের মতো পরমহংসদেবের জীবনেও অলৌকিক অতীন্দ্রিয় কার্যকলাপের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। তিনি মাঝে মাঝে ভক্ত-শিষ্যদের ভূত ভবিষ্যৎ অবস্থা দর্শন করতেন। অতীত ও বর্তমানের সব চিত্র নাকি তাঁর মনের কোণে ভেসে উঠত। নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেই নাকি তাঁকে তাঁর কার্যে সহায়তাকারী গ্রহান্তরের ঋষি বলে চিনতে পেরেছিলেন। ইশারউড (Isherwood) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'Ramkrishna also described a vision—one of those which, as he said, were confirmed by the answer Naren had given him His mind, while in samadhi, had ascended through the world of gross matter into the subtle world of ideas, and thence to what he described as 'the fence made of light' which separates the divisible from the indivisible. Beyond this fence, even the Gods and Goddesses could not penetrate, because form ceased there. Nevertheless, within the realm of the indivisible, Ramkrishna saw even sages, whose bodies were made only of the light of pure consciousness...... As Ramkrishna watched he saw a something shape itself out of the undifferentiated light, and this something took the form of a child... 'I am going down there', the child said to the sage, 'and you must come with me.' 'And, Ramkrishna added, after telling this to his disciples, 'hardly had I set eyes on Naren

for the first time when I knew he was that sage.' When they questioned Ramkrishna further, he admitted that the child in the vision had been himself.'[২১]

তাঁর স্পর্শে অনেকের জীবনধারা পরিবর্তিত হতো বলে জীবনীকারেরা উল্লেখ করেছেন। রোমাঁ রোলাঁ সংশয়বাদী নরেন্দ্রনাথের এ রকম এক আশ্চর্য অনুভূতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'আমি গিয়া দেখিলাম, তিনি একটি ছোট বিছানায় একাকী বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন এবং আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া বিছানার এক পাশে বসাইলেন। কিন্তু এক মুহূর্ত বাদে দেখিলাম, তিনি আবেগে কম্পিত হইতেছেন, তাহার দুই চোখ আমার উপর নিবদ্ধ। তিনি নিরুদ্ধ নিশ্বাসে অস্ফুট কণ্ঠে কথা কহিতে কহিতে আমার আরো কাছে সরিয়া আসিলেন। ভাবিলাম, আগের বারের মতোই পাগলামিপূর্ণ কোনো মন্তব্য করিবেন বুঝি। কিন্তু আমি কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি আমার দেহের উপর তাঁহার ডান পা রাখিয়া দিলেন। কি ভয়ংকর সে স্পর্শ। আমি চক্ষু চাহিয়াই দেখিলাম, ঘরের দেওয়াল এবং ঘরের মধ্যকার সমস্ত বস্তু আবর্তিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে শূন্যে মিলাইয়া গেল। আমি ভীত হইলাম, মনে হইল, আমি মৃত্যুর মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।'[২২]

এই অলৌকিক কার্য-কলাপের ফলে তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিক, কিন্তু তাঁর সাফল্যের মূলে ছিল লোকচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের শুদ্ধতা ও নিষ্কাম কর্ম। তিনি অতি সতর্কতার সঙ্গে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, চরিত্রবান ও বলিষ্ঠ যুবকদের মধ্য থেকেই শিষ্যদের বাছাই করেছিলেন।[২৩] এঁরাই পরবর্তীকালে তাঁর বাণী দেশে দেশে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের পবিত্রতা, সংযম-নিষ্ঠাও জনচিত্তজয়ে কম কার্যকরী হয় নি। পরমহংসদেব বুঝেছিলেন, বুদ্ধিদীপ্ত, ত্যাগী ও কর্মনিষ্ঠ এক-দল ভক্ত তৈরী করতে পারলে তারাই ভারতে হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেদিক থেকে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টি বা সংগঠন অনেক বেশি কার্যকরী। সেজন্য বক্তৃতার সাহায্যে ধর্মোদ্ধার প্রচেষ্টাকে তিনি সমর্থন করতেন না। শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের প্রচারকার্য এ কারণে তাঁর সমর্থন লাভ করেনি। শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের আদর্শনিষ্ঠ কোন শিষ্যমণ্ডলী ছিল না। সেজন্য তাঁদের বাণী ও প্রচারকার্য জনচিত্তে

বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। আব একটি কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, পরমহংসদেব ছিলেন যেন সাধারণ লোকের জন্য ধর্মের ভাষ্যকার। শাস্ত্র ও অধ্যাত্মতত্ত্বের দুরূহ ব্যাখ্যাকে জনগণের ভাষায় প্রকাশ করে তিনি একটি সহজ, সরল সমাধানের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র কেউ সাধারণের মনে এরকম সাড়া জাগাতে পারেন নি। রামমোহন ছিলেন বেদান্তবাদী। তাঁর যুক্তিসর্বস্ব বেদান্ত ব্যাখ্যায় ভক্তির স্থান ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রহ্মোপসনায় জ্ঞান, যুক্তির চেয়ে ভক্তি নিষ্ঠা প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন নিবাকারেব উপাসক। নিরাকাব-বাদী কেশবচন্দ্রের মধ্যেও ভক্তি সাধনা বেশ প্রবল ছিল। তিনি বিভিন্ন ধর্ম থেকে ভাব সংগ্রহ করে যে 'নববিধান' বা ধর্মসমন্বয় করেছিলেন, কৃত্রিমতার জন্য তা লোকচিত্তে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করেনি। এর চেয়ে পরমহংসদেবের "যত মত তত পথ" ব্যাখ্যাটি অনেক বেশি কার্যকবী হয়েছিল। নিরাকারবাদ সে যুগে যেমন সকলেব মন জয় কবতে পারেনি, তেমনি শাস্ত্রসর্বস্ব হিন্দুধর্মও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে নি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় পাবিবারিক, সামাজিক ও আচার বিষযক প্রবন্ধ লিখে শাস্ত্রনির্ভর হিন্দুধর্মকে কিছুটা নতুন দৃষ্টিতে দেখতে ও তাকে প্রতিষ্ঠা কবতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব হিন্দধর্ম ব্যাখ্যা যুক্তি-নির্ভব কোঁৎ ও মিলের দ্বাবা প্রভাবান্বিত এবং তা তাঁর একান্ত নিজস্ব। রামকৃষ্ণ পবমহংসদেবই দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠতে পারলে ছাদ, সিঁড়ি ও নিম্নতল সব এক বস্তু বলে নিমেষে অন্তরগোচর হয়। এই কারণেই সমস্ত বিরুদ্ধ ভাবধারা তাঁর মধ্যে সমন্বিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন গৃহী, কিন্তু গৃহস্থ নন; সাধক, কিন্তু তান্ত্রিক নন। সাকারবাদী কিন্তু নিবাকারবিরোধী নন; বেদ-বেদান্তেব প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু শুষ্ক আচাববাদী নন।

শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১—১৯২৮)

প্রখ্যাত বক্তা এবং হিন্দু-পুনরুজ্জীবনের অন্যতম পথিকৃৎ শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ১২৫৭ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ ফরিদপুর জেলার মুখডোবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হলধর বিদ্যামণি মহাশয় ছিলেন কাশ্যপগোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক বংশ সম্ভূত। তাঁর পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস ছিল পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজের প্রধান কেন্দ্র কোটালিপাড়ায়। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের জন্মস্থান মুখডোবা পদ্মার শাখানদী আড়িয়াল খাঁর ভাঙ্গনে অন্তর্হিত হলে হলধর বিদ্যামণি মহাশয় পরাণপুর গ্রামে বাস করতে আরম্ভ করেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই বংশ বহু স্মরণীয় পণ্ডিতের আবির্ভাবেধন্য। এঁদের মধ্যে গীতার সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার মধুসূদন সরস্বতী, ন্যায়াচার্য জগদীশ তর্কালঙ্কার, 'অশেষ ষড়দর্শন দর্শনাত্মা' শ্রীদাম মিশ্র অন্যতম। তাঁর জননী বিশ্বেশ্বরী দেবী ছিলেন বুদ্ধিমতী এবং সাত্ত্বিক ভাবাপন্না। তর্কচূড়ামণি মহাশয় তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বিক্রমপুরবাসী বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর কাছে কলাপ ব্যাকরণ এবং বিক্রমপুরের সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কারের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সময় মাত্র ২১ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এক বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব তার উপর এসে পড়ে। সেইজন্য টোলের নিয়মিত পাঠ তাঁকে বন্ধ করতে হয়। এই সময় (১২৮০ বঙ্গাব্দে) তিনি কাশিমবাজারের জমিদার অন্নদাপ্রসাদ রায়ের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হন। রায় মহাশয়ের বিখ্যাত গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করে তিনি ন্যায়শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অন্নদাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁকে কাশী যেতে হতো ; কাশীতে তিনি বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর গুরুভ্রাতা প্রখ্যাত দার্শনিক বিশ্বরূপ স্বামীর কাছে উপনিষদ অধ্যয়ন করেন।

হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা ছাড়াও তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, তাহেরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় এবং উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্মরণীয় ব্যক্তিগণ 'ধর্মমণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালের সুপ্রসিদ্ধ 'ভারতধর্ম মহামণ্ডলে'র বীজ এখানেই নিহিত ছিল। সেই ধর্মমণ্ডলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রক্ষা প্রধান কর্তব্য রূপে

নির্দিষ্ট হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বার্ষিক ৫০ টাকা হিসাবে ১০টি বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ছিলেন এই বৃত্তি-ভোগীদের অন্যতম।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় অনেকগুলি গ্রন্থও লিখেছিলেন। এর মধ্যে 'শ্রাদ্ধাঙ্গ বিবেক', 'ধর্মব্যাখ্যা', 'সাধন প্রদীপ', 'ভবৌষধ', 'দুর্গোৎসব পঞ্চক', 'ভক্তি সুধালহরী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষ জীবনে তিনি 'চূড়ামণি দর্শন' নামে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু এক হাজার পৃষ্ঠা লেখার পর তিনি গ্রন্থটি শেষ করতে পারেন নি। এই গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব ও মানব-শরীর গঠন ব্যাখ্যা করবার জন্য তিনি বৃদ্ধ বয়সে পাশ্চাত্য শারীর-বিজ্ঞান (Physiology And Anatomy) বিষয়ক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এ-সম্বন্ধে আরো জ্ঞান আহরণের জন্য তিনি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শব-ব্যবচ্ছেদ দেখতে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। ('ব্রাহ্মণ সমাজ' পত্রিকা—১৩৩৪ সন)

হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা করে তিনি সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর আন্দোলনের ধারাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী 'কমল কুটিরে' কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার প্রায় ৬ মাস পরে কলেজ স্ট্রীটে ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি থেকে বিদায় নেবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়া-মণিকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আজ আমার খুব ভাল দিন। আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম।' এটা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে জুনের কথা। এর কিছুদিন আগে (মে মাসের মাঝামাঝি) পণ্ডিতপ্রবর বারাণসীর 'আর্যধর্ম প্রচারিণী সভার' প্রতিনিধি হিসেবে কলকাতায় আসেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। ২৫শে মে ১৮৮৪ তারিখের 'সাধারণী'র সংবাদে দেখা যায়, 'বারাণসীর আর্যধর্ম প্রচারিণী সভার প্রতিনিধিস্বরূপ পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি কলিকাতায় আসিয়াছেন, তিনি প্রকৃত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ব্যবস্থা এবং বক্তৃতা করিবেন।' হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য বাংলাদেশ তখন রীতিমত সরগরম। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ সরলভাবে হিন্দুধর্মের যে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন তা শিক্ষিতগোষ্ঠী এবং জনসাধারণ উভয়ের মনে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। বক্তৃতা-সভা, সংবাদপত্রের বিভিন্ন প্রবন্ধে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের চিত্র এঁকে প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল। সংবাদপত্রে তার বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছিল।

—বিজ্ঞাপন—

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় চিত্রাবলী।

সাধারণের হৃদয়ে ধর্মভাব উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে এবং ভারতে চিত্রকার্যের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত করিবার আশয়ে কলিকাতা আর্ট ষ্টুডিওর অনুষ্ঠাতাগণ, আগামী জানুয়ারী মাস হইতেই মাসে মাসে এক একখানি করিয়া সুরঞ্জিত চিত্র প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছেন।[১]

শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেজন্য হয়তো তাঁর মধ্যে শক্তি সঞ্চারের জন্য পরমহংসদেব সচেষ্ট হয়েছিলেন। কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর ফেরার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ চূড়ামণি মহাশয়কে দক্ষিণেশ্বর যাবার আমন্ত্রণ জানান। 'ঠাকুরের আদেশে বলরাম (বসু) শশধরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। পণ্ডিত হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া লোকশিক্ষা দিতেছেন। তাই কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভিতরে শক্তিসঞ্চারের জন্য এত উৎসুক হইয়াছেন?'[১] 'দ্বিতীয়ার চাঁদ' পণ্ডিত শশধরের এই সমৃদ্ধির অনেক কারণ আছে। সে যুগের বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ এবং যুগপটভূমি এ-বিষয়ে অনেকটা সহায়ক হয়েছিল। সেগুলিকে এই সূত্রে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। প্রধানতঃ, অষ্টাদশ ও উনিশ শতকীয় ইউরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে নব্য-শিক্ষিত যুবকদের মনে একদা যে ভাববিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল, শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলাদেশে তা অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ বিরোধও এজন্য কম দায়ী নয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সামাজিক সংস্কারের দিকে কোন সময় প্রবল ঝোঁক দেন নি। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন খৃষ্ট-উক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভিক্টোরীয় সামাজিক সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর 'ভারত-সংস্কারক সভা' স্থাপন করেন। এই সভা মদ্যপান নিবারণ, স্ত্রী-জাতির উন্নতি সাধন, স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার, শ্রমজীবী কল্যাণ এবং 'সুলভ সমাচার' প্রকাশের ব্যবস্থা করে। কেশবচন্দ্রের খৃষ্টপ্রীতি এবং খৃষ্টীয় পাপতত্ত্ব সমর্থন ব্রাহ্মসমাজে এবং বাইরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। শেষ জীবনে তিনি সহজ জ্ঞান (Intuitive knowledge) ও চৈতন্যভক্তির যে পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে অনেকের মতে ব্রাহ্ম-সমাজের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন রাজভক্ত (Loyalist)। 'রাজার শান্তি ও মঙ্গলের জন্য তিনি প্রার্থনা করতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ছিল রাজবিরোধী

(Anti-Loyalist), সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং আরো অনেকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিপ্লব মন্ত্র প্রচার করেছিলেন।

এসব কারণে ব্রাহ্ম সমাজ ত্রিধা-বিভক্ত হয়ে গেল। 'ব্রাহ্ম বিবাহ বিল', (১৮৭২), 'কুচবিহার বিবাহ' (১৮৭৮), 'ভারত আশ্রম' সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা লোকচক্ষে কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজকে কিছুটা হেয় প্রতিপন্ন করেছিল। এমন কি, যে ইংরেজি শিক্ষিত যুবসমাজ মনে মনে ব্রাহ্ম মতবাদ এবং ব্রাহ্ম সামাজিক আদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন তাদেরও একাংশের নানা কারণে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ হ্রাস পেল। কারণ, অনেকেই সমাজচ্যুতির ভয়ে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে পারতেন না। এই স্ব-বিরোধী ভাবের জন্য মনে মনে তাঁরা যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করতেন। এই দ্বিধা মানুষকে নিয়ে যায় স্ব-বিরোধিতার পথে। লৌকিক তথা সামাজিক ক্ষতির ভয়ে যে সত্যকে বরণ করতে সঙ্কোচ বোধ হয়, ক্রমে নিজের অলক্ষ্যে মানুষ সেই সত্যের বিরোধী হয়ে উঠে। তাছাড়া, একশ্রেণীর ব্রাহ্মের মনে আত্মাভিমানও প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। এই শ্রেষ্ঠত্বাভিমান অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মনে আঘাত দেয়। কেশবচন্দ্র যখন সমাজকে পাপপঙ্ক থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেন, তখন এক শ্রেণীর (যদিচ অল্পসংখ্যক) ব্রাহ্ম নব-নারী অবনতির পথে পা বাড়িয়েছিল। স্বাধীন মেলামেশার সুযোগের অপব্যবহার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুত্রবধূর অল্প বয়স্কা ভগ্নীকে বিবাহ (১১ই জুলাই, স্টেটসম্যান পত্রিকা) প্রভৃতি ঘটনায় অনেকেই বিক্ষুব্ধ হন। প্রগতিশীল সমাজের একাংশের এ-ধরণের আচরণের ফলে 'হিন্দু পুনরুজ্জীবন' আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যদিও হিন্দু সমাজে কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, বিধবাবিবাহ বিরোধিতা প্রভৃতির জন্য অনাচার অনেক বেশী ছিল, তবুও কলকাতার রঙ্গমঞ্চে ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকার জীবন-নাট্যই কুৎসা প্রচারের বাহনরূপে অধিক পরিমাণে অভিনীত হতো। অমৃতলাল বসুর 'বাপিকাবিদায়'-এর মতো অনেক নাটকে ব্রাহ্ম বিরোধিতার নামে প্রকৃতপক্ষে প্রগতিশীলতাকেই ব্যাহত করা হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, অনেক সংবাদ ও সাময়িক পত্রও হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিল। 'প্রচার' (১২৯১), 'নবজীবন' (১২৯২), 'সাধারণী' (১২৮০), হিন্দু-গৌরবকে জাগাবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। 'সাধারণীর'

'সংবাদ' শীর্ষক রচনাগুলিতে মাঝে মাঝে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করা হতো।[৩] পরে 'বঙ্গবাসী' (১২৮৮) এ বিষয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কয়েকজন যুবক 'আলোচনা' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১২৯১)। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮—১৯৩৭) ও অবলা বসু এজন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

তৃতীয়তঃ, এযুগে অনেক রক্ষণশীল হিন্দু নিজেদের চরিত্র ও প্রতিভাবলে সমাজে বিশেষ সম্মান অর্জন করেছিলেন এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সংস্কার-বিরোধী ছিলেন না। রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪—১৮৬৭) ধর্ম-সভার সভা হলেও তিনি আশুতোষ দেবের মতো ততটা গোঁড়া ছিলেন না। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং বাঙ্গালায় নারী-শিক্ষাপ্রসারে তাঁর অবদান বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭—৯৪) চারিত্রিক মহত্ত্বের জন্য সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁর মধ্যে হিন্দু ধর্মের আস্ফালনের থেকে যুক্তি নিষ্ঠা প্রবল ছিল। 'হিন্দু-ব্রাহ্ম' রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' এবং 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব প্রভৃতি ব্যক্তিদের সমর্থন ও সংবর্ধনা লাভ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রকে বেদবাক্য বলে স্বীকার করেন নি। শাস্ত্রীয় বচনের পরিবর্তে তিনি দেশাচারকে অমান্য করা সংগত মনে করেন নি। আবার বিদ্যাসাগর মহাশয় 'কদাচ দেশাচারের দাস নহি' বলে দেশাচারকে বর্জন করেছিলেন। নবীনচন্দ্র সেন 'হিন্দু পুনরুত্থান'কামী হলেও ব্রাহ্মণ্যমত বিরোধী ছিলেন। সেজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে ব্রাহ্মণ বিরোধী করে এঁকেছেন। বুদ্ধ, চৈতন্য ও মহম্মদ সম্বন্ধেও তিনি গ্রন্থ লিখেছিলেন। উদার, সর্বজনীন ধর্মই তিনি অনুসরণ করেছিলেন। হিন্দুধর্মের মধ্যে এই উদারতার বীজ তিনি দেখেছিলেন। 'খৃষ্ট' গ্রন্থের 'সূচনা' অংশে এ প্রসঙ্গে তিনি যা লিখেছেন তা স্মর্তব্য। 'ভারতীয় আর্য্য ধর্মাবলম্বীরা কোন ব্যক্তি বিশেষের ধর্মমত অনুসরণ করেন না। অতএব তাঁহাদের ধর্মের নাম নাই। তাহার একমাত্র প্রকৃত নাম মানব-ধর্ম। সত্যই ইহার প্রাণ, মনুষ্যত্ব ইহার লক্ষ্য। মনস্বী মানব মাত্রই ইহার শিক্ষক, সর্ব অবস্থার মানবই ইহার অধিকারী।… … কৃষ্ণোক্ত অবতার-তত্ত্বানুসারে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য সকলই আর্য্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে অবতার স্বরূপ পূজনীয়।'

অন্যদিকে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কুচবিহার বিবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে

'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে' যে ভাঙ্গন ধরে তাতে কেশবচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বিশেষ ক্ষুন্ন হয়। এর তিন বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সামান্য কারণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিস থেকে পদচ্যুত হয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ভেরী বাজিয়ে বাঙ্গালী তরুণসমাজের সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'ব্রাহ্ম সমাজ খাদে হইতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু দেশের শিক্ষিত লোকের মনে নূতন স্বাধীনতার প্রেরণা ক্ষীণ হইল না। ইহা ক্রমে নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। এই প্রবাহের ভগীরথ হইলেন সুরেন্দ্রনাথ।'[৪] উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের মনে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। কিন্তু পরে ব্রিটিশ-শাসক-গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘর্ষে তাঁদের মোহভঙ্গের সূচনা হয়। ফলে তাঁদের একটা অংশ ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আলাদা, স্বতন্ত্র বলে ভাবতে চাননি। পরাধীনতার ক্ষোভ এক ধরনের 'জাতীয়' চেতনার সৃষ্টি করল। তার ফলে জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি এক ধরনের গর্ববোধ জেগে উঠল। এই গর্বের বাড়াবাড়ির ফলে সেদিনের বাঙ্গালী-সমাজের একাংশ বিদেশের সব কিছুকেই যে শুধু অস্বীকার করবার কথা ভাবতে লাগলেন তা নয়, নিজেদের জীর্ণ সামাজিক সংস্কার ও প্রতিষ্ঠান এবং প্রথাগত ধর্মাচারকেও সমর্থন করলেন নির্বিচারে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই শাসক শাসিত বিদ্বেষকে আরো বাড়িয়ে তুলল। কারণ, এই সময় প্রস্তাবিত ইলবার্ট বিলে দেশী বিচারকদের দ্বারা শ্বেতাঙ্গদের বিচার করার অধিকার দেওয়ার কথা ঘোষিত হলে ইউরোপীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জনসমাজ ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বিহারীলাল গুপ্ত প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি এদেশীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের অসুবিধার কথা উল্লেখ করে সরকারের কাছে লিপি পাঠাবার পরেই 'ইলবার্ট বিল'টি আনীত হয় এবং তার ফলেই ইউরোপীয়দর আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই প্রস্তাবিত বিলের উপর আলোচনা শুরু হবার আগেই ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার টাউন হলে ইংরাজ ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা একটি সভা আহ্বান করে তাদের সংগ্রামের কথা ঘোষণা করেন। বাকল্যাণ্ড তাঁর 'Bengal Under the Lieutenant Governors' গ্রন্থে এ-দিনের সভার কার্যবিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, The room was crowded and no one who was present can ever forget the scene. The

speakers were cheered again and again, and the utmost unanimity and determination to resist the measure were exhibited,' সভায় কয়েকটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। জে এইচ. এ. ব্রান্‌সন ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তিনি এই প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে হিন্দুর ধর্মগত আচার-ব্যবহার, সমাজ-ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেন। ঢাকায় এ-বিষয়ে তিনি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, এই বক্তৃতা এতই জাতিবিদ্বেষ-মূলক হয়েছিল যে, তখন শ্রেণী-বিদ্বেষসৃষ্টি ফৌজদারীতে দণ্ডনীয় বলে দণ্ডবিধিতে যদি উল্লিখিত থাকতো তবে ব্রান্‌সনের নিশ্চয়ই শাস্তি হতো। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরাও এই আন্দোলনে ইংরাজদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তারা সমগ্র দেশে অনেকগুলি 'প্রতিরোধ সংস্থা' গড়ে তুলেছিল। নিজেদের স্বার্থ এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি বজায় রাখার জন্য তারা দেড়লক্ষ টাকাও সংগ্রহ করেছিল।[৫] ইংরাজ জনসাধারণ এ ব্যাপারে এতই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে, তারা সরকারী অনুষ্ঠানে যোগদানে বিরত ছিল। গভর্ণর জেনারেল রিপনকেও অপমান করা হয়েছিল। ১৮৮৩—৮৪ খৃষ্টাব্দের শীতকালে তিনি কলকাতায় এলে কিছু সংখ্যক ইংরাজ এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এদের পরিকল্পনানুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, গভর্ণর-প্রাসাদের সান্ত্রীদের কাবু করে গভর্ণর জেনারেলকে চাঁদপাল ঘাটে অবস্থিত একটি জাহাজে তুলে দেওয়া হবে। এই জাহাজ তাকে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইংলণ্ডে নিয়ে যাবে।[৬]

এই ষড়যন্ত্র কার্যকরী না হলেও, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 'ইলবার্ট বিল' যেভাবে আইনে পরিণত হয় তাতে ইংরাজদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল। দেশী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের বিচারের সময় ইউরোপীয় জুরি নিয়োগের যে ব্যবস্থাকে আইনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, তাতে প্রকৃত পক্ষে এদেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটদের কোনো ক্ষমতাই আর রইল না। স্যার জন ষ্ট্রাচি এ প্রসঙ্গে যা লিখেছেন ('India,' Edition, 1894) তা প্রণিধানযোগ্য—'Act III of 1884 extended rather than diminished the privileges of European British subjects charged with offences, and left their position as exceptional as before...'

হিন্দু সমাজ এ আন্দোলনে প্রথমে বিভ্রান্ত পরে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। শিক্ষিত হিন্দু সমাজ ইংরাজ-চরিত্রের আসল রূপটি ধরতে পারলেন। তাঁদের মনে

তখনো সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির ঘটনাটি জীবন্ত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'A Nation in Making' গ্রন্থে এ-বিষয়ে লিখেছেন, 'The educated community, restive and uneasy, swayed by the feelings evoked by the Ilbert Bill controversy and perhaps not unmindful of my own public services, shared the general indignation.' বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ ঢাকায় ব্রানসনের উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্মমত এবং আচার ব্যবহারের এরূপ প্রকাশ্য নিন্দা হওয়ায় এর প্রত্যুত্তরস্বরূপ হিন্দু ধর্মের সবই ভাল এরকম একটি সংস্কার শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে নতুন করে জন্মাতে লাগল। কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 'নেভার—নেভার' শীর্ষক ব্যঙ্গ কবিতায় (১৮৮৩ খৃঃ) ইউরোপীয়দের আন্দোলনের প্রকৃত রূপটি ধরিয়ে দিলেন।"

'ইলবার্ট বিল'কে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশে যখন তুমুল আলোড়ন চলছে তখন হাইকোর্টের বিচারপতি নরিসের সমালোচনার জন্য ১৮৮৩ খৃঃ, ৫ই মে সুরেন্দ্রনাথের ২ মাস জেল হয়, বিচারপতি নরিস ইউরোপীয়দের সপক্ষে যোগ দিয়ে 'ইলবার্ট বিল' সংক্রান্ত আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আদালতে শালগ্রাম শিলা সম্পর্কে তিনি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন। এই ঘটনার পর সমস্ত বাংলাদেশ ইংরাজ-বিদ্বেষে মেতে উঠে। ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন'ও এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। 'Mr. Justice Norris is determined to set the Hughly on fire The last act of Zuberdusti on his lordship's part was the bringing of a Salagram a stone idol, into Court for identification. There have been many cases both in the late Supreme Court and the Present High Court of Calcutta regarding the Custody of Hindu idols, but the Presiding deity of a Hindu household never before this the honour of being dragged into Court. Our Calcutta Daniel looked at the idol and said that it could not be a hundred years old. So Mr. Justice Norris is not only versed in Law and Medicine, but it also a connoisseur of Hindu idols. It is

difficult to say what he is not. Whether the orthodox Hindus of Calcutta will tamely submit to their family idols being dragged into Court is a matter for them to decide, but it does seem that some public steps should be taken to put a quietues to the wild eccentricities of this young and raw dispenser of Justice.'[৮] .... এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, সুরেন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্ম সমাজের আওতায় ছিলেন। তাঁর পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত। তা সত্ত্বেও ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই দণ্ড ভোগের পর মুক্তিলাভ করে স্বদেশবাসীদের দ্বারা তিনি 'defender of faith' বা 'হিন্দুধর্মের রক্ষক' বলে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি এ কথা লিখেছেন।

'ইলবার্ট-বিলে'র আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস প্রভৃতি ঘটনায় দেশের আবহাওয়া যখন উত্তপ্ত, তার কিছুদিন পূর্বে (১৮৮২ খৃঃ মার্চ) 'থিওসফিকাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল অল্‌কট্ কলকাতা আসেন। এর পূর্বে আমেরিকায় তিনি বিচিত্র জীবন যাপন করেন। সেনাবাহিনীর অফিসার, 'ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কনভেনসন'-এর সম্পাদক, 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় কৃষি-বিভাগীয় সম্পাদক, বিভিন্ন পানশালার তিনি সদস্য ছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ রুশীয় মহিলা মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর কর্নেল অল্‌কটের সংস্পর্শে আসেন, উভয়ে মিলিত হয়ে ১৮৭৫ খৃঃ আমেরিকায় 'থিওসফিকাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৯ খৃঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী কর্নেল অল্‌কট্ ও মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করেন। কর্নেল অল্‌কট্ যদিও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন তবু হিন্দু ধর্মের অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস ও অলৌকিকতাকে তিনি নতুনভাবে জগতের কাছে প্রচার করেছিলেন। ব্লাভাট্‌স্কি ও অল্‌কট্ প্রচার করেছিলেন, হিন্দুধর্মের বিশ্বাসগুলির মধ্যে গভীর সত্য নিহিত আছে, এজন্য হিন্দুধর্ম বিশিষ্ট আসন দাবী করতে পারে। মৃত ব্যক্তিকে পুনঃদর্শন, মৃত ব্যক্তির হস্তলিপির সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করা, তিব্বতীয় মহাপুরুষদের সঙ্গে সংযোগ, হৃতদ্রব্যের পুনরুদ্ধার, দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা প্রভৃতি 'থিওসফিষ্ট' কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিন্দুধর্ম থেকেই এগুলি তাঁরা পেয়েছিলেন বলে দাবী করতেন। তাই তাঁরা হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ব্লাভাট্‌স্কি-শিষ্যা এ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭—১৯৩৩) প্রচার করতেন,

ইউরোপীয়দের তুলনায় হিন্দুরা কোন অংশে ক্ষুদ্র নয়। ইউরোপ ভারতবর্ষ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে ('Function of New India'-বক্তৃতা)। বিদেশীদের মুখে এই প্রশংসাবাণী শুনে হিন্দুসমাজ গৌরববোধ করল। তারা যেন আবার আত্মশক্তি ফিরে পেল। এজন্য ১৮৮২ খৃঃ কর্নেল অলকট্ কলকাতায় এলে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়েছিল (supplement to the Theosophist—May, 1882)। এই উপলক্ষে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র ও একদা ইয়ংবেঙ্গলের সদস্য প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—১৮৮৩) কর্নেল অলকট্‌কে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলেছিলেন—'I welcome you most heartily and cordially as a brother. Although you are of American extraction, yet, in thought, in sympathy, aspirations, and spiritual conception, you are a Hindu, and we therefore, look upon you as a brother in the true sense of the word ·· It is for the promotion of the truly religious end that you, brother, and that most exalted lady, Madame Blavatsky, at whose feet I feel inclined to kneel down with grateful tears, have been working in the most saint-like manner, and your reward is from the God of all perfection.'[৯] । অতীন্দ্রিয় ও অতিলৌকিক অনুভূতির জন্য 'থিওসফিস্টরা' স্বাভাবিকভাবে যুক্তিবাদ-বিরোধী ছিলেন। ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ফলে যে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা বাংলাদেশের শিক্ষিতসমাজে দেখা দিয়েছিল, 'থিওসফি' আন্দোলন তা ব্যাহত করে। ভারতীয় রাজনীতি, স্বাধীনতা আন্দোলনও 'থিওসফিষ্ট'দের দ্বারা আংশিক প্রভাবিত হয়ে সংস্কার-বিমুখ সঙ্কীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মুক্তিযোদ্ধা এ্যানি বেসান্ত প্রথম জীবনের প্রগতিশীল ভাবধারা বিসর্জন দিয়ে মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির শিষ্যা হয়েছিলেন (১৮৮৯)। নিজের সন্তানদের অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা দেখে তিনি 'পরম করুণাময়' যিশুর প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে অনেকটা 'নাস্তিক' হয়ে ওঠেন। তারপর ফ্রি থিঙ্কার্স র‍্যাডিকাল 'ম্যালথুসিয়ান লীগ', 'ফেবিয়াস সোসাইটি' এবং 'সোস্যালিষ্ট ডিফেন্স্ অর্গনাইজেসন'—এর সদস্যা হয়ে তিনি বস্তুবাদে

দীক্ষা নেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মাদাম ব্লাভাটস্কির সংস্পর্শে এসে তিনি খুব সহজেই আগের বিশ্বাস ত্যাগ করেন। শুধু তাই নয়, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মাদাম ব্লাভাটস্কির মৃত্যুর পর তিনি জড়বাদ বিরোধিতার গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুলাই 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল, 'Mrs. Besant announces that She will not be able to present herself as a candidate at the coming London School Board election. "The death of my honoured friend and Chief Madame Blavatsky, throws on me heavy additional work in connection with the Theosophical movement,·· ·· I elect to leave the more popular work in other hands and devote myself wholly to the less understood and less attractive duty of pressing the claims of a spiritual philosophy on a public largely dominated by materialism.' ১৮৯৩ খৃঃ ভারতে তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলিতে তিনি ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য জড়বাদ বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার দিকে মনোনিবেশ, ভারতীয় পোষাক পরিধান, ভারতীয় পণ্য ব্যবহার এবং প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাস অধ্যয়ন করতে উপদেশ দেন। ১৮৯৩ খৃঃ ২৮ শে ডিসেম্বর 'Letter to the Hindu' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি আর্যসভ্যতাকে জগতের শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করে তার পুনরুদ্ধারের কথা ঘোষণা করেন। ঐ বছরের ৭ই ডিসেম্বর তিনি জাতি ও বর্ণভেদের সমর্থন,মনুসংহিতার জয়গান করে বলেছিলেন, 'India was a mighty country so long as the dictates of Manu the Legislator were observed to the letter, but when the spirit of dictates was forgotten by them, hordes after hordes of foreign Conquerors swept over the land and subjugated it'. হিন্দু মহিমা প্রকাশের জন্য মিসেস বেসান্ত ও কর্নেল অল্‌কট্ অনেক পরে অর্থাৎ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই জুলাই 'সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা করে 'সনাতন হিন্দুধর্ম' গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এ্যানী বেসান্ত আন্না ভাই নামে এ সময়ে নিজেকে অভিহিত করতেন। তিনি এভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আন্দোলন সৃষ্টিতে বিশেষ সাহায্য করেন। এর তিন বছর আগে অর্থাৎ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সমুলারও হিন্দুদের বাল্যবিবাহ সমর্থন এবং স্ত্রী-শিক্ষার

বিরোধিতা করে মিঃ বেহরামজী এম. মালাবারির কাছে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। সে-যুগের একটি বিখ্যাত সংবাদপত্র সেই সংবাদ উদ্ধৃত করে লিখেছিল, 'Professor Mux Muller thus writes to Mr. Malabari—"I think you should encourage early marriages, but not Premature ones ; otherwise you will drift into the European System, which is very bad". Professor Mux Muller's opinion is entitled to great respect, specially as he has knowledge of the systems that are in vogue in Europe and India'.[১০] কর্নেল অলকট্ মাদাম ব্লাভাট্স্কি, এ্যানি বেসান্ত ও ম্যাক্সমূলারের প্রেরণা পেয়ে হিন্দু সমাজ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তার ফলে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যেও এই 'হিন্দু' মনোভাবের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউম মাদাম ব্লাভাট্স্কির দ্বারা কিছুকাল প্রভাবিত হয়েছিলেন। মাদাম ব্লাভাট্স্কি হিউমের সিমলার বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। খুব সম্ভবত ব্লাভাট্স্কির প্রভাবেই তিনি বাল্য বিবাহের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। বেহরামজী এম. মালাবারির কাছে লিখিত একখানি চিঠিতে তিনি লেখেন, 'In the existing state of the Native Social Problem, no really impartial competent judge will, I believe, deny that in many cases these institutions even yet work fairly well There are millions of cases in which early marriages are believed to be daily proving happy one, and in which conssumation having been deferred by the parents (and this, my friends say, is the usual case) till a reasonable age is (I mean for Asiatic girls) the progeny are, so far as we can judge, perfectly healthy, physically and mentally'.. .. [১১] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী, আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত আশুতোষ চৌধুরীও 'থিওসফি' আন্দোলন সম্বন্ধে উৎসুক ছিলেন। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মাদাম ব্লাভাট্স্কির সঙ্গে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন।[১২] ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে 'থিওসফি' আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন দেখা দেয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 'থিওসফি' অলৌকিকতার

অন্যতম প্রবক্তা মিঃ সিনেটের মিথ্যাপ্রচারের অভিযোগে জেল হয়। মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনীত হয়েছিল। তিনি ভারত ছেড়ে ১৮৮৭ খৃঃ ইংলণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। যাই হোক, রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায় কিন্তু এই বিরুদ্ধ আন্দোলন বিশ্বাস করেনি, বরং হিন্দু ধর্মের অলৌকিকতা প্রভৃতি জন সমাজে প্রচার করায় 'থিওসফিস্ট'দের প্রতি তারা কৃতজ্ঞ হয়েছিল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় এই কৃতজ্ঞতাকে বাণীরূপ দিয়ে যা লেখা হয়েছিল, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—'The last number of the Theosophtst, like its Predecessors, is replete with interesting and valuable matter. We wonder that this first class magazine is not supported in the manner it ought to be. The service which Theosophy has done to the country is immense, and it is the duty of every Hindu to encourage and support its origin.' জাতীয় জীবনের এই পটভূমিতেই শশধর তর্কচূড়ামণির আবির্ভাব। শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কলকাতায় এসে কাজ শুরু করার আগে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে তাঁর প্রচার কার্য খুব সহজ হয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজের একটি অংশ অর্থাৎ রাজনারায়ণ বসু ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দু মহাসমিতি' স্থাপনের অন্যতম প্রস্তাবক ছিলেন। তারও অনেক আগে সারা বাংলা দেশে অসংখ্য 'হরিসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এই 'হরিসভাগুলির' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'হরিসভা' ব্রাহ্মদের উপাসনা পদ্ধতির প্রতিযোগী সংস্থা। 'হরিসভা'য় বড় বড় পণ্ডিত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হতো, ভজন ও গাওয়া হতো (১৩৩৪ সালের 'ব্রাহ্মণ সমাজ' থেকে জানা যায়, মুঙ্গেরে থাকার সময় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সঙ্গে এসব কার্যে সহযোগিতা করেছিলেন)।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এই পরিবেশে পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি দেখলেন, সমগ্র দেশকে হিন্দুধর্মের আওতায় নিয়ে আসা দরকার। কাজটি খুব শক্ত। কারণ, জনগণ বিশেষভাবে ইংরাজী শিক্ষিত-সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। শাস্ত্র, অলৌকিকতার উপর তাঁদের বিশ্বাস নেই। তবে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের উপর অটল বিশ্বাসও কিছুটা টলেছে। শাসক ইংরাজ সম্প্রদায়ের অত্যাচার-অবিচার, ব্রাহ্ম সমাজের দলাদলি তাঁদের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত, ব্যাকুল করেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস তাঁরা হারাননি।

শশধর তর্কচূড়ামণি তাই এঁদের কাছে বৈদিক ধর্মের কোন কথাই বললেন না। তিনি জনপ্রিয় ভক্তিমূলক পৌরাণিক আনুষ্ঠানিক ধর্মকে তুলে ধরলেন। ইংরাজি শিক্ষিতদের চিত্ত জয় করার জন্য তিনি হিন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানকেও টেনে আনলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপ খৃষ্টধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং সমাজে স্থিতি-রক্ষার্থে যেমন অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র প্রামান্য বর্জন করে বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি-প্রতিষ্ঠ মরালিটি বা ধর্মনীতিকে আশ্রয় করতে গিয়ে লোকাচারকেই ধর্মের আসনে বসিয়েছিল, শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও আমাদের শাস্ত্রীয় আচারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে অনেকটা সেই কাজই করেছেন। যদিও এ-ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যারই নামান্তর মাত্র, তবু এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার এবং শিক্ষিত জনগণের মনকে হিন্দু-ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করা। 'Pandit Sashadhar Tarka-Churamani therefore adopted a new line of interpretation seeking to reconcile ancient Hindu ritualism and mediaeval Hindu faith with modern Science. The interpretation was as true or as false as that offered by the defenders of popular Christianity seeking to reconcile it with the advanced researches and discoveries of modern Science. It was really neither honest faith nor correct Science. But all the same it went down with large numbers of our countrymen who cared little for their faith and understood less of what they pretended to know of Science'[১৩] . . . . এ-বিষয়ে তিনি সফলও হয়েছিলেন। ১৩৩৪ সালের ফাল্গুনের 'শশধর সংখ্যা' ('ব্রাহ্মণ সমাজ') থেকে জানা যায়— 'পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ ঘোরে বঙ্গদেশ যখন সমাচ্ছন্ন, তখন এই দ্বিজরাজ শশধরের প্রদীপ্ত প্রভায় পথভ্রষ্ট হিন্দুসন্তান সুপথ দর্শনের সুযোগ লাভ করিয়াছিল।' এলবার্ট হল এবং অন্যান্য অনেক সভা-সমিতিতে যেখানে সাধারণতঃ তিনি বক্তৃতা দিতেন সেখানে অসংখ্য লোক সমাগম হতো। বাংলা দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সেই সভাগুলিতে উপস্থিত থাকতেন। এ-সম্বন্ধে ১৮৮৪ খৃঃ ২৪শে জুন 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'Pandit Sasadhar Tarkachuramani, a Sanskrit Scholar of Benaras,

is delivering a series of lecturs on Hinduism in the Albert Hall, under auspieces of a Committee. consisting of many Bengali men of letters. The lectures are being largely attended.' অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রতিষ্ঠিত 'নবজীবন' (প্রথম পর্যায় ১২৯১) এবং 'সাধারণী' (১২৮০), হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'কর্ণধার' (১২৯৪) তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের গুণগান এবং প্রচার কার্যে আত্মসমর্পণ করেছিল। তাঁর অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ফলে অনেকেই আবার হিন্দুর লোকাচারকে মেনে নিয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে, তখন দেশে 'হিন্দু পুনরুত্থানের' স্রোত প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। 'আজ কাল বঙ্গদেশে বিশেষতঃ সহর কলিকাতার মধ্যে সন্নিকটে একটা বিষম ধর্ম-কম্পন উত্থিত হইয়াছে যুবা প্রণয়-সঙ্গীত ত্যাগ করিয়া কবির সুরে কালীকীর্ত্তন আরম্ভ করিতেছে। গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেল নানাবিধ চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় পরিত্যাগ করিয়া হবিষ্যান্ন আশ্রয় করিতেছে। কুক্কুটাণ্ডের পরিবর্তে গোল আলু, রোষ্টেড কটীর পরিবর্তে আতপ তণ্ডুলের অন্ন, কাটলেট কারির পরিবর্তে লাউ ডাঁটার চচ্চড়ি এবং খোদা বক্সের পরিবর্তে স্বপাক আরম্ভ হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে যিনি সেরি স্যাম্পেন দিয়া জল পিপাসা নিবারণ করিতেন, বাসি মুখে বাসি কাপড়ে যথেচ্ছা ভোজন করিতেন, সন্ধ্যাহ্নিকের স্বপ্ন দেখিতেন কিনা সন্দেহ, আজ তিনি গঙ্গাজল ভিন্ন পান করেন না, যেন একটি মহর্ষি সাজিয়া বসিয়াছেন চেনা ভার। চেনা ভার অনেককেই। যিনি হিন্দুশাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, জাতিভেদকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া এবং শিষ্টাচার সকল ভাগীরথী জল-কল্লোলে বিসর্জন দিয়া সমুদ্র-পথে বিলাত গমনান্তর তিন-চারি বৎসর তথায় অবস্থান পূর্ব্বক এখানে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তিনিও সূর্যোপস্থান আরম্ভ করিয়াছেন, প্রত্যহ স্বহস্তে নূতন হাঁড়িতে পাক করিয়া ভোজন করিতেছেন এই কালে যাঁহাকে ঘোর নাস্তিক বলিয়া সকলে জানিত, আজ তিনি কেবল সার্দ্ধ ত্রিশ কোটি দেবতা নয়—তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপদেবতাগুলিরও উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। আর যাঁহারা বানের জলের ময়লার মত আজ খৃষ্টান, কাল ব্রহ্মজ্ঞানী—এইরূপ নানা ধর্মের আশ্রয় করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারা আজ ঘোর হিন্দুর বেশ ধারণ করিয়াছেন।'[১৪]

যে প্রচার কার্যের দ্বারা তিনি এই অঘটন ঘটিয়েছিলেন সে গুলি লক্ষণীয়। সেগুলি হল:

১. আর্যধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার। আর্য মহিমার পুনর্জাগরণ। 'যে ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া আর্যগণ উন্নতির বৈকুণ্ঠধাম নির্মাণ করিয়াছিলেন, যে ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া আর্য জাতির এত অধঃপতন হইয়াছে, ও যে-ধর্মকে অবলম্বন করিয়া আর্য জাতিকে আবাব উন্নতির সেই লোকে উত্থান করিতে হইবে, সে ধর্ম বড় সাধাবণ পদার্থ নহে।'

২. সম্পূর্ণ মানুষ ভাবতেই সম্ভব—আর কোথাও নয়। ('সম্পুর্ণ মানুষ ভারতেই সম্ভবে'—'ধর্মব্যাখ্যা')।

৩. ধর্মই ভারতের জীবনাদর্শ, ধর্মের দ্বারা আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। শরীব ব্যাধিমুক্ত থাকে। ('ধর্মব্যাখ্যা', পৃঃ ৫১—৫২)।

৪. ধর্মের দ্বারা জাতীয়তা বৃদ্ধি ও সমাজ রক্ষা সম্ভব ('ধর্মব্যাখ্যা', পৃঃ৫৯—৬০)।

৫. ভাবতের সমস্ত লোকাচারগুলি বিজ্ঞান-সম্মত। এগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে। এই মতগুলি তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও গ্রন্থের মধ্যে ছড়িযে আছে। সেগুলি বিশ্লেষণ করা দরকার। 'সম্পূর্ণ মানুষ ভারতেই সম্ভবে'—এই অংশে তিনি দেখিয়েছেন, আধ্যাত্মিক এমনকি বৈষয়িক দিক থেকেও ভাবত জগতে শ্রেষ্ঠ। বিবেক, বৈরাগ্য, আত্মবোধ, অণিমা-লঘিমাদিব শক্তি, 'মনুষ্যাত্মার নিগূঢ ধর্মেব' বিকাশ ভারতেই হয়েছে। 'এই ভাবতেই একদিন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম মনুষ্য প্রাণী সেই সহায় হইতে মহান্ অনন্ত পুরুষকে 'সোঽহং' ভাবে দেখিয়াছিল। যখন দুর্বাসা, শুকদেব ভৃগু, ভার্গব বামদেব, পতঞ্জলি, পঞ্চশিব, কপিলাদি ঋষিগণের জ্ঞানময়, তপোময়, ধর্মময় মূর্তিসকল মনোমধ্যে উদিত হয়, যখন আমাদের জ্ঞানবীর্য তপোবীর্য, ধর্মবীর্যের স্মরণ হয়, তখন অন্যান্য দেশ কেন, সুরলোকও তাহার তুলনাস্থান মনে হয় না।' আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে বৈষয়িক উন্নতিরও মণি-কাঞ্চন যোগ হয়েছিল। রাজর্ষি জনক, ভীষ্ম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁবা আসমুদ্র পৃথিবীর সর্বময় শাসক হয়েও সব সময় ছিলেন যোগী। তাই ভূমণ্ডলে একমাত্র ভারতবর্ষই একাধারে উভয়োন্নতিব উপযুক্ত স্থান। তবে ভারত বৈষযিক উন্নতির জন্য বিশেষ লালায়িত নয়, ধর্ম নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকতে চায়। কিন্তু ভারতের এই শ্রেষ্ঠত্বের গোপন চাবিকাঠি কি? তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মতে ভারতের ঋতু চক্রের আবর্তন বিবর্তন, ভারতবাসীর শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি স্ফুরিত করে মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ করেছে। আর কোন দেশে প্রকৃতির এই পালাবদলের ব্যাপার নেই বলে সে সব

দেশের মনুষ্যত্বও অসম্পূর্ণ, অর্ধবিকশিত। 'আর যে সমস্ত দেশে ভৌতিক প্রকৃতির অনেক প্রকার পরিবর্তন নাই, সেই সকল দেশের লোকের শারীরিক প্রকৃতিই অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ থাকিবার সম্ভব, সুতরাং মানসিক শক্তি অসম্পূর্ণ। অতএব সে দেশের লোকও অসম্পূর্ণ; শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর হেমন্ত, হেমন্তের পর আবার শীত। পর-পর এই ছয় ঋতুর পরিবর্তনে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সকল বিষয়েরই নানাপ্রকার পরিবর্তন হয় এবং সেই সকল পরিবর্তনই আমাদিগের সম্যক অনুভূত হয়, সুতরাং আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় সকল প্রকার পরিবর্তনে অভ্যস্ত হওয়ায় সম্যক বিকশিত ও সম্পূর্ণ হইবারই কথা। কিন্তু যে দেশে কেবল শীত গ্রীষ্ম বৈ আর ঋতু নাই, সে দেশের লোকের ইন্দ্রিয় সকল কোথা হইতে এরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করিবে?'[১৫] প্রাকৃতিক এই লীলা-বৈচিত্র্যের জন্য ভারতবাসীর শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি অন্যান্যদের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।

ধর্মানুশীলন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, ধর্মানুশীলনের ফলে মানুষের আয়ুবৃদ্ধি হয়। যোগী ঋষিরা এজন্যই দীর্ঘজীবী ছিলেন। ধর্মের অনুশীলন না করলে মানুষ 'সর্বদাই কেবল চক্ষু কর্ণাদি ঐন্দ্রিয়িক পরিচালনাতেই ব্যাপৃত থাকে এবং তার ফলে ভাটিজলে নাবিক পরিচালিত নৌকার ন্যায়, ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য যন্ত্র সকলের বেগ আরও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র যন্ত্রসমূহের কার্যকরী শক্তির হ্রাস হয়—আয়ুর ক্ষয় হয়।'

বাঙালীর জীবনীশক্তি হ্রাসের তিনি যে শারীরিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা তাঁর নিজস্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে স্নায়ুমৎ প্রকৃতিরই প্রবলতা। স্নায়ুমৎ প্রকৃতির গুণ এই যে, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু মণ্ডল অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল হয় সুতরাং সমস্ত শারীরিক যন্ত্রই অধিকতর চঞ্চল হয়। শরীরাভ্যন্তরে তাপ ও তড়িৎ কিছু অধিক পরিমাণে থাকে।' অতএব এজন্য অন্যান্য দেশীয়দের তুলনায় বাঙালীর শরীর-যন্ত্র শীঘ্র ক্ষয়িত হবার সম্ভাবনা। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ ধর্মানুষ্ঠান। 'এ অবস্থায় ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা শরীরটি কিছু শীতবীর্য ও যন্ত্রগুলির কিছু ধৈর্য সাধন না করিলে যে শীঘ্র শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হইবে, তাহা বোধ হয় অসন্দিগ্ধ।'

ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা ব্যাধিমুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিবেকাদির স্ফুরণ হলেই শারীরিক ক্রিয়া ক্রমে নিস্তেজ হতে থাকে। যখন ফুসফুস হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া নিস্তব্ধ প্রায় হয় 'তখন তাপ আর তড়িৎ নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, সুতরাং সমস্ত শরীর যন্ত্রেরই ক্রিয়ার ন্যূনাতিরেক না থাকিয়া সামঞ্জস্য হয় এবং তাপ তড়িতেরও সামঞ্জস্য হয়।' এ সময় রোগ থাকলেও রোগমুক্তি ঘটে। দিনরাত মিলে অন্তত তিনবারও যদি এই ধর্মানুষ্ঠান করা যায় তবে শরীরে আর কোন রোগ থাকতে পারে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, কোন গ্রামে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী হলে দেখা যায় সেই গ্রামের অন্যান্য সব লোক মরে গেলেও যদি কোন ব্রহ্মচারী কিংবা যোগী থাকেন তবে তাঁরা সমস্ত রোগকে তুচ্ছ করে জীবিত থাকতে পারেন।

ধর্মের দ্বারা জাতীয়তা ও সমাজ রক্ষার বিষয়টি সত্যি কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি বলেন, 'আহার ব্যবহার, রীতিনীতি যত পরিমাণে একভাবাপন্ন হইবে তত পরিমাণে জাতীয়তার বৃদ্ধি পাইবে।' ধর্মহীন স্বেচ্ছাচার প্রাধান্য পেলে আহার-বিহার প্রভৃতি বিষয়ে ঐকমত্য থাকেনা। মানুষ ধর্মভাবাপন্ন হলে 'সন্ধ্যা, আহ্নিক, জপ, স্নান, দান, অতিথি-সৎকার, উৎসব, তীর্থযাত্রা, শৌচ কার্যের অনুষ্ঠান, গো-সেবা, সাধু ব্রাহ্মণসেবা, দেবতা ভক্তি, ভগবদুপাসনা' প্রভৃতি বিষয়ে একই রকম কাজ করবে, ক্রিয়া-কর্মের দিক থেকে এই ঐক্যের ফলে জাতীয়-জীবনেও ঐক্যবোধ জাগবে। 'ধর্মের উন্নতির দ্বারা ক্রমে মানসিক প্রকৃতিরও একতা হইয়া পড়ে, তখন প্রকৃত জাতীয়তা সংস্থাপিত হয়, তখন পরস্পরের নিমিত্ত পরস্পরের সহানুভূতি সকলেই সকলের সুখে সুখী, সকলেই সকলের দুখে দুঃখী হইয়া থাকে। অতএব ধর্মই জাতীয়তার একমাত্র ভিত্তি।'

ভারতের বিভিন্ন প্রচলিত লোকাচারকে তিনি অপরিবর্তিত রাখা প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। বিভিন্ন প্রথা ও আচারগুলি যে আদৌ 'কুসংস্কার' নয়, বিজ্ঞানের যথার্থ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—এ কথা বোঝাবার জন্য তিনি সেগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।· · ·'শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রধান উদ্দেশ্য এবং সম্পূর্ণ ইচ্ছা, হিন্দু ধর্ম চিরকাল যেরূপ ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, সেই ভাবেই ইহাকে রক্ষা করা। তবে আজকাল হিন্দুধর্মের গূঢ় তাৎপর্য সকলে বুঝিতে পারে না; এইজন্য তিনি হাঁচি, টিকটিকি হইতে স্নান, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় লোকাচারের

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন যে. হিন্দুর আচাব ব্যবহার যাহা কিছু আজকাল (প্রাচীন সম্প্রদায়েব মধ্যে) প্রচলিত আছে তৎসমস্তই ধর্মমূলক, তাহার কোনটিই পরিত্যাজ্য নহে।'[১৩] টিকির চৌম্বক শক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণ, হাই উঠলে তুড়ি মারার মধ্যে অক্সিজেনের সম্পর্ক প্রভৃতি আবিষ্কার করে তিনি উনিশ শতকের যুক্তিবাদী জনগণকে বিভ্রান্ত কববার চেষ্টা করেছিলেন।

এছাড়া তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ আর্যবাদ, ব্রাহ্মণ্যশক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধেও মতামত প্রকাশ কবেছিলেন। তিনি যে আর্য জাতির পুনরুজ্জীবনেব স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা শুধু হিন্দুকে নিযেই বচিত। তাঁর মতে, হিন্দুরাই একমাত্র আর্যসন্তান। এই আর্যসমাজ কঠোরভাবে বর্ণভেদ ও জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। জন্মসূত্রই জাতি নির্ণযেব মাপকাঠি। কেউ ইচ্ছা করলে, কিংবা সদ্ গুণাবলীব অধিকাবী হলে, উচ্চবর্ণে স্থান লাভ কবতে পারবে না। জাতিভেদ অপবিবর্তনীয়, স্থিতিশীল। চতুর্বর্ণেব মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব সকলকেই স্বীকার কবতে হবে। বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে লোকাচাবকেই মেনে চলতে হবে অর্থাৎ বাল্য বিবাহে কোন দোষ নেই, বিধবা বিবাহ অনুচিত—এগুলি তাঁর সিদ্ধান্ত। এক কথায়, তিনি কোন লোকাচারকে দূর করতে চাননি—সব কিছুকেই সমর্থন করেছেন।

শ্রীবামকৃষ্ণেব সঙ্গে সাক্ষাতেব পব তিনি তাঁর কিছু কিছু বাগ্‌ভঙ্গি আয়ত্ত করেছিলেন সত্য, কিন্তু 'জ্ঞান'বাদী শশধব তর্কচূডামণি 'ভক্তি'বাদী রামকৃষ্ণকে গ্রহণ কবতে পারেন নি। (শ্রীবামকৃষ্ণেব মতো তিনিও সাধারণ উপমাব সাহায্যে দুরূহ তত্ত্বকথা বোঝাবার চেষ্টা করতেন। উদাহবণ স্বরূপ সাকার-নিরাকার প্রশ্নে অধিকারী ভেদে সাধন ভেদ বোঝাতে গিয়ে মা কেমন ভাবে এক একজন সন্তানের জন্য এক একরকম ভোজ্যের ব্যবস্থা করেন—সেই বিখ্যাত উপমাটি ব্যবহার কবেছেন)। যদিও শ্রীবামকৃষ্ণ আনুষ্ঠানিকতা. শাস্ত্রপাঠ ও পাণ্ডিত্যের থেকে তাঁর মনকে ভক্তিব দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, সেই চেষ্টা সফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। উভয়ের মত ও পথ অনেকটা আলাদাই থেকে গেছে। চূডামণি মহাশয়ের শিষ্য শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা ১৩২৭ সনের 'সাহিত্য' পত্রিকায় (পৌষ ও মাঘ পৃঃ ৫৮৪) এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর কাছে লিখিত চূডামণি মহাশয়ের একখানি চিঠির (২৭.৯.২৫ তারিখে বহরমপুর থেকে লেখা) কথা উল্লেখ করেছেন। এই চিঠিতে তিনি

লিখেছিলেন, 'রামকৃষ্ণ 'পরমহংস' উপাধি কাহার নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না। খুব সম্ভব ইহা সাধারণ লোকের নিকটই পাইয়াছিলেন। আজকাল সাধারণ লোকেরাই ঋষি, মহর্ষি, অমুকানন্দ, অমুক স্বামী, অমুক পরমহংস ইত্যাদি উপাধি দিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত কলিকাতা অঞ্চলে যথেষ্ট আছে। রামকৃষ্ণের পরমহংস নামও বোধ হয় সেই ভাবেই হইয়াছিল। আর যদি তাঁহার গুরুই ঐ উপাধি দিয়া থাকেন, তবে তাহাও ভ্রান্তিমূলকই বুঝিতে হইবে। কারণ, শাস্ত্রমতে যেরূপ অবস্থা হইলে পরমহংস বলা যায়, সে লক্ষণ তাঁহাতে আমি দেখিতে পাই নাই, এ কারণে তাঁহার প্রতি ঐ উপাধিটি ব্যবহার করিতে আমি সাহস পাই না, তবে তাঁহাকে আমি মহাশয় লোক বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এইজন্য আমি তাহাই বলিয়া থাকি। আর আশ্রমের ভাবে ধরিলে তাঁহাকে কোনও সংজ্ঞাই অকুণ্ঠিতভাবে দেওয়া যায় না। তাঁহার পরমহংসের লক্ষণ যেমন ছিল না, তেমন তাঁহার পূর্ববর্তী ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমেরও শাস্ত্রতঃ লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই—দণ্ডীও ছিলেন, তবে ভগবান শঙ্করাচার্যের ব্যবস্থা-মতে তাঁহাকে 'অবধূত আশ্রমী' বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। অতএব আমার বিবেচনায় তাঁহাকে রামকৃষ্ণ অবধূত বলাই উচিত।' ধর্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে তাঁর কোন চাপরাশ ছিল কিনা—এ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন বলে রামকৃষ্ণকথামৃত-প্রণেতা যা উল্লেখ করেছেন, তা সত্য নয় বলেই চূড়ামণি মহাশয় অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। কারণ, 'আমাকে এতটুকু জিজ্ঞাসা করার অধিকার আমি তাঁহাকে দেই নাই' সুতরাং ঐ ভাবে আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না এবং তিনি করেনও নাই। তিনি যে লেখাপড়া কিছু জানিতেন না এবং শাস্ত্রও পড়েন নাই, এ বিষয়ে তিনি বেশ ধারণা রাখিতেন এবং আমি যে তখন ২৫-৩০ বৎসর পর্যন্ত যথাশক্তি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছি, তাহাও তিনি জানিতেন।··· আমি কোন ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা বা উপদেশ লওয়ার নিমিত্ত তাঁহার নিকট যাই নাই, কারণ তিনি কোন প্রকার শাস্ত্রই জানিতেন না। সুতরাং আধ্যাত্মবিষয়, ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয় বা ব্রহ্ম-তত্ত্ব বিষয় বা তৎপ্রাপ্তি সাধনাদি বিষয়ে কোন কিছুই তাঁহার বিদিত ছিল না। তাঁহার যাহা বিদিত ছিল, তাহা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। শাস্ত্রবিষয়ে যাহারা একেবারেই অজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই তাহা উপযোগী হইতে পারে ও হইত; 'রামকৃষ্ণকথামৃত' দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তবে তিনি শাস্ত্রাদি না জানিলেও কেবল গুরুর উপদেশ অনুসারে নিজের অনুষ্ঠান করিয়া

অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সাংসারিক বন্ধনও কতকটা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন; ইহা আমি বিশ্বাস করি এবং ভক্তিরাজ্যেও তিনি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা আমি স্বীকার করি; কিন্তু সে অনুষ্ঠান বা ততটুকু ভক্তি শিক্ষা অনেকের আবশ্যক বা উপযোগী হইলেও সকলের নহে।' শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধির ভাব সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'সমাধির যে অসংখ্য স্তর আছে এবং যেগুলি আয়ত্ত করিতে পারিলে নির্বিকল্প সমাধি সম্ভবপর হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের তা জানা ছিল না। কারণ, লেখাপড়া তিনি আদৌ জানিতেন না। সে সকল তত্ত্ব এত দুরূহ যে, রীতিমত দর্শন এবং উপনিষদ অধ্যয়ন ব্যতীত কেবল গুরু উপদেশে তাহার ধারণা বা জ্ঞান বা তাহাতে কোন অনুষ্ঠান কদাপি হইতে পারে না। কাজেই তিনি স্থূলদেহ ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেও মনোময় কোষ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহা বুঝিয়াছিলাম।

তাঁহার যে সমাধির ভাব হইতে দেখিয়াছি, তাহা সমাধির নিয়মানুসারে হয় নাই, গানাদি শ্রবণ মাত্রে অমনি তৎক্ষণাৎ হইয়া গিয়াছে। আবার কিছুকাল পর হঠাৎই তাহা ভঙ্গ হইত। এতদ্বারা এই সমাধিকে ঠিক অনুষ্ঠানের ফলও বলা যায় না। ইহা মস্তিষ্কের অবস্থা বিশেষের ফল হওয়াই অধিকতর সম্ভব। যাহাদের মস্তিষ্কের অংশবিশেষ অধিক দুর্বল থাকে, তাহাদের কোন কোন বিষয়ের সামান্য ঘটনাও মস্তিষ্কে গুরুতর রূপে জানাতেই তখন অবস্থা বিশেষে কাহারও কাহারও বাহ্য সংজ্ঞার লোপ হইয়াও থাকে। গানাদি শ্রবণেও ইহা দেখা গিয়াছে। হাওড়ার নিকট শিবপুরে এক ব্রাহ্মণের একটি ছেলে দেখিয়াছিলাম, তাহার ৫ ৬ বৎসর বয়স হইতেই খোল করতালসহ কীর্তনাদি গান হইলে, অনেকক্ষণ বাহ্য সংজ্ঞার অভাব হইত, ২০-২৫ পল বা অর্দ্ধদণ্ড পর আবার সে প্রকৃতিস্থ হইত, পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে তাহা কমিতে লাগিল। ১৬ বৎসরের পর একেবারেই সারিয়া গেল। তখন সে অতি ?পাত্র হইয়াছিল। ৫ বৎসরের সময় ইহার অবস্থা দেখিয়া নব্য অবতারের আবিষ্কারকগণ ইহাকে গৌরাঙ্গের অবতার বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল; অজ্ঞের মহিমা অপার! আমার একজন শিষ্য দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এরও এরূপ অবস্থা হইত, এখন তাহা সারিয়া গিয়াছে।' শ্রীরামকৃষ্ণের মস্তিষ্কের অবস্থাও অত্যন্ত অনুভবশীল ছিল বলে যে উক্তি তর্কচূড়ামণি মহাশয় করেছেন তা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতব বস্তু স্পর্শ করতে না পারার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া,

দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করে তিনি ইচ্ছা করলেই যদি মনোময় কোষে যেতে পারতেন, তা হলে নাকি তিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বে 'গলরোগের দারুণ যন্ত্রণায়' ভুগতেন না। পরিশেষে চূড়ামণি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি মারাত্মক কথা বলেছেন। মৃত্যুর পূর্বে কুসংসর্গে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নাকি সাধনার অবনতি ঘটে। এখানে তাঁর সম্পূর্ণ উক্তিটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—'কিন্তু দেহাবসানের কিছুদিন পূর্বে তিনি কিছু নামিয়া পড়িযাছিলেন, ইহা বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। আমি এইটুকু বুঝিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি আত্মীয়ভাবে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, তাহা আপনার প্রীতিকর হইবে কি না ভাবিতেছি। তখন তিনি বলিলেন, আপনি অবশ্যই তাহা বলিবেন। আমি বলিলাম, আপনার সহিত আমার পরিচয় হইলে, প্রথম ভাগে আপনার অবস্থা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এখন যেন তাহার একটু নিম্নদিকে পরিবর্তন মনে হইতেছে, ইহা সত্য কি না তাহাই জানিতে চাই না, নিজের অবস্থা আপনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন। তখন তিনি একটু বিষাদের সহিত বলিলেন, আপনি তো ঠিক ধরিয়াছেন। আপনি ইহা কেমন করিয়া বুঝিলেন, আমি তো সর্ব্বদাই আমার অবস্থান্তর অনুভব করিতেছি ইহার কারণ আপনার কি মনে হয় বলুন দেখি? আমি বলিলাম অন্য কারণ কিছু থাকিলে, আমার অবিদিত, আপনি কুসংসর্গের আবর্তে পতিত হইয়া আছেন, ইহাই আমি প্রধান কারণ মনে করি। তিনি বলিলেন, ইহা তো আপনি ঠিক বুঝিয়াছেন, আমি ইহা বেশ অনুভব করি এবং এ সংসর্গ ত্যাগেরও চেষ্টা সর্ব্বদাই করি। ··· উহারা যে আমারে ছাড়ে না। এখন আমি উহাদের খপ্পরের মধ্যে পড়িয়াছি। এখন এ বন্ধন কাটানর আর কোন উপায় নাই। কাজেই এবার এই ভাবেই যাইবে।' তর্কচূড়ামণি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যোগজ কোন বিভূতিও দেখতে পান নি, 'তবে বক্ষাদিতে হস্তামর্ষণের দ্বারা কাহারও কাহারও বেদনাদি অল্পকালের জন্য তিরোহিত হইতে দেখিয়াছি। ইহা যৌগিক শক্তির কার্য নহে, নৈয়ায়িক শক্তির কার্য ইহা বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে।' ('সাহিত্য' ১৩২৭, পৌষ-মাঘ সংখ্যা)।

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের এই মন্তব্যগুলির তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্য, ১৩২৮)। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও তর্কচূড়ামণি মহাশয় কেন এতদিন এই কথাগুলি বলেন নি—সেই

প্রশ্ন তুলে তাঁকে এর উত্তর দিতে অনুরোধ করেছিলেন। ('সাহিত্য' ১৩২৮)। প্রত্যুত্তরে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় আগের কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেন। আর একটি কথা, শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় চরম ব্রাহ্ম বিদ্বেষী ছিলেন। কেশব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মেলামেশাও তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের হয়তো মনঃপূত হয়নি। যে ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে হিন্দু-গৌরব ও মহিমা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ব্রতী হয়েছিলেন, সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের মেলামেশা করা তাঁর পক্ষে ক্ষোভের কারণ ছিল বৈ-কি!

শ্রীরামকৃষ্ণ হয়তো প্রথম প্রথম তাঁর উপর অনেকটা আস্থা রেখেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি তাই বলেছিলেন, 'তুমি ছানাবড়া হয়ে আছ। এখন দু'পাঁচদিন রসে পড়ে থাকলে তোমার পক্ষেও ভাল, পরেরও ভাল।' কিন্তু বাদ প্রতিবাদের যে শুষ্ক পথ তর্কচূড়ামণি মহাশয় বেছে নিয়েছিলেন, তার থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের মত ও পথ ছিল অনেক আলাদা, অনেকটা স্বতন্ত্র।

যাই হোক, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রথম দিকে তাঁর আন্দোলনে সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় কয়েকটি জিনিস যেন ফ্যাসনে পরিণত হয়েছিল। গীতাপাঠ, একাদশীর দিন ভাত না খাওয়া, আর্য শব্দের ব্যবহার প্রায় সর্বজনীন রূপ লাভ করেছিল। আর্য শব্দের ব্যবহারই বোধহয় সবচেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'আর্য শব্দের ব্যবহার, আর্য বিদ্যালয়, আর্য ঔষধালয়, আর্য পুস্তকালয়, আর্য নাট্যালয়—এইরূপ দোকান, পসার, ছাপাখানা, কারখানা, হোটেল অবধি আর্য নামে অঙ্কিত হইতেছে, এদিকে সাহিত্য সমাজেও আর্য-পাঠ, আর্য চরিত, আর্য সঙ্গীত, আর্য পত্রিকা, আর্য বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তক পত্রিকা 'আর্য' নামাঙ্কিত হইয়া বহির্গত হইতেছে।' ('ধর্ম কম্পন'—'কর্ণধার' ১২৯৫-৯৬) অ্যানি বেসান্ত-এর আর্য ধর্ম পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা এই আন্দোলনের অপর শক্তি।

যা সহজে পাওয়া যায়, তা সহজেই হারিয়ে যায়। শশধর তর্কচূড়ামণির মতাদর্শ বাংলাদেশ প্রথমে আগ্রহের সঙ্গে নিলেও পরে এ নিয়ে প্রচণ্ড বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। কারণ, তাঁর কথাগুলি শ্রুতিমধুর এবং চিত্তাকর্ষক হলেও অসার, দ্ব্যর্থবোধক ও স্বকপোল-কল্পিত ছাড়া আর কিছুই নয়। কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছিলেন সে যুগের একজন নামকরা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং মান্য ব্যক্তি। তিনি তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা সম্বন্ধে বলে-ছিলেন, 'বস্তুতঃ বনপর্বের ৩০ অধ্যায়ের দ্রৌপদীর বক্তৃতাটি যেমন শুনিতে মধুর,

আমাদিগের তর্কচুডামণি মহাশয়ের বক্তৃতাগুলি শুনিতে তদপেক্ষা মধুর। শুনিবার সময় তাহা এত মিষ্ট বোধ হয় যে, তখন কেহ কথা কহিলে তাহার প্রতি বিরক্ত না হইয়া থাকা যায় না; কিন্তু গৃহে আসিয়া চিন্তা করিলে তাহার আর তাদৃশ মাধুর্য ও সারবত্তা থাকে না। কেন? তাহা জানি না।'[১৭]

তিনি কথায় কথায় শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করে লোককে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু অনেক সময় শাস্ত্রের বচনটি বিকৃত করে, কিংবা কোন অংশ বর্জন করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ব্যাখ্যা দিতেন। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক্। তিনি ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সঙ্গে ব্যাস, বশিষ্ঠ, জৈমিনি প্রভৃতির কোন মিল নেই। স্বভাবকেই তিনি ধর্ম আখ্যা দিয়েছেন (যেমন আগুনের দাহিকা শক্তি, জলের তরলত্ব)—স্বভাবই যদি ধর্ম হয়, তবে স্বভাব তো স্বতঃস্ফূর্ত, এজন্য সাধনার দরকার কি? এর ফলে মানুষ যদি ধর্মকে অস্বীকার করে তবে কিছুই অন্যায় বলা যায় না।

'ভগবান পতঞ্জলিকৃত' 'এতেন ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ'—এই স্ত্রের ভাষ্যাদির ইহাই মর্ম।' একথা খুবই অভিনব। ভাষ্যকার ব্যাস, টীকাকার বাচস্পতি, ভোজ মণিপ্রভা এঁরাও এ-রকম মনে করেননি। চূড়ামণি মহাশয় ঋষি-বাক্যের কিছু অংশ গোপন করে সেখানে নিজের বক্তব্য জুড়ে দেন। পতঞ্জলির 'এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ', এই সূত্রের "ভূতেন্দ্রিয়েষু" অংশটি তিনি বেমালুম বাদ দিয়ে গেছেন। তার ফলে অর্থ বদলে গেছে। 'জীবের উৎপত্তি' বিষয়ক আলোচনায় তিনি যা বলেছেন এবং পতঞ্জলির উক্তি উদ্ধৃত করে যে ভাবে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তা খুবই অন্যায় এবং ত্রুটিপূর্ণ। পতঞ্জলি বলেছিলেন, 'সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ' কিন্তু চূড়ামণি মহাশয় 'সতি মূলে' অংশ বাদ দিয়ে 'তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগা'-ই কেবল উল্লেখ করেছেন। এর পর তিনি আর একটি নতুন কথা শুনিয়েছেন। কথাটি হল, 'শুক্রস্থ আত্মার ত্রিবিধ শক্তি থাকে, যাহা ভগবান কপিলদেব সাংখ্য দর্শনে নির্দেশ করিয়াছেন', এই বলে তিনি 'কার্য্যং তস্য ত্রিবিধং হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ'—এরূপএকটি স্ব-কপোল-কল্পিত সংস্কৃত কথা যোগ করে দিয়েছেন। কপিলদেব যে কোন্ সাংখ্যদর্শনে 'কার্য্যং তস্য ত্রিবিধং হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ' কথাগুলি বলেছেন তার কোন হদিশই পাওয়া যায় না।

বানর থেকে মানুষ এসেছে—ডারউইনের নামে প্রচলিত এই মত সমর্থন

করতে গিয়ে 'জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যা পুরাৎ' এই পতঞ্জল সূত্রটির উল্লেখ করেছেন তিনি। এই কথাটির অনুবাদ করেছেন, 'প্রাণীর প্রকৃতি অর্থাৎ আভ্যন্তরিক শক্তি যতই ক্রমে বিকশিত হইতে লাগিল, ততই তজ্জাত সন্তানগণ ক্রমে ক্রমে ভিন্ন আকার ধারণ করিতে লাগিল।' এরূপ ব্যাখ্যা মোটেই সঙ্গত নয়। পতঞ্জলি তপস্যাদির দ্বারা উৎকষ প্রাপ্ত হলেই শরীর পরিবর্তিত হয় বলেছেন, আপনা আপনি শরীর পরিবর্তিত হয়ে ক্রমে মানুষ হয়েছে, এমন কথা বলেন নি। তাছাড়া, তিনি ইহজন্মে শরীর পরিবর্তনের কারণ বর্ণনা করেছেন, ডারউইনের মতো ক্রম বিকাশের কথা বলেন নি।

ভারতীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি প্রমাণ করার জন্য তিনি কথায় কথায় যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা যেমন দুর্বোধ্য তেমনি বিকৃত। 'কিন্তু যখন ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৭৫ রেখা অপেক্ষায় কমে তখন তাহার সংস্পর্শে আমাদের তাপ অধিক পরিমাণে ক্ষয় হয় বলিয়া তাপ সঞ্চয়ের নিমিত্ত শরীরের আভ্যন্তরিক যত্নের আবশ্যক হয়। আর যখন ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৮০ রেখা অপেক্ষা অধিক হয় তখন উহার উপযুক্ত ক্ষয় হয় না বলিয়া আভ্যন্তরিক যত্নে উহা শরীর হইতে বাহির করা প্রয়োজন হয়।' এ-ধরনের 'বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম' বিষয়ক নানা মন্তব্যের কথা স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ 'হিং টিং ছট' (১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯ কবিতাটি লিখেছিলেন।

'স্বপ্ন কথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তি ভেদে ব্যক্তি ভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সংবর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসংবাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমাশক্তি সেথায় উদ্ভুত।

এয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হিংটিংছট।'

শশধর তর্কচূড়ামণির দ্ব্যর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ, বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে এ-কবিতাটির অনেকাংশে মিল আছে। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর (৩য় খণ্ড) 'গ্রন্থ পরিচয়ে' উল্লিখিত হয়েছে যে, সমসাময়িক কালের অনেকেই কবিতাটিকে চন্দ্রনাথ বসুর প্রতি কটাক্ষ বলে মনে করতেন। আমাদের মনে হয়, এ-ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। সমাজ-সংসার প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দ্রনাথ বসুর অনেক মতভেদ হয়েছিল ঠিক, কিন্তু এই মতানৈক্য কোন সময় তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাবকে ক্ষুন্ন করেনি। 'রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চন্দ্রনাথের অনেক পত্র 'সবুজ পত্র' (আশ্বিন ১৩২৫) ও বিশ্বভারতী পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সাহিত্য সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সময় মতবিরোধ ঘটিলেও, উভয়ের মধ্যে আগাগোড়াই একটা প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল।'[১৮]

'গ্রন্থ পরিচয়ের' মন্তব্যটির শেষেই আছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক সমালোচকদের ধারণাটি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। 'অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পারে তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।' এর পরে আর মুখ্যতঃ কোন কথাই উঠতে পারে না অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কটাক্ষের লক্ষ্য যে শশধর তর্কচূড়ামণি একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ 'সমাজ' গ্রন্থের 'হিন্দু বিবাহ' প্রবন্ধেও প্রাচীন কুপ্রথাগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদানকে কটাক্ষ করেছেন। চন্দ্রনাথ বসু মূলে বঙ্কিম শিষ্য হলেও পরে তিনি শশধরকে মান্য করতেন এবং শশধরের 'ধর্ম' শব্দের ব্যাখ্যা শুনে তিনি শশধরের অনুগামী হন। উপরে 'হিং টিং ছট্' কবিতাটির যে অংশ উদ্ধৃত করেছি তার শেষ সাতটি পংক্তি বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি প্রমাণিত হবে। 'আণব চৌম্বক', 'জীবাত্ম বিদ্যুৎ' প্রভৃতি শব্দ হাঁচি-টিকির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শশধর তর্কচূড়ামণিই ম্যাগনেটিজম্-মাহাত্ম্য এ রকম ভাবে প্রচার করেছিলেন। কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক্—

'চিন্তামণি। এই দেখুন দেখি! এই সকল বিষয় কিছু মাত্র আলোচনা না করেই, অনুসন্ধান না করেই আপনারা বলেন য়ুরোপীয় বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। অথচ

আর্যরা হাঁচে কেন, হাই তোলে কেন, তেল মাখে কেন, এ আপনারা কিছু জানেন না।

হরিহর। আচ্ছা মশায়, আপনিই বলুন। তেল মাখবার পূর্বে ভূমিতে তৈল নিক্ষেপ করবার কারণ কী?

চিন্তামণি। ম্যাগনেটিজম্। আর কিছু নয়। ইংরেজিতে যাকে বলে ম্যাগনেটিজম্।

হরিহর। (সবিস্ময়ে) আপনি ম্যাগ্‌নেটিজম্ সম্বন্ধে ইংরেজি বিজ্ঞানশাস্ত্র কিছু পড়েছেন?

চিন্তামণি। কিছু না। দরকার নেই। বিজ্ঞান শিক্ষা কিম্বা কোনো শিক্ষার জন্য ইংরেজি পড়বার কিছু প্রয়োজন নেই। আমাদের আর্যেরা কী বলেন? প্রাণশক্তি, কারণ শক্তি এবং ধারণশক্তি এই তিন শক্তি আছে, তার উপরে তৈলের সাধারণ শক্তি যোগ হয়ে ঠিক স্নানের অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক কারণ শক্তির উত্তেজনা হয়—এই তো ম্যাগনেটিজম্। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজেরা স্নানের পরে যে গায়ে তোয়ালে ঘষে, তার কত হাজার বৎসর আগে আমাদের আর্যদের মধ্যে গামছা দিয়ে গাত্র মার্জনা প্রথা প্রচলিত ছিল ভাবুন দেখি!

চিন্তামণি। ওই দেখুন, ওই আর্য ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যে ফুল তুলছে—কেন তুলছে বলুন দেখি?

অদ্বৈত। পূজার সময় দেবতাকে দেবে বলে।

চিন্তামণি। ছি ছি, আপনারা কিছুই গভীর তলিয়ে দেখেন না। সকালে ফুল তুলতে যখন ঋষিরা অনুমতি করেছেন তখন স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে যে, বাতাসে অক্সিজেন বাষ্প যে আছে এ তাঁরা জানতেন। তা যখন জানা ছিল, তখন অবশ্য অন্যান্য বাষ্পের কথাও তাঁরা জানতেন সন্দেহ নেই। এই রকম একে একে অতি স্পষ্ট প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে, আধুনিক য়ুরোপীয় রসায়ন-শাস্ত্রের কিছুই তাঁদের অগোচর ছিল না। হাই তোলবার সময় তুড়ি দেওয়া হয় কেন? সেও ম্যাগ্‌নেটিজম্। উত্থান বায়ুর সঙ্গে আধান শক্তির যোগ হয়ে যখন ভৌতিক বলে পরিচালিত নিধানশক্তি স্বশক্তির প্রভাবে প্রাণ কারণ এবং ধারণ এই তিনটেকে অতিক্রম করতে থাকে তখন সত্ত্বঃ রজঃ এবং তমঃ এই তিনেরই ব্যতিক্রম দশা ঘটে। এমন সময়ে মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঘর্ষণ-জনিত বায়ুর তাপের কারণভূত স্নায়ব তাপ সৌর তাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবদেহের

ভৌতিক তাপের আত্যন্তিক প্রলয়দশা ঘটিতে দেয় না। একে বিজ্ঞান বলে-নাতো কাকে বিজ্ঞান বলে? অথচ আমাদের আর্য ঋষিগণ ডারুয়িনের কোনো গ্রন্থই পড়েন নি।''[১৯]

উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হলেও তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মনোভাব বুঝবার পক্ষে তা খুবই সহায়ক। বিজ্ঞান না শিখেও, তিনি যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতেন তা এমনি উদ্ভট, অবাস্তব বলেই মনে হতো। সবচেয়ে আপত্তিকর হলো, তাঁর আর্য বিষয়ক মতবাদ। তিনি হিন্দুকেই শুধু আর্য বলেছেন, আর্য কি জাতি, না গুণ, সে-বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। শুধু হিন্দুকেই আর্য বলে অভিহিত করলে সত্যের অপলাপ হয়, মিথ্যা ও গোঁড়ামিকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাই করেছেন, অথচ আর্য কাকে বলে তার কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ 'হাস্যকৌতুকে' সে কথা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

'অদ্বৈত। আর্য জিনিসটা কী মশায়?

চিন্তামণি। (বিস্মিত হইয়া) আজ্ঞে, আর্য কাকে বলে জানেন না? আমি আর্য, আমার বাবা শ্রীনকুড় কুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা ৺নফর কুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা—

'অদ্বৈত। বুঝেছি। আপনাদের ধর্মটা কি?

চিন্তামণি। বলা ভারি শক্ত। সংক্ষেপে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, যা অনার্যদের ধর্ম তা আর্যদের ধর্ম নয়।

অদ্বৈত। অনার্য আবার কারা?

চিন্তামণি। যারা আর্য নয় তারাই অনার্য। আমি অনার্য নই, আমার বাবা শ্রীনকুড় কুণ্ডু অনার্য নয়, তাঁর বাবা—

অদ্বৈত। আর বলতে হবে না। অতএব যে-হেতুক শ্রীনকুড় কুণ্ডু আমার বাবা নন এবং ৺নফর কুণ্ডুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমিই হচ্ছি অনার্য।'

বেশ বুঝা গেল, এঁদের আর্য-মতবাদটা অন্তঃসারশূন্য একটা গোয়ার্তুমি মাত্র। খুব সম্ভবতঃ এ্যানি বেসান্ত ও পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের হিন্দু প্রশস্তির পর থেকেই এই আর্যবাদের সূচনা হয়েছিল। 'মোক্ষমুলর বলেছে 'আর্য', তাই শুনে সব ছেড়েছি কার্য, মোরা বড় বলে করেছি ধার্য, আরামে পড়েছি শুয়ে।' (বঙ্গবীর 'মানসী')। কিন্তু পণ্ডিত তর্কচূড়ামণি অনেক সময় নিজের ইচ্ছামত এই আর্যবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পূর্বে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন-বর্ণই যখন বর্তমান ছিল, তখন তিন বর্ণকে এক সঙ্গে বোঝাবার জন্য আর্য

শব্দের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রায় লুপ্ত হয়েছে ; সুতরাং এখন আর্য শব্দেরও কোন অর্থ হয় না। 'বর্তমান কলিযুগে ভারতবর্ষের কোনো জাতি-বিশেষকে অথবা কোনো জাতি সমষ্টিকে লক্ষ্য করিয়া জাতিবাচক অর্থে আর্যশব্দ ব্যবহার করা নিতান্তই বিড়ম্বনা।'[২০] শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন। আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত করার জন্য তাঁর যুক্তিপূর্ণ মতগুলি তুলে ধরা যায়। সত্যি ম্যাক্সমূলারের আর্য এবং অমরকোষের আর্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। 'ম্যাক্সমূলারের বৈজ্ঞানিক আর্য এবং তাঁহার শিষ্যদিগের সঙ্ আর্য দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।' তিনি চার শ্রেণীর আর্যের কথা বলেছেন।

'১. বৈদিক আর্য--ভারতের প্রাচীনতম আর্য যা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য— এই তিন বর্ণের মূল উপাদান—তাই বৈদিক আর্য—

২. পৌরাণিক আর্য—এর কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নেই, সদাচার পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই এই শ্রেণীভুক্ত।

৩. বৈজ্ঞানিক আর্য—এটাই ম্যাক্সমূলার-কথিত আর্য। এখানে কোন ভেদাভেদ নেই। ইংরেজ, বাঙ্গালী, ফরাসী, জার্মান, রুশ, পোল, সকলেই ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মেলামেশা করে। এর একমাত্র কথা 'উদার চেতসাং পুংসাং বসুধৈব কুটুম্বকং'—উদারচেতা পুরুষদের সমস্ত পৃথিবীই জ্ঞাতি-কুটুম্ব।

৪. সঙ্ আর্য—'এইটিই গোস্বামীর শিষ্যদিগের আর্য ; এ আর্য বৈদিক আর্য নহে ইহা বলা বাহুল্য ; কেননা, সত্য-যুগের বৈদিক আর্য যাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের মূল এবং ত্রেতা-যুগের বৈদিক আর্য যাহা এই তিন বর্ণের সমষ্টি এবং দুই আর্য কলিযুগের ত্রিসীমানার মধ্যেও স্থান পাইতে পারে না—কেমন করিয়াই বা স্থান পাইবে? এ আর্য পৌরাণিক আর্যও নহে ; কেন না পৌরাণিক আর্য জাতি—বিচার না করিয়া সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রকেই ক্রোড়ে লইতে প্রস্তুত—গুহ চণ্ডালকেও তিনি ত্যাজ্যপুত্র করেন নাই। পৌরাণিক আর্য সদাচারের পক্ষপাতী—সঙ্ আর্য সদসৎ সকল প্রকার লোকাচারের পক্ষপাতী, এ আর্য সামান্য একটি লোকাচারের পান হইতে চুন খসিলেই—কি যেন একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়াছে মনে করে ;

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হইয়া বিলাত-ফেরতাদিগের প্রতি গোবরের ব্যবস্থা করে; চাল নাই খাঁড়া নাই নিধিরাম সর্দার হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে; নিরীহ সেকেলে পৌরাণিক আর্যের সাধ্য কি যে এ আর্যের নিকটে এগোয়!...স্পষ্ট কথা বলিতে কি—এ আর্য আর্যই নহে কেবল আর্যের একটা ভান—আর্যের একটা প্রহসন! একটি জ্যেষ্ঠতাত বালক যে-রকমের জ্যেষ্ঠতাত—এ আর্যটি ঠিক সেই রকমের আর্য! জ্যেষ্ঠতাত বালকের জ্যাঠামি যেমন একটা রোগ, এ আর্যের আর্যামি তেমনি একটা রোগ।'[২১] তর্ক চূড়ামণি মহাশয়দের আর্যবাদ এই শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা ভারতের সবকিছু ভাল বলে প্রচার করেন, ইউরোপের সমস্ত কিছু নিন্দনীয় বলে বিষবৎ পরিত্যাগ করতে বলেন। তাঁরা এমন ভাব দেখান যে, ভারতে 'দ্যূতক্রীড়া ছিল না—রমণীহরণ ছিল না—দ্বেষ হিংসা মদ মাৎসর্য এসব কোনো বালাইই ছিল না—প্রত্যুত সকলেই ঋষ্যশৃঙ্গের ন্যায় ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে তপস্যা করিয়া বেড়াইতেন! তাহার পরে কালিদাসের সময়ে যেন ভারতবর্ষীয় আর্যেরা মদ্যপান বেশ্যাসক্তি অভিসার এ সকল কিছুই জানিতেন না—সকলেই জিতেন্দ্রিয় যোগীপুরুষ ছিলেন! রঘুনন্দনের ন্যায় দিগ্বিজয়ী স্মার্তবাগীশেরা মূল গ্রন্থসকলের শব্দ এবং অর্থ অবলীলাক্রমে উল্টাইয়া দিয়া (এমনকি এর পেট কাটিয়া তাহাকে র করিয়া গড়িয়া তুলিয়া) যেন ছয়কে নয় করিতে জানিতেন না—প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না! ভারতবর্ষের আর্যেরা সকলেই যুধিষ্ঠির, সকলেই রামচন্দ্র! আর ইউরোপীয় আর্যেরা সকলেই চাণক্য, সকলেই শকুনি! কি চমৎকার সমতা!'[২২] এই আর্যামি রোগের প্রধান লক্ষণ সংকীর্ণতা—অপরের বিরুদ্ধে অহেতুক কুৎসা রটনা করে নিজেদের অলীক প্রাধান্যের কাহিনী সৃষ্টি। এই নব্য-আর্যরা উনিশ শতকের সভ্যতাকে উড়িয়ে দেবার জন্য কেউ টিকি রেখে, কেউ ফোঁটা কেটে, কেউ গেরুয়া পরে, আর কেউ পৈতার গোছা দ্বিগুণ চতুর্গুণ করে, এক একজন মহা মহোপাধ্যায় সেজে বুক ফুলিয়ে আসরে নেমেছিলেন। এই উগ্র মতবাদের ফলে তাঁরা হাতে-লেখা পুঁথি ছাড়া আর কিছু পড়তেন না। গেরুয়া ছাড়া কাপড় পরতেন না, খড়ম ছাড়া অন্য পাদুকা ব্যবহার করতেন না। এটা সত্যি রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। 'স্বদেশ' ও

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী'তে রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। 'স্বদেশ' গ্রন্থের 'নূতন ও পুরাতন' (১২৯৮) শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'কিন্তু সম্প্রতি ব্যাপারটা এই রকম হয়েছে যে, আমরা জটা নখ কেটে ফেলেছি বটে, সংশয়ের মধ্যে প্রবেশ করে সমাজের লোকের সঙ্গে মিশতেও আরম্ভ করেছি, কিন্তু মনের ভাবের পরিবর্তন করতে পারিনি। এখনও আমরা বলি, আমাদের পিতৃ পুরুষেরা শুধুমাত্র হরীতকী সেবন করে নগ্নদেহে মহত্ত্বলাভ করেছিলেন, অতএব আমাদের কাছে বেশভূষা আহার বিহার চাল চলনের এত সমাদর কেন। এই বলে আমরা ধুতির কোঁচাটা বিস্তার পূর্বক পিঠের উপর তুলে দিয়ে দ্বারের সম্মুখে বসে কর্মক্ষেত্রের প্রতি অলস অনাসক্ত দৃষ্টিপাত পূর্বক বায়ু সেবন করি। এটা আমাদের স্মরণ নেই যে, যোগাসনে যা পরম সম্মানার্হ সমাজের মধ্যে তা বর্বরতা। প্রাণ না থাকলে দেহ যেমন অপবিত্র, ভাব না থাকলে বাহ্যানুষ্ঠানও তদ্রূপ।' এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, আর্যামি রোগ হলেও তা একটা বিশেষ উপকারে এসেছিল। দেশ থেকে 'সাহেবিআনা' দূর করতে এর সক্রিয় সহায়তা বিশেষ কাজে লেগেছিল। একথা ঠিক নয়। 'সাহেবিআনা' ও উনিশ শতকীয় সভ্যতা এক নয়। 'সাহেবিআনা' খুবই খারাপ জিনিস সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহেবিআনার নামে উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা অন্ধ গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন ভৌগোলিক সীমারেখা নেই, তা বিশেষ কোন দেশের বা জাতির নয়—সমগ্র মানব জাতির সম্পদ।

শুধু 'আর্য' 'আর্য' না করে, আর্য গুণ অর্জন করতে পারলেই অনেক কাজ হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পণ্ডিত তর্কচূড়ামণিরা অন্তঃসারশূন্য লোকাচারকে প্রাধান্য দিয়ে সেই গুণাবলীর দিকে ফিরেও তাকান নি। ফলে সাহেবিয়ানা ও আর্যামি সমগোত্রীয় জিনিসে পরিণত হয়েছিল। 'আর্যামিও যেমন, সাহেবিয়ানাও তেমনি—দুইই সমান, দুইই নারিকেলের শাঁস ফেলিয়া ছোবরা ভক্ষণ।' আর একটি কথা, আর্যধর্ম অনেকটা গুণ বিশেষ। পৃথিবীর যে-কোন দেশের মানুষ এই গুণগুলি অর্জন করতে পারলেই আর্যনামে চিহ্নিত হতে পারেন। ইউরোপ এবং অন্যান্য মহাদেশেও অনেক গুণবান মানুষ আছেন যাঁদের অনার্য বলে মনে করা চরম গোঁড়ামি ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। এমন কি, স্বামী বিবেকানন্দও 'ভারতবর্ষকেই একমাত্র আর্যদের দেশ মনে করেন নি; তিনি আর্যধর্ম বলতে গুণকেই বুঝেছিলেন। 'প্রবুদ্ধ ভারতের' জনৈক

প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'ভারত কেন সমগ্র আর্য জাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, তাহার কি কোন যুক্তি আপনি নির্দেশ করিতে পারেন? ভারত কি বুদ্ধিবৃত্তিহীন? কলাকৌশলহীন?'[১৩] এখানে 'সমগ্র আর্য জাতি' কথাটি লক্ষণীয়; তিনি যে কোন বিশেষ দেশকে আর্যবাসভূমি মনে করতেন না—এটা তারই প্রমাণ। তাছাড়া 'গুণ'কে তিনি জাতি বা সম্প্রদায় বলে মনে করতেন না। এই গুণ পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, সেদেশ সত্যি বরণীয়। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর বালাবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। 'ব্রাহ্মণ জাতি আর ব্রাহ্মণের গুণ—দুটো আলাদা জিনিস। এখানে সব জাতিতে ব্রাহ্মণ, সেখানে গুণে। যেমন সত্ত্ব: রজ: তম:—তিনটে গুণ আছে জানিস্, তেমনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বলে গণ্য হবার গুণও আছে। এই তোদের দেশের ক্ষত্রিয়-গুণটা যেমন প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, তেমনি ব্রাহ্মণত্ব গুণটাও প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। ওদেশে এখন ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্ব পাচ্ছে।'[১৪] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, স্বামী বিবেকানন্দ শশধর তর্কচূড়ামণির খাদ্যাখাদ্যের বাছ বিচারকে 'পৌরোহিত্যের আহাম্মকি' বলে অভিহিত করেছিলেন। (পত্রাবলী, ১ম ভাগ, ৬৭ নং পত্র)।

শুধু আর্যবাদ নয়—অন্যান্য বিষয়ে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আরো কিছু মতবাদ অনেকের কাছে আপত্তিকর বলে মনে হবে। সম্পূর্ণ মানুষ ভারতেই সম্ভবপর বলে তিনি যে যুক্তিগুলি দেখিয়েছেন, সেগুলি শুনতে ভাল লাগলেও সত্য নয়। ইউরোপে ঋতুচক্রের আবর্তন-বিবর্তন বেশী না হলেও, সেখানকার মানুষ ভারতবাসীর তুলনায় কম দক্ষ, কম কর্মঠ একথা কি স্বীকার করা যায়? আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক—এই উভয় উন্নতি ভারত ছাড়া আর কোনো দেশে হয়নি, একথাও ঠিক নয়। বৈষয়িক উন্নতিতে বরং আমাদের দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় শত যোজন পিছিয়ে আছে—একথা অস্বীকার করলে সত্যকেই অস্বীকার করা হয়। পৃথিবীর অন্যত্রও গুণী, জ্ঞানী ও অধ্যাত্ম-পরায়ণ মানুষের অভাব নেই। ধর্মের দ্বারা যদি স্বাস্থ্য ভালো হয় তবে তো ইউরোপীয়রাই সবচেয়ে বেশি ধার্মিক। কারণ, তাদের স্বাস্থ্য আমাদের তুলনায় অনেক ভালো।

'ধর্মের দ্বারা জাতীয়তা ও সমাজ রক্ষা' প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন, তা অনেকটা 'হিং টিং ছট' মাত্র। ধর্মকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভারতের

মতো বহু ধর্মপূর্ণ দেশে কোন্ ধর্মকে প্রাধান্য দিতে হবে সে কথা তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলেন নি। তবে কি হিন্দুধর্মকে বাদ দিয়ে অন্য ধর্মগুলিকে লোপ করে দিতে হবে? সেটাতো চরম ধর্মান্ধতার উদাহরণ হিসাবে গণ্য হবে। যুগ যুগ ধরে ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে যে পরমত সহিষ্ণুতা ও উদার ধর্মবোধ জেগে উঠেছে, তা কি নস্যাৎ করে দিতে হবে? এই গোঁড়ামি অনেকের পছন্দ হবে না। আইন সভার সদস্য স্যার এণ্ড্রু ১৮৯০ খৃ: যে 'সহবাস সম্মতি বিল' (Age of consent Bill) এনেছিলেন তর্কচূড়ামণি মহাশয় হিন্দুর গর্ভাধান সংস্কারের উপর আঘাত পড়বে বলে তার বিরোধিতা করেন। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও তাঁর ভক্ষ্য-অভক্ষ্য বাছ বিচার ছিল। ১৩৩৪ সালের (ফাল্গুন) 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' পত্রিকায় মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য মহাশয়ের 'চূড়ামণি স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখা যায়, 'তিনি মৎস্য, মাংস, বিলাতি কপি, আলু ভোজন করিতেন না।' মাছ-মাংস না খেতে পাবেন, কিন্তু অন্যান্য নির্দোষ জিনিস নিছক বিলাতি বলে না খাওয়া তাঁর গোঁড়ামির পরিচয়।

কিন্তু খাদ্যের ব্যাপারে এই কড়াকড়ি করলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে ভাঙ্গন ধরেছিল। অনেকে বাইরে হিন্দুত্ব বজায় রাখলেও ব্যক্তিগত জীবনে উগ্র আধুনিকতার উদ্দাম স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'হাসির গানে' এদের সম্বন্ধে লিখেছেন,

আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer
কোন ধর্মের ধারি না ধার,
করি hoot alike the Hindoos, the Budhists,
the Mahomedans, Christians and Jews ;—
কিন্তু ফলার ভোজে হিন্দু নই it you think,
তা'লে you are an awful goose.

* * *

From the above দেখতে পাচ্ছ বেশ,
যে আমরা neither fish nor flesh ;
আমরা Curious Commodities, human
Oddities, denominated Baboos,
আমরা বক্তৃতায় যুঝি ও কবিতায় কাঁদি কিন্তু কাজের
সময় সব ঢুঁ ঢুঁ's,

আমরা beautiful muddle, a queer amalgum
of শশধর, Huxley, and goose'[২৫]

এর মধ্যে একটুও অতিশয়োক্তি নেই। শশধর তর্কচূড়ামণির এই লোকাচার সর্বস্বতার জন্য বড় বড় মনীষীরা একে একে দূরে সরে দাঁড়ালেন। হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি প্রথমে যখন কাজ সুরু করেছিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র কৌতূহলী হয়েছিলেন। তিনিও ভেবেছিলেন বিদেশী 'থিওসফিষ্ট'রা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যা বলেছে, শাস্ত্রজ্ঞ স্বদেশী কোন পণ্ডিতের মুখে তা শুনলে হিন্দুধর্মের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা বাড়বে। 'এজন্য থিওসফি বিদেশীয় মুখে যাহা বলিতেছেন, তাহা শাস্ত্র ব্যবসায়ী কেহ বলিলে, ইহাদের মুখ বন্ধ হইবে বিবেচনা করিয়া, বোধ হয়, পূজনীয় বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি সেই অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত চূড়ামণিকে এই ব্রতে ব্রতী করিলেন।'[২৬]

কথাটি হয়তো সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের এ বিষয়ে কিছুটা আগ্রহ ও ঔৎসুক্য থাকলেও, তিনি বরাবরই দূরে দূরে ছিলেন। ১৮৮৪ খৃঃ জুন মাসের শেষ দিকে এলবার্ট হলের যে সভাগুলিতে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বক্তৃতা করেছিলেন, বঙ্কিমবাবু সেই সভায় পৌরোহিত্য করলেও এর পর এ বিষয়ে তিনি আর কোন কৌতূহল দেখান নি। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা' নামক প্রবন্ধে ('বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি' থেকে উদ্ধৃত) বলেছেন, 'আসল কথা এই যে, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া বঙ্কিমবাবুর সাহায্য চান। তাহার নিকট সাহায্য চাহিবার কারণ এই যে তখন তিনি 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু স্বীকৃত হইলে তাঁহার বাটীতে ঐ উদ্দেশ্যে একটি অন্তরঙ্গ সভা বসে; তাহাতে অনেক সাহিত্যিক ও স্বধর্মনিষ্ঠ ভদ্রলোক উপস্থিত হন। Albert Hall বক্তৃতার স্থান স্থির হইল; প্রথম দিবসে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যে শ্রোতা ছিলেন, এমত নহে, তিনি সভাপতিত্বে বৃত হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে শ্রোতাদিগের নিকট পরিচয় করাইয়া দিলেন। তারপর দুই একদিন মাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর যান নাই। তাঁহার বিবেচনায় চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যাত ধর্ম এক্ষণে এই দেশের উপযোগী নহে।' খুব সম্ভবতঃ চূড়ামণি মহাশয়ের লোকাচার সর্বস্বতা তাঁর পছন্দ হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম —বথামি নয়। 'ধর্মই ধর্ম, আচার ধর্ম নহে। হিন্দু ধর্ম মানি, হিন্দুধর্মের

বথামি মানিনা।'[২৭] 'নবজীবন' পত্রিকায় (১ম খণ্ড) 'ধর্ম ও ধর্মের অনুষ্ঠাতা' প্রবন্ধটি কাটছাটের অভিযোগে তর্কচূড়ামণি মহাশয় সেই পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। আসলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর অনুসারীদের যুক্তিপূর্ণ ধর্ম-বিশ্লেষণ সহ্য করতে পারেন নি, তাই তিনি সে যুগের চরম গোঁড়া পত্রিকা— 'বেদব্যাসের' (১২৯৩) সঙ্গে যুক্ত হন। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের শিষ্য ভূধর চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্যহিন্দুদের ধর্মব্যাখ্যাকে কটাক্ষ করা হয়েছিল। 'হিন্দুধর্মের প্রকৃত মহিমা কীর্তনই বেদব্যাসের উদ্দেশ্য। আজ অনেকেই ধর্মের নিগূঢ় রহস্য বুঝিবার জন্য উৎসুক। কিন্তু দুঃখ এই. ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। অনেকে ভ্রমব্যাখ্যা পড়িয়া বিপথে যাইতেছেন। এ দৃশ্য বড়ই শোচনীয়। মহা মহিমাময় পণ্ডিতগণের সাহায্যে শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা বেদব্যাসে যথানিয়মে প্রকাশিত হইবে।' এই পত্রিকায় (১ম ভাগ, ১২৯৩) নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় 'নব্যহিন্দু' শীর্ষক প্রবন্ধে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিকে তীব্র আক্রমণ করেন। এদিক থেকে নব্য হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি লিখেছিলেন, 'নব্যহিন্দুর সহিত ব্রাহ্মের প্রভেদ কী? ব্রাহ্মও যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন। যেখানে শাস্ত্র যুক্তিনামানুযায়ী সেখানে ব্রাহ্মও শাস্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। ব্রাহ্ম জাতিভেদ মানেন না। কারণ জাতিভেদ শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও তাহাদের মতে যুক্তি বিরুদ্ধ। অতএব জাতিভেদ না মানিলেও হিন্দুত্বের ব্যাঘাত হয় না। এই রূপে বেদ-পুরাণ কীর্তিনাশায় ভাসাইয়া দিয়াও হিন্দু হওয়া যাইতেছে। কারণ শুনিতেছি যে, যুক্তিই হিন্দুধর্মের ভিত্তি। অনুষ্ঠানাদি না করিয়াও হিন্দু হওয়া যাইতে পারে। কারণ কেহ বলিতে পারেন যে, অনুষ্ঠান শাস্ত্রবিহিত হইলেও যুক্তি বিহিত নহে।' সম্পাদক ভূধর চট্টোপাধ্যায় ধারাবাহিকভাবে 'মনুসংহিতা' সম্বন্ধে আলোচনা করে মনুর বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সমর্থন করেছিলেন। তাছাড়া 'অনুষ্ঠান' নামক প্রবন্ধে (১ম ভাগ, ১২৯৩) বীরেশ্বর পাঁড়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবই হিন্দুধর্মের দুর্দশার কারণ বলে অভিহিত করেছিলেন। একটি প্রবন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, পুরাণতন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুর পরম গৌরবের বিষয় বলে উল্লেখ করেছিলেন। ২য় ভাগ দশম ও দ্বাদশ খণ্ডে (১২৯৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী যথাক্রমে 'বাল্যবিবাহ' ও 'বর্ণাশ্রম ধর্মে'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

'সহমরণ': নামক প্রবন্ধে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সতীদাহ, সহমরণ প্রথার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। এই রক্ষণশীলতার জন্য সে যুগের নবীনচন্দ্র সেনের মত কৃতবিদ্য ব্যক্তিও বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 'শুনিলাম যে, 'নবজীবন' মাসিক পত্রে হিন্দুধর্মের এ আধ্যাত্মিকতা ইংরাজী শিক্ষার পথে বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎশিষ্যগণ এবং হিন্দুশাস্ত্রের পথে এই শক্তি সম্পন্ন পণ্ডিত ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রচার করিবেন স্থির হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত হিন্দুধর্মের আবর্জনা-ব্যবসায়ীর দল দেখিল যে, তাহাদের ব্যবসা মারা যায়। তখন তাহারা এই চূড়ামণিকে হস্তগত করিয়া তাহাদের দলভুক্ত করিল, আর তিনিও দেশপূজ্য স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 'বেদব্যাস' পত্রিকায় বেদব্যাস হইলেন।'[২৮] এই মন্তব্য থেকে মনে হয়, প্রথমে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উপর নবীনচন্দ্রের কিছুটা আস্থা ছিল, শাস্ত্র-ব্যবসায়ীদের পাল্লায় পড়ে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের এই অধঃপতন হলে তাঁর সেই আস্থা নষ্ট হয়। কিন্তু তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের শাস্ত্র ব্যাখ্যাই কি ব্যবসায়ীদের অনুপ্রাণিত করেনি? যাই হোক, এর পর থেকে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের জনপ্রিয়তা দিন দিন হ্রাস পায়। হিন্দুধর্মের ধারক ও বাহকদের অনেকেই, বিশেষভাবে শিক্ষিত সমাজ তাঁর উপর বিরূপ হয়ে উঠে। তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে ধর্মপ্রচার করতে উদ্যোগী হন কিন্তু তাতেও স্থায়ী কোন ফল ফলেনি। তাছাড়া ধর্মের নামে অধর্মকে প্রশ্রয় দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। কেউ কেউ বলেন, সীতা-কুণ্ডের দুরাচারী মোহন্তকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। সাধারণের কাছে হিন্দুধর্মের যে মাহাত্ম্য তিনি প্রচার করেছিলেন, তা-ও বিশেষ কোন কাজে লাগেনি। জনসাধারণ যা সহজে পেয়েছিল, সহজেই তা ভুলে গিয়েছিল। নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রামে হিন্দুধর্ম প্রচারের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্ম-জীবনীতে। এই আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতা সেখান থেকেই বোঝা যাবে—'প্রচারক চূড়ামণি মানুষের আত্মার আকৃতি, ও প্রবৃত্তির সেরা মাপ ওজন পর্যন্ত বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম 'হিন্দুধর্মের অর্থ কি বুঝাইয়াছেন?' উত্তর—"কই, তাহাত কিছু বলেন নাই। প্রশ্ন—হিন্দুধর্ম কি? উত্তর—তাহাও কিছু বলেন নাই।" তবে আর হিন্দুধর্ম বুঝিবার বাকী কি? দিন কতক এরূপ প্রচারে ও প্রচারকে দেশের লোক জ্বালাতন হইয়া উঠিয়া-ছিল। আমার অমৃত ভায়ার 'হল হলানন্দস্বামী'তে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের চীৎকারে গগণ বিদীর্ণ হইতেছিল। কিন্তু শ্রীভগবানের রাজ্যে

প্রবঞ্চনা চিরস্থায়ী হয় না। মানুষ একবার মাত্র কি বিজ্ঞাপন বা বক্তৃতার চোটে প্রবঞ্চিত হইতে পারে। আজ সেই প্রচার ও প্রচারক উভয়েই নির্বাণ লাভ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে ডারউইনি টিকি সমূহও সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য না হইলে, দৈর্ঘ্যে অনেক হ্রস্ব হইয়াছে। পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া ডারউইনি অভিব্যক্তিবাদ মতে মনুষ্যত্বলাভের আর বড় বাকী নাই।'[২৯]

এই বিরুদ্ধতার কারণ—যুগকে তিনি বুঝতে পারেন নি; যুগ-জীবনের চাহিদা মেটাতে পারেন নি। যুগ-পরিবর্তনের দিকে না তাকিয়ে অনমনীয়, অপরিবর্তনীয় মনোভাব পোষণের ফলে বিশৃংখলা দেখা দেয়। 'Bengalee' পত্রিকায় 'A social question' নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এ বিষয়ে যা লেখা হয়েছিল তা যেন শশধর তর্কচূড়ামণির উদ্দেশ্যেই এক চরম সতর্কবাণী। …'We hear in these days a great deal about the revival of Hinduism. But the true revival could not consist in affording specious explanations of exploded beliefs or in reverting back to meaningless forms and external ceremonies from which all life is gone.'

সংস্কার বিরোধী ব্যক্তিরা অনেক সময় প্রাচীন ঋষিদের দোহাই দিতেন। এ সম্বন্ধে 'Bengalee'-র সেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছিল, 'would they advocate caste in its present shape, with all its rigid exclusiveness, with all its iron-bound rules, which, however suited to the requirements of primitive society, are wholly out of place in an age, which, casting its foundations deep in the past, combines the elements of order with those of progress? Would they not suggest changes to suit the changed times?'[৩০]

নবীনচন্দ্রের কথাই অনেকটা সত্যে পরিণত হয়েছিল। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মতবাদের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং বিরোধী মনোভাব ক্রমশঃ দেখা দিতে থাকে। 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' (১৩৩৪, পৃ: ২৪৭) পত্রিকায় দেখা যায়, ১২৯৩ সালে তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যেই মহাকবি ধূর্জটি প্রণীত 'একাদশ অবতার' বা পঞ্চানন্দ মঙ্গল নামক অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত মহাকাব্য প্রকাশিত হয়েছিল।[৩১] এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় সে যুগের যুক্তিবাদী 'হিন্দুপুনরভ্যুত্থানবাদী'দের (ভূদেব

মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি) পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতো তিনিও হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের দ্বিতীয় ধারাকে অর্থাৎ হিন্দুত্বের আস্ফালনকে বেশি প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। ফলে দেশের শিক্ষিত জন সাধারণের মধ্যেও বিরোধিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় নয় একথা প্রমাণ করতে গিয়ে যে পরাশর বচনকে ভিত্তি করে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ সমর্থন করেছিলেন, সেই ব্যাখ্যা ভুল বলে তর্কচুড়ামণি মহাশয় অভিহিত করেছিলেন।'[৩২] এসব মন্তব্যে অনেকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। একবার কলকাতার সংস্কৃত কলেজে বক্তৃতা দেবার সময় একদল লোকের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি সভাত্যাগ করতে বাধ্য হন ('ব্রাহ্মণ-সমাজ', ১৩৩৪, পৃ: ২৫৬)। এসব কারণে তাঁর উৎসাহ কমে যায়। তিনি কর্মজগতের কলকোলাহল থেকে বহরমপুরে ফিরে যান। সেখানে অন্নদাপ্রসাদ রায়ের বিধবা পত্নী আন্নাকালী দেবীর প্রতিষ্ঠিত টোলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং শাস্ত্রানুশীলন ও গ্রন্থ রচনায় জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন।[৩৩] 'দ্বিতীয়ার চাঁদ' শশধর তর্কচুড়ামণি পূর্ণ বিকশিত হবার আগেই এভাবে বিলীন হয়ে যান। ১৯২৮ খৃঃ তিনি মারা গেলেও আজ তাঁর জীবন-কাহিনী বিস্মৃত-প্রায়—অতীতের সামগ্রী।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৪৯—১৯০২)

১

পূর্ণানন্দস্বরূপ স্বামীর 'কুমার পরিব্রাজক' ও ক্ষেত্রনাথ সেনের 'শ্রীকৃষ্ণ সৎ কথামৃত গ্রন্থের ভূমিকা থেকে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সম্পর্কে জানা যায়, হুগলী জেলার গুপ্ত পাড়া গ্রামে বৈদ্য বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঈশ্বরচন্দ্র কবিভূষণ ছিলেন কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ। গঙ্গার মহিমা, গায়ত্রী উপাসনা এবং হরিনামের মাহাত্মে তাঁর অটল ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তাঁর মাতার নাম ভবসুন্দরী দেবী। পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রতিবেশী গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাঠশালায় প্রেরিত হন। সেখানে কয়েক বৎসর বাংলা শিক্ষার পর তিনি স্বগৃহে 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' অধ্যয়ন করেন, পরে গ্রামের নব প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালযে প্রেরিত হন। এর পর তিনি কিছুদিন মাতুলালয়ে থেকে কালনা মিশন স্কুলে ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। কিন্তু মিশনারীদের দ্বারা এদেশীয় বালকদের ধর্মান্তরিত করার উৎসাহ লক্ষ্য করে তাঁর পিতা কৃষ্ণপ্রসন্নকে বিদ্যালয় ছাড়িয়ে বাড়ী নিয়ে আসেন। পরে তিনি কৃষ্ণপ্রসন্নকে বহরমপুরে ভাগিনেয় পণ্ডিত শ্রীচরণ রায় কবিরাজ (মহারাণী স্বর্ণময়ীর চিকিৎসক) মহাশয়ের নিকট পাঠিয়ে দেন। সেখানে ছাত্রবৃত্তি লাভ করে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কলেজিযেট স্কুলে ভর্তি হন। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তাঁকে বাধ্য হয়ে অধ্যয়ন ত্যাগ করতে হয়। দুটি কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত্যুতে তাঁর পিতা কলকাতার চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করে গুপ্ত পাড়ায় বসবাস আরম্ভ করেন। সুতরাং বৃহৎ পরিবারে হঠাৎ অর্থাভাব উপস্থিত হয়। কৃষ্ণপ্রসন্ন পিতার অজ্ঞাতসারে জামালপুর রেলওয়ে অফিসে চাকরী নিলেন।

পিতৃবিয়োগের পব চাকরী ছেড়ে তিনি এক বৎসর ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, বাঁকীপুর, কাশী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন পরে কাশীতেই তিনি তাঁর ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত মত প্রচারের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৮৮৩ খৃঃ তিনি পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, মদন গোপাল গোস্বামী, 'কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ ও কাশীবাসী পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য ও রামমিশ্র

শাস্ত্রী প্রভৃতির সাহচর্যে আসেন। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি এ সময় তাঁকে প্রচারকার্যে অর্থ সাহায্য করেন। এঁদের মধ্যে বহরমপুরের অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর, মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী, পাকুড়ের রাজা তারেশচন্দ্র পাণ্ডে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দীনবন্ধু সান্যাল, কুণ্ডলার জমিদার কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৪ খৃঃ মাতার মৃত্যুর পর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এসময় হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েকমাস তাঁকে শয্যাগত থাকতে হয়েছিল। 'সহবাস সম্মতি' বিল ও 'গোহত্যা নিবারণ' আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

তিনি অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। 'বিজ্ঞাপনী', 'যোগ ও যোগী', 'স্বপ্নতত্ত্ব', 'শ্রাদ্ধতত্ত্ব', 'নীতিরত্ন মালা', 'পঞ্চামৃত', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'পরিব্রাজকের বক্তৃতা', 'শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি', 'ভক্তি ও ভক্ত', 'পরিব্রাজকের সঙ্গীত', 'শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী' তাঁর অন্যান্য প্রধান গ্রন্থ এ ছাড়া তিনি 'প্রবোধ কৌমুদী', 'শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র', 'রামগীতা, 'রামহৃদয়', 'মণি রত্নমালা', পরমার্থসার', 'হরের্নামৈব কেবলম্', 'সন্ন্যাসী' নামে কয়েকটি পুস্তিকাও লিখেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর 'গীতার্থ-সন্দীপনী' গীতার সহজ সরল ব্যাখ্যা।

২

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি নব্য হিন্দুধর্মের যদি অন্যতম ভাষ্যকার হন, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ছিলেন তার প্রধান বক্তা ও সংগঠক। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য না হলেও, বক্তৃতাগুলির দ্বারা সে অভাব তিনি অনেকটা পূরণ করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির সাহিত্যমূল্য নগণ্য বলা চলে। এজন্য কোন কোন সমালোচক সাহিত্যের দিক থেকে নব্য হিন্দুবাদের ধারায় কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণিকে বাদ দেবার পক্ষপাতী। প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর 'Essays in Criticism'—গ্রন্থের যেখানে নব্য রোমান্টিক আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে দুটি ধারার অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যথেষ্ট সৃজনশীল নয় বলে সেই ধারা থেকে তিনি কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির নাম বাদ দিতে চেয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ নব্য হিন্দুবাদকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন। একটি বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি কবি সাহিত্যিকদের ধারা, অপরটি শশধর তর্কচূড়ামণি ও

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের অ-সাহিত্যিক ধারা। আরও একটি ধারার কথা ব্রজেন্দ্রনাথ মনে হয় বাদ দিয়ে গেছেন; সেটি হল—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ধারা। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই তিনটি ধারা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন—'নব্য হিন্দু সমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌গ্রীব, কিন্তু কিসের উপর সে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে, তাহাই সে জানে না। এই সময় হইতে শিক্ষিত প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সমাজ হিন্দুর প্রাণবস্তু আবিষ্কারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন, এখন পর্যান্ত সেই মায়াকেন্দ্রের ব্যর্থ অনুসন্ধান চলিতেছে—অসংখ্য গুরু ও অবতার আসিয়াও সেই প্রাণকেন্দ্রে কেহ হিন্দুকে আশ্রয় দিতে পারিলেন না। প্রগতিপন্থী হিন্দু বা আদি ব্রাহ্মসমাজ উপনিষদের ব্রহ্মসাধনাকে সর্ব বর্ণ সম্প্রদায়ের মিলন কেন্দ্র বলিয়া প্রচার করিলেন, হিন্দু সমাজ তাহা গ্রহণ না করিয়া নবতর সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহারা কখনো কোম্‌তের পজিটিভিজমের চিত্তচমৎকারিতাকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন; কখনো যুগ যুগান্তরের পুঞ্জীভূত অন্ধ সংস্কারকে আজগুবি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা যুক্তি-সিদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন; কখনো কখনো 'আর্যামি'র অভিনব অত্যন্ত ধোঁয়াটে উপসর্গ আনিয়া বাঙালীর সহজ উদ্দীপ্য ভাবোচ্ছ্বাস বহ্নিতে ইন্ধন দিতেছেন; কখনও বা সকল প্রকার মত ও বিশ্বাসের মধ্যে তথাকথিত 'সংশ্লেষণ' বা সিন্‌থিসিস কল্পনা করিয়া 'সমন্বয়'-এর কথা বলিয়া গুরুবাদ তথা অবতারবাদ প্রচার করিয়া মনে করিতেছেন হিন্দুদের সকল সামাজিক আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিরাকৃত হইল।' এর মধ্যে প্রথমটি বঙ্কিমচন্দ্রের ধারা, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণি, তৃতীয়টি রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধারা।

সাহিত্যিক নির্মিতি কৌশলের অভাব কৃষ্ণপ্রসন্ন ও শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির মধ্যে বিশেষভাবে থাকলেও, এ ধারা থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া যায় না। এ-যুগের সাহিত্যিক গোষ্ঠীর একটি অংশ কৃষ্ণপ্রসন্ন ও শশধর তর্কচূড়ামণির মনোভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন; তাই তাঁদের কথা বাদ দিলে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের প্রয়াসের ইতিহাসটিই অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যায়।

'আর্য' ও 'আর্য্যমি' নিয়ে উনিশ শতকের শেষার্ধে যে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছিল, কৃষ্ণপ্রসন্ন তার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণিও এ বিষয়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রসন্নের মত সংগঠন শক্তি তাঁর ছিল না। কৃষ্ণপ্রসন্ন শুধু হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যাই করতেন না, ভারতব্যাপী

কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছিলেন। স্বধর্মের অবনতি ও বিধর্মের উন্নতি দেখে তিনি মুঙ্গেরে 'আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা' (১৮৭৫) প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে প্রতি রবিবার অপরাহ্নে সভাপণ্ডিত কর্তৃক প্রথমে শাস্ত্র ব্যাখ্যা হতো এবং পরে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা করতেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের পরে তিনি হরিদ্বারে 'ভারতবর্ষীয় আর্য ধর্ম প্রচারিণী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত-ব্যাপী এই ধরনের সংগঠনের জন্য ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সফর করে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এজন্য তিনি বেশ ভালভাবে হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। আর্যসমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার কেন্দ্র লাহোর, আলিগড়, মজঃফরপুর, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে তিনি অনেকবার সফর করেছিলেন। তার ফলে সে সব স্থানে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব অনেকটা হ্রাস পায়। মুঙ্গেরকেই তিনি প্রধান প্রচারকেন্দ্রে পরিণত করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর অনেকেই মুঙ্গেরকে কেন্দ্র করে তাঁদের প্রচার কার্য শুরু করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন মুঙ্গেরে প্রথম প্রচারাভিযান করেন। মুঙ্গেরকে কেন্দ্র করার কারণ হল, এই শতকে মুঙ্গের ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর প্রধান কর্মস্থল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বরাবর ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক ছিল; তাই এই সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করার জন্য ব্রাহ্ম ও হিন্দুরা সমান ভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিল। মুঙ্গেরে কেশব পন্থীদের 'নবপূজা' ও যীশুপ্রীতি ব্রাহ্ম ও হিন্দুসমাজকে সমানভাবে বিক্ষুব্ধ করেছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'অবতার পদের প্রতি কেশববাবুর কেন লোভ হইল বুঝিতে পারি না, আমাদের দেশে মাছও অবতার, কচ্ছপও অবতার।' মুঙ্গেরে 'আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা' প্রতিষ্ঠার পর তিনি বাংলা ও হিন্দী ভাষায় 'ধর্ম প্রচারক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ-পত্রিকার তত্ত্বাবধান করেছিলেন। সনাতন ধর্মের মহিমা প্রচারের জন্য তিনি ইংরাজীতে 'দি মাদার ল্যাণ্ড' (১৮৮৩) নামে এক পয়সা মূল্যের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। 'আর্যধর্ম প্রচারিণী সভায়' প্রতি রবিবার শাস্ত্র ব্যাখ্যার যে ব্যবস্থা ছিল সম্ভবতঃ তিনি ব্রাহ্ম সমাজের ধরনে তা প্রবর্তিত করেছিলেন। সেই যুগের শিক্ষিত সমাজকে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁকে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, এ-সময়ে 'আর্য' ও 'আর্যামি'র আন্দোলন বেড়ে গিয়েছিল। ম্যাক্সমূলার ভাষাতত্ত্বের সূত্রের সাহায্যে জাতিতত্ত্ব বিচার করে

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় ভাষার মূলগত ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করেন। 'আর্যামি'র সূত্রপাতের এও একটি কারণ।

'মোক্ষমূলর বলেছে 'আর্য',
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড়ো বলে করেছি ধার্য
আরামে পড়েছি শুয়ে।' ('বঙ্গবীর'—রবীন্দ্রনাথ)

এই মতবাদ সে যুগের হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যাতাদের বিশেষ হাতিয়ারে পরিণত হয়। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন হয়তো এই মতবাদের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিত হননি। যদিও তিনি হিন্দুদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অনেকগুলি সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তবুও মনে হয় এই 'আর্য' নাম আরোপের মূলে ছিল 'হিন্দু' শব্দের হীনতা লোপ করার চেষ্টা। 'আমরা আমাদের প্রচর্ত্তব্য ধর্মের নাম 'আর্য ধর্ম' বা 'হিন্দু ধর্ম' দিলে দিতে পারিতাম, কিন্তু যখন বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র প্রভৃতি আমাদিগের প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব-পূর্ণ গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করা যায়, তখন কুত্রাপি 'ধর্ম' এই প্রশস্ত শব্দ ভিন্ন 'হিন্দু' বা 'আয ধর্ম' এরূপ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায না। কেবল ইংরাজী, পারস্য ও অধুনাতন হিন্দী ও বাঙালা গ্রন্থাদিতে এইরূপ শব্দ লিখিত আছে মাত্র। 'হিন্দু ধর্ম' বা 'আর্য ধর্ম' এ দুটি নাম আধুনিক, এজন্য আমরা আমাদিগের চিরপ্রচলিত ও চির সম্মানিত ধর্মশাস্ত্রোক্ত 'ধর্ম' এই প্রশস্ত নাম পরিত্যাগ পূর্বক আধুনিক নামকরণ দ্বারা ভক্তিভাজন শাস্ত্রবেত্তাগণের বিরোধে বাক্যবিন্যাসে বাসনা করি না। বিশেষতঃ 'হিন্দু' এই শব্দটি পারস্য ভাষার; ইহার অর্থ 'কাফের', কৃষ্ণবর্ণ, বিধর্মী। মুসলমানগণ সিন্ধুনদ-পরপারবর্তীগণকে 'হিন্দু' বা 'কাফের' বলিত, এবং তাহা হইতেই ভারতবর্ষকে 'হিন্দুস্থান' বা 'কাফেরদিগের বাসস্থান' বলিয়া নাম দেওয়া হয়। মুসলমানগণের প্রাদুর্ভাব-কালে তাহাদের কঠোর শাসন-ভয়ে ভারত-বাসীগণ রাজ-জাতির গৌরব ব্যাখ্যা ছলে আপনারা 'হিন্দু' বা 'কাফের' এই ঘৃণাকর পরিচয় দানে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে হিন্দু' শব্দটির অর্থবোধ-হীনতা প্রযুক্ত উহা আমাদিগের গৌরব বাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এখনও হিন্দু বলিতে আহ্লাদ প্রকাশ করি। এখন কথাটি আহ্লাদের সহিত পরিচয় দিবার সময় যদি একজন পারস্য ভাষাবিদ্ (মৌলবী) শুনিতে পান, তবে তিনি মনে মনে কতই হাস্য করিয়া থাকেন। অতএব 'হিন্দু' নাম ধারণ করিয়া আমাদের গৌরবের পরিচয় দেওয়া হয় না। এজন্য আজকাল পণ্ডিত

ও শিক্ষিত সম্প্রদায় 'হিন্দু ধর্ম' এই শব্দের পরিবর্তে 'আর্য ধর্ম' বা 'সনাতন ধর্ম' ব্যবহার করিয়া থাকেন। এটি বরং কিয়ৎ পরিমাণে প্রশস্ত। কেন না বর্তমান কালে প্রচলিত বহু ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে 'আর্য ধর্ম' অর্থাৎ আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ আর্যগণের চিরাচরিত 'সনাতন ধর্ম' এইরূপ ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।'[৪] সে যাই হোক, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনই খুব সম্ভবত সনাতন আর্যধর্ম পুনঃপ্রচারের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। 'উনবিংশ শতাব্দীতে সনাতন আর্যধর্ম পুনঃ প্রচারের প্রথম ও প্রধান প্রবর্তক ভারতের অদ্বিতীয় ধর্মবক্তা এবং বহুশত সনাতন ধর্মসভা, সুনীতি-সঞ্চারিণী সভাদির প্রতিষ্ঠাতা' কৃষ্ণপ্রসন্নের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে 'বলিদানের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত' নামক পুস্তিকার উপসর্গ লেখা হয়েছিল। অবশ্য এ গ্রন্থের সম্পাদনা করে- ছিলেন কৃষ্ণপ্রসন্নেরই একজন ভক্ত শিষ্য। 'আর্য' বা 'আর্যামি' ভাবের প্রথম প্রবর্তক কৃষ্ণপ্রসন্ন যদি নাও হন, তবু তিনি যে এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কৃষ্ণপ্রসন্নের 'আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা', 'ভারতবর্ষীয় আর্য ধর্ম প্রচারিণী সভা'র অনুকরণে 'আর্য সমাজ', 'আর্য দর্শন', 'আর্য মিশন' প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল। শুধু তা নয়, পরবর্তীকালের অনেকগুলি পত্র-পত্রিকার নামও এর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয়। 'আর্য দর্শন' (১২৮১), আর্যধর্ম-প্রচারক' বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত (১৮১১ শক), 'আর্যভূমি' (১৩১৪), 'আর্য কায়স্থ পত্রিকা' (১৩১৫), 'আর্যাবর্ত' (১৩১৭) 'আর্যদর্পণ', (১৩১৭-১৮), 'আর্য গৌরব' (১৩১৯-২০), 'আর্য- প্রবর' (১৯১৯ সম্বৎ), 'আর্য-বিভূতি' (১৩২৫), 'আর্য জ্যোতিষ', 'আর্য- গৌরব' (১৩৩৮) প্রভৃতি এর প্রধান সাক্ষ্য।

শশধর তর্কচূড়ামণির মত তিনিও ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ও আর্য গৌরব প্রচার করেছিলেন। ১৭৯৭ শকাব্দে কলকাতায় 'এলবার্ট' হলে তিনি 'ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ' নামক একটি স্মরণীয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এ সময়ে বক্তা হিসাবে তাঁর খুব সুনাম হয়েছিল। তাই এই সভায় যথেষ্ট জনসমাগম হয়েছিল। ধর্ম ব্যাখ্যায় শশধর তর্কচূড়ামণি ভারতের জলবায়ু ও ভৌগোলিক বৈচিত্রের কথা বলে এ দেশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তারও আগে 'ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ' শীর্ষক বক্তৃতায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে- ছিলেন। 'এ দেশ সকল দেশের আদর্শ ভূমি, অথবা ভারতক্ষেত্রকে লোক নিবাসের পূর্ণ আদর্শ স্থল বলিলেও হয়। যদি মরুভূমির বিকট লীলা দেখিতে

হয়, তবে বিকানীর দেশে হিঙ্গলাজের পথে গমন কর, যদি ইউরোপীয় সদা জলকণাসিক্ত শীত বাত-প্রবাহে বিহার করিতে সাধ হয় তবে আসাম, চিরাপুঞ্জী প্রভৃতিতে চলিয়া যাও, যদি শিশির উপভোগে বিলাত বাসের বাসনা মিটাইতে চাও, তবে দার্জ্জিলিং, শিমলা, নৈনিতাল প্রভৃতি শৈলশিখরে আরোহণ কর, যদি স্বভাবের আমোদকারী শোভা দেখিতে সাধ হয়, তবে কাংড়া উপত্যকা, কাশ্মীর উপত্যকা প্রভৃতিতে বিচরণ কর, যদি জলে জলে সর্বদা নৌকা পথে বেড়াইতে হয়, তবে পূর্ব্ববঙ্গে গমন কর, যদি স্থলে ও শৈলে বেড়াইতে আকাঙ্ক্ষা হয়, তবে পাঞ্জাব সীমায় অগ্রসর হও; যদি শীত বস্ত্র আদৌ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না হয়, তবে মান্দ্রাজ বিভাগে বাস কর। ভারত-প্রকৃতির শিল্পশালায় তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে।'*

'সামরিক বিদ্যাতেও প্রাচীন ভারতবর্ষ বর্তমান সভ্যতাভিমানী সকল জাতির অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছিল।' তখনকার ব্যূহ রচনার সঙ্কেত বর্তমান ব্যূহ নির্মাণ-কৌশল অপেক্ষাও নাকি উন্নত ছিল। এরপর কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন একটি আশ্চর্য কথা বলেছেন—রাম-রাবণের যুদ্ধে রামচন্দ্রের পক্ষ থেকে যে-সব অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তার মধ্যে নাকি তোপও ছিল। 'তখন তোপের নাম ছিল শতঘ্নী, অর্থাৎ যাহা দ্বারা বহুলোক একেবারে নিহত হয়, এবং গোলার নাম ছিল গুডক, যথাঃ—

'পরিগৃহ্য শতঘ্নীশ্চ সচক্রাঃ সগুডোপলাঃ।
চিক্ষিপুর্ভুজবেগেন লঙ্কামধ্যে মহাস্বনাঃ॥'

'চক্রযুক্ত গোলাপূরিত শতঘ্নী গ্রহণ করিয়া ভুজ বেগে নিক্ষেপ করিলেন, উহা বিষম নিনাদে লঙ্কামধ্যে চলিয়া গেল।' তিনি এর প্রমাণের কথাও উল্লেখ করেছেন। 'যখন ইঞ্জিনিয়ার সার্ আর্থার কট্‌লি সাহেবের তত্ত্বাবধানে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গঙ্গাখাত (Ganges-Canal) খনন করা হইতেছিল, তখন একটি প্রাচীন ভগ্নাবশেষ নগরের (কট্‌লি সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন প্রাচীন হস্তিনাপুর) ১৭ ফিট ভূমির নিম্নে অনেকগুলি ধাতু-নির্মিত ও প্রস্তর-নির্মিত সামগ্রী পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে একটি সামগ্রী ঠিক একটি কামানের ন্যায় ছিল। বারুদের নাম ছিল উর্বাগ্নি, ইহা উর্বনামা ঋষি কর্তৃক আবিষ্কৃত। কৃষ্ণ ও শল্যের যুদ্ধ বর্ণনকালে নীতিচিন্তামণিতে লিখিত আছে :—

'উর্বাগ্নিং প্রোথিতং কৃত্বা শতঘ্নী গুড়কৈর্যুতং।'

অর্থাৎ 'এই যুদ্ধে উর্বাগ্নি (বারুদ), গুড়ক (গোলা) গ্রথিত ও পূর্ণ

করিয়া শতঘ্নী ব্যবহার করা হইয়াছিল।' পুরাণ ও শাস্ত্রর উদ্ধৃতির সাহায্যে এ-ধবনেব আশ্চর্য সংবাদগুলি পরিবেশিত হলে সে যুগের অনেক মানুষ বিশেষতঃ হিন্দু সমাজ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। আবার এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও কম দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের—

"কে বলিতে চাহে মোরা নহি বীর,
প্রমাণ যে তাহাব রয়েছে গভীর
পূর্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর—
সাক্ষী বেদব্যাস।"

কথাগুলি বোধ হয় একে লক্ষ কবেই লিখেছিলেন। এখানেই শেষ নয়, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন আবো অনেক বিষয়ে ভারতেব শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার চেষ্টা কবেছেন। জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁব বক্তব্য, 'জ্যোতির্বিদ্যায় ভারতবাসীবর্গ যেরূপ উন্নতিলাভ কবিয়াছিলেন, ততদূব অগ্রসব হইতে বর্তমান সভ্য জগতের এখনও অনেক বিলম্ব আছে।' বাব-তিথিব ব্যবস্থাচক্র ভারতবাসাই প্রথম আবিষ্কাব কবে বলে তিনি দাবী কবেন। 'রবি (Sun), সোম (Moon), মঙ্গল (Mars), বুধ (Mercury), বৃহস্পতি (Jupiter), শুক্র (Venus), শনি (Saturn) আদিব বিষয় শৃংখলাবদ্ধ করিয়া আর্যজাতিই প্রথম লিপিবদ্ধ কবিয়াছিলেন। যেদিন দিন রাত্রি সমান হয়, তাহা টলেমি (Ptolemy) জন্মিবাব বহুদিন পূর্বে আর্যজ্যোতির্বিদ্ মহাত্মাগণ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। কোপার্নিকাস (Copernicus) আসিয়া পৃথিবীর দৈনিক গতি আবিষ্কার পূর্বক যখন জ্যোতির্বিদ্‌মণ্ডলীর মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, তাহার বহুদিন পূর্বে আর্য জাতি এ কথাব নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।' কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের মতে 'প্রাচীন আর্যজাতি পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলিয়া জানিতেন। ভাবতে বিলাতী আলো আসার অনেক আগেই নাকি সূর্য-সিদ্ধান্তে এ বিষয়ে বলা হয়েছিল—

'সর্বতঃ পর্বতারামগ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্বকেশবগ্রন্থিকেশরঃ প্রসবৈরিব॥

কদম্ব যেমন কেশর সমুহে পরিবেষ্টিত, সেইরূপ পৃথিবীপিণ্ড সর্বদিকেই গ্রাম, বৃক্ষ, পর্বত নদনদী, সমুদ্র আদির দ্বাবা বেষ্টিত।' কৃষ্ণপ্রসন্নেব জিজ্ঞাস্য: কমলালেবুব দৃষ্টান্তের চেয়ে, কেশরবেষ্টিত কদম্বেব দৃষ্টান্তটি কি উৎকৃষ্ট নয়? তারপর তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'পৃথিবী কপিত্থফলের ন্যায় গোলাকার এবং উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। এই ভূগোলতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য আজকাল

যে গোলক (Globe) নিদর্শন দ্বারা বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাও প্রাচীন আর্য পদ্ধতির অনুকরণ মাত্র।' তিনি আরও বলেছেন, পৃথিবীর যে গতি আছে, সে কথা বিক্রমাদিত্য, পিথাগোরাস ও কোপার্নিকাসের অনেক অনেক আগেই নাকি আর্যভট্ট "চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি" কথাটির মধ্যে ব্যক্ত করে গেছেন।

পৃথিবী সাপের মাথার উপর অবস্থান করছে—সে ধারণাকে কৃষ্ণপ্রসন্ন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কল্পনা বলে আখ্যা দিয়েছেন। পৃথিবী যে শূন্য মণ্ডলে আছে, সে কথাও আর্যশাস্ত্রে আছে বলে তিনি দাবি করেছেন। মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটি খুব কৌতূহলোদ্দীপক। 'আজ-কালের শিক্ষিত জগৎ বক্ষ বিস্ফারণ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, সার্ আইজাক নিউটন জন্মগ্রহণ করিয়াই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গূঢ় প্রহেলিকা উদ্ভেদনপূর্বক জগৎকে প্রথম জাগ্রত করিয়াছেন। বলিতে হাসি পায় যে, আর্যজাতি এ তত্ত্ব নিউটনের বিনা শিক্ষায় স্বয়মেব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্যকৃত গোলাধ্যায়ে লিখিত আছে:

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ
বস্থং গুরুঃ স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীতি ভাতি
সমে সমন্তাৎ কুপতত্বিয়ং খে॥"

'পৃথ্বি আকর্ষণ-শক্তি-বিশিষ্টা, কারণ কোন গুরুতর বস্তু আকাশে নিক্ষেপ করিলে পৃথিবী স্বীয় শক্তির দ্বারা তাহাকে নিজাভিমুখে আকর্ষণ করে; কিন্তু পতন হয় এরূপ অনুমান হয়, চারিদিকেই সমান আকাশ, অতএব পৃথিবী ভিন্ন কোথায় পড়িবে?'

রাহুকে দৈত্য ভেবে চন্দ্র ও সূর্যের গ্রাসকারী কল্পনা করার মনোভাবকে তিনি নিন্দা করেছেন। পৃথিবীর ছায়ায় যে গ্রহণ হয়—সে কথা আর্যজাতি অনেক আগেই জানতো বলে তিনি দাবি করেছেন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটিও চাঞ্চল্যকর। 'চিকিৎসা-বিদ্যাতেও ভারতবর্ষ আদি গুরু। অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি, সুশ্রুত প্রভৃতি অদ্বিতীয় পুরুষগণ আয়ুর্বেদ বিদ্যাবিশারদ ছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁহারা বিপুল উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। অস্ত্র চিকিৎসা সম্ভবতঃ এখনও ততদূর যাইতে পারে নাই। ডাক্তার রয়েলি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে, ভারতীয় শারীর-বিদ্যা-বিশারদ অস্ত্র চিকিৎসকগণ ১২৭খানি অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। 'সঙ্গীত-বিজ্ঞানেও

ভারতের অসাধারণ উন্নতির কথা তিনি বলেছেন। বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা শশধর তর্কচূড়ামণির চেয়েও অনেক বেশী কৌতূহলোদ্দীপক। এ-বিষয়ে কৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তব্য : 'আজকাল বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের বিপুল চর্চা দেখিয়া মনে করিয়া থাকি, আর্য্যজাতি এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধিমানগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষে, প্রত্যক্ষে ও অপ্রত্যক্ষে আর্যবিদ্বদ্বর্গ সৌদামিনীর সহিত যত মাখামাখি করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বিদ্যুতের সহিত এখনও তত ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। দশানন যে দুর্জয় শক্তিশেলে সুমিত্রানন্দনকে জড়ীভূত ও স্পন্দন-বর্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা ঐ বৈদ্যুতিকী শক্তির প্রসাদে। এখন যে সামান্য "ইলেকট্রিক ব্যাটারীর" স্পর্শে হস্ত-পদাদি অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া যায়, সেই জাতীয় শক্তিজাল-সমবায়ে ঐ শক্তিশেল বিনির্মিত হইত। "শক্তিশেল" এই শব্দটির দ্বারাই ইহার প্রকৃতিগত পবিচয় পাওয়া যায়। বাণেব মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার করিতে এখনও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সামর্থ্য লাভ কবে নাই। মন্দিরের উপর ত্রিশূল চক্রাদি ব্যবহাব করিয়া থাকে, তাহাও বিদ্যুৎবিজ্ঞানের বিপুল পর্যালোচনার ফল। উত্তবশিয়বে শযন কবিতে নাই, এ রীতিও বিদ্যুৎবিজ্ঞানতত্ত্ব পরিপাক কবাব পব প্রচাবিত হইয়াছে। একটা অণ্ড বা একটি কচি ফলেব দিকে কেহ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলে ভারতের গ্রাম্যনাবী পর্যন্ত তাহাকে নিষেধ করিয়া থাকে। অঙ্গুলিব দ্বারা নিষ্ক্রান্ত জীবন্ত সতেজ তড়িৎ শক্তিপ্রবাহে অণ্ড বা কচি ফলটি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে ইহা যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা অবগত আছে, সেখানে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতি হয় নাই কেমন করিয়া বলিব?' শিলাবৃষ্টি থেকে ফসল রক্ষাব জন্য "শিলারি" ব্যবস্থাকে তিনি বিজ্ঞানসম্মত বলে অভিহিত করে বলেন, 'শিলারীকে নিবামিষভোজী রুক্ষকেশে থাকিতে ও কেশ লোমাদি রক্ষা করিতে হয়, এবং সর্ব্বদা একটা সুদীর্ঘ ত্রিশূল হস্তে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে হয়, এই জন্যই শিলারি নিয়োগ। শিলা+অবি অর্থাৎ শিলাবৃষ্টিব নিবারণকারী। শিলারী যেখানেই দেখিবে মেঘ নিকট দিয়া যাইতেছে, অমনি সেইখানে মেঘ কাটিরা যাউক, এই সংকল্প শক্তির পরিচালনাপূর্বক সেইখানে ত্রিশূল পুতিয়া দাঁড়াইবে, অথবা সেই স্থানে ত্রিশূল স্কন্ধে ধীরে ধীরে বিচরণ করিবে। অট্টালিকার শীর্ষভাগে লৌহ শলাকা আকাশমার্গের ও মেঘমালার যে বিকার বিনাশ করিয়া থাকে, ব্রহ্মচর্যশীল শিলারী ত্রিশূলধারী হইয়া সেই কার্য সম্পাদন করে।' তিনি

আরো দাবি করেন, সধবাদের মণিমুক্তা অলংকারাদির ব্যবস্থা এবং বিধবাদের ব্রহ্মচারিণী বেশ সবই নাকি 'বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিরূপিত' হয়েছে।

ভারতের সমাজ গঠনের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বর্ণাশ্রমের কথা উল্লেখ করেন। জাতিভেদের কুফল দেখে যে-সব সংস্কারক সমাজকে সংস্কৃত করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের বিরোধিতা করে তিনি বলেন, 'ভারতীয় আর্যঋষিরা দয়া করিয়া সমাজের যে বন্ধন-ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন অবোধ কুকুরের ন্যায় আমরা ছিঁড়িয়া না ফেলি। এই অধঃপতনের দিনে স্রোতের মুখে নাবিকবিহীন নৌকার ন্যায়, নায়কশূন্য নাট্যশালার ন্যায়, ভারতের শোচনীয় দুর্দশায় দিনে—আমাদের এই বর্তমান দুঃখ-দুর্বলাধিকারের অশুভ দিনে এই সমাজ-বন্ধন কাটিয়া গেলে ক্লেশের পরিসীমা থাকিবে না। জাতীয় গৌরবের উজ্জ্বল চিহ্ন অপগত হইবে, সামাজিক ও পারিবারিক উচ্ছৃঙ্খলা আসিয়া আমাদের সমাজকে পর্যুদস্ত করিবে, সামাজিক বল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে।' তারপর সমগ্র ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ভারত এখনও মরেনি— ঘুমিয়ে আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সেই মূর্চ্ছা যেদিন ভাঙবে সেদিন 'সৌভাগ্য ভারত-গগনে তারকান্তবকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিবে। আর্যজাতির আর্য প্রকৃতির বিজয়ভেরী নিনাদে প্রসুপ্ত জগৎ পুনর্জাগ্রত হইবে।'

উপরিউক্ত আলোচনায় পুনরভ্যুত্থানবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। পুনরভ্যুত্থানবাদীরা অনেক সময় লিখিত ইতিহাসের পথ বর্জন করে পুরাণের গল্প এবং প্রাচীন বিশ্বাসকে গৌরবান্বিত করার চেষ্টা করেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন পুরাণ ও শাস্ত্রের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের বীজ যেভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এবং আধুনিক বিজ্ঞানীদের তুলনায় প্রাচীন ভারতের ঋষিদের যেভাবে প্রশংসা করেছেন, তাতে পুনরভ্যুত্থানবাদী মনোভাবের পরিচয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অবশ্য তাঁর উক্তিগুলি কতদূর সত্য তা প্রমাণসাপেক্ষ। শশধর তর্কচূড়ামণির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিনি আধুনিক শিক্ষিত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত ব্যবস্থা ও প্রথা—এমন কি কুপ্রথাগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। সেজন্য প্রয়োজনবোধে তিনি শাস্ত্রের কথাগুলি নিজের ইচ্ছামত আংশিক পরিবর্তিত করতেন। কৃষ্ণপ্রসন্নও আর্য-সভ্যতার গৌরব প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রদর্শিত যুক্তিগুলি যে অনেক সময় গ্রহণযোগ্য নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। জলবায়ুর বৈচিত্র্য এদেশের মানুষকে উন্নত করেছে,

সেকথা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণ অনেক কম পরিশ্রমী, কম উদ্যোগী। ভারতের বিত্ত ও ঐশ্বর্যের জন্য দেশ দেশান্তর থেকে দিগ্বিজয়ী বীরেরা এখানে এসেছিলেন বলে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন যেন একটু গৌরববোধ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ, রাজ্য জয়, হত্যা ও লুণ্ঠনের ফলে এদেশে কত রক্তস্রোত বয়েছিল, সেকথা স্মরণ করলে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন না। গোলাবারুদ ও কামান সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তা চিত্তচমৎকারী হলেও বাস্তব সত্য কিনা, সে বিষয়ে সংশয় জাগে। একটা জাতি রাতারাতি সব জ্ঞান-বিজ্ঞান ভুলে একেবারে নগণ্য—সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ল—সেকথা বিশ্বাস করা যায় না। প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়তো ছিল, সেই চর্চা বন্ধ হওয়ার জন্য আমাদের অধঃপতন হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু সেজন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কৃতিত্বকে অস্বীকার করা কি উচিত?

সে যাই হোক, সেযুগের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও এসব কথা শুনে বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজ ও খৃষ্ট সমাজের উপর তাদের আস্থার ভাব কমে গিয়েছিল। আযজাতির গৌরব ও কৃতিত্বের কথা শুনে তারা হৃতশক্তি আবার খুঁজে পেয়েছিল। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সেই অভাব পূরণ করেছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজকে আবার আত্মশক্তিতে ভরিয়ে তুলেছিলেন।

তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা এ-বিষয়ে যথেষ্ট সহায়ক হয়ে উঠেছিল। তাঁর সুন্দর বক্তৃতাগুলি শুনে 'অনেক উন্মার্গগামী ব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বিরত এবং দেশীয় আচার-ব্যবহার ও পূজাদির অনুষ্ঠানে অনুরক্ত' হয়েছিল। মুঙ্গেরের পাদ্‌রী ইভানস্ সাহেব তাঁকে নাকি বলেছিলেন, 'আপনার বক্তৃতাশক্তি পাইলে আমি একদিনেই সমগ্র জগৎ খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারি।' আদি ব্রাহ্মসমাজের রাজনারায়ণ বসুও তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তির জন্য শংকিত হয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিকে লিখেছিলেন, 'আপনারা শীঘ্রই হিন্দুর আদর্শে ধর্ম্ম প্রচার না করিলে মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছে, সেইরূপ সর্বত্রই আর্য সভাসমূহ ব্রাহ্ম সমাজকে অতিক্রম করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিবে।' ঢাকায় তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে ১৩১০ সনের ৫ই আষাঢ়ের 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'কিছুদিন পূর্বে টর্ণেডো বা প্রবল ঝড়ে ঢাকায় একটা যুগ-প্রলয় হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শুভ আগমনে আঁর একবার আর একরূপ ঝড়

বহিয়া গেল। পূর্বের ঝড়ে অগ্নিবৃষ্টি হইয়াছিল। এ ঝড়ে অমৃত বৃষ্টি হইয়া গেল।' সহবাস আইন বিধিবদ্ধ হবার পর কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। কলকাতা টাউন হলে এক বৃহৎ জনসভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, শশধর তর্কচূড়ামণির থেকেও কৃষ্ণপ্রসন্নের ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল। 'This new revival movement had another powerful protagonist in Shree Krishna Prasanna Sen. He had the gift of oratory in a much larger measure than Sashadhar Tarka-Chudamani'.

এই জনপ্রিয়তার মূল কারণ, কৃষ্ণপ্রসন্ন সাধারণের কাছে সকলের বোধগম্য ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। এদিক থেকে তিনি ছিলেন 'Mass-Speaker'। আবেগ, শ্লেষের সাহায্যে তিনি বক্তব্যকে রসাল করে তুলতেন। বিপিনচন্দ্র পাল এ-বিষয়ে লিখেছেন, 'He had the power to rouse popular sentiments by Vulgar witticism and through playing upon words. One of his most popular presentations of the superiority of Hinduism was a pun on the words God in English representing the supreme Being and Nanda-Nandana in Sanskrit and Bengali, representing the Vaishnavic Deity shree krishna. If you reversed the alphabets composing the word God you find it converted into dog ; if you reversed the letters Nanda-Nandana in this way you would find no change in it. This was a typical presentation of shree krishna prasanna sen. He was sentimental, vulgar and abusive, but this very sentimentality, vulgarity and abuse went down with a generation of half-educated Bengalees who had been wounded in their tenderest spots by the vulgarities of the Anglo-Indian politicals of the type of Branson and ignorant and unimaginative christian Propagandist'[৪]

বিপিনচন্দ্রের এই মন্তব্য খুব যথার্থ। 'God' কে বিপরীত দিক থেকে উচ্চারণ করলে 'Dog' হয়, অথচ 'নন্দ-নন্দন' একই থেকে যায়। এগুলি অতি হীন যুক্তি হলেও, খৃষ্টানদের হাতে লাঞ্ছিত সেযুগের শ্রোতৃ সাধারণের

কাছে এ ধরনের উক্তি খুব মুখরোচক হয়ে উঠেছিল। আর একটি কথা, প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুরাণ ও শাস্ত্র থেকে গল্প বা গল্পাংশ এনে উপদেশ ও নীতি হিসেবে প্রয়োগ করতেন। কোন কোন সময় নিজের অভিজ্ঞতা বা কোনো লোক-কথাও এভাবে ব্যবহার করতেন। এর ফলে তাঁর বক্তব্য অনেক পরিষ্কার ও জোরালো হয়ে উঠতো।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনও শশধর তর্কচূড়ামণির মতো অনেক প্রগতিশীল ভাবধারার বিরোধিতা করেছিলেন। 'সহবাস-সম্মতি' আইনের তিনি যে অন্যতম বিরোধী ছিলেন, সেকথা উল্লেখ করেছি। পুরুষের ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করাকে তিনি অসমর্থন করলেও, মেয়েদের অল্পবয়সে বিয়ে দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। অধিক বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে কম বয়সী মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা এ-সময়ের হিন্দুধর্মপ্রবক্তাদের একটি আদর্শে পরিণত হয়েছিল।

ধর্মের দিক থেকে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাটে দয়ালদাস স্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তাঁর কাছ থেকে তিনি দীক্ষা নেন। সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে তিনি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়ান। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সন্ন্যাসী এবং বৈষ্ণব ছিলেন। অবশ্য এ-যুগে বৈষ্ণবধর্মের খুব প্রসার দেখা দিয়েছিল। কেশবচন্দ্র, শিশিরকুমার ঘোষের মতো উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেক বৈষ্ণবধর্মে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিপিনচন্দ্র পালের মধ্যেও এই বৈষ্ণবভাব কোন-না-কোন প্রকারে ছিল। বৈষ্ণবধর্মের মূলকথা যুক্তি নয়, ভক্তি। উনিশ শতকের ইংরাজী শিক্ষিত, কিছুসংখ্যক যুক্তিবাদী লোক তাই যুক্তির উপর আস্থা হারিয়ে ভক্তির দিকে ঝুঁকেছিলেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এই যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভারতের পুনরুজ্জীবনের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এবিষয়ে তাঁর উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—'তর্ক বিতর্কের নিদারুণ উষ্ণরশ্মিতে ও ইউরোপীয় নব্যদর্শনের সমুষ্ণবায়ুপ্রবাহে বঙ্গভূমির কোমল হৃদয় আবার বিশুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া বহুদিন হইতে মনে হইতেছিল যে বঙ্গে এখন একটু ভক্তির শীতল বাতাস বহিলে ভাল হয়।'[৫] তাঁর বিশ্বাস ছিল, কলিযুগে নামধর্ম প্রচারের ফলেই মুক্তি আসবে।

'ভক্তি ও ভক্ত' গ্রন্থে তিনি এই ভক্তিতত্ত্বের সম্যক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'নারদ কর্তৃক ভক্তি-সূত্র' 'শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তি-সূত্র'-এর টীকা ও ভাষ্য ছাড়াও

তিনি এই গ্রন্থে গুরুভক্ত ঘাটম্, স্বামী হরিদাস, রাঙ্কা ও বাঙ্কা, ভক্ত সজন, ভক্ত ত্রিলোকনাথ, ভক্ত হরিদাস, রাজা জয়মল্ল, ভক্ত কেবলকুবা, সাধু রাইদাস, পরমভক্ত ধনা, ভক্ত দেবা, করমেতি বাই, ইন্দুরেখা, ভক্ত গোবিন্দদাস প্রভৃতির জীবনী আলোচনা করেছেন। এই বৈষ্ণব-প্রীতির জন্য তিনি হয়তো পূজার্চনায় বলিদানের বিরোধী ছিলেন।] এ সম্বন্ধে তাঁর একজন ভক্ত লিখেছেন, 'পরম পূজ্যপাদ পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় স্বীয় জীবনব্যাপী ধর্ম প্রচার কালে মুমুক্ষু ও আত্মকল্যাণার্থীয় যে শক্তি-পূজায় পশু বলিদানের বিধান নাই, তাহা বহুবার মর্মস্পর্শী ভাষায় সর্বসমক্ষে প্রমাণ পূর্বক অনেক ধর্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ভবনে দেবীর পূজায় পশু বলিদান রহিত করিয়া গিয়াছেন 'এবং তাঁহার স্বপ্রণীত "পঞ্চামৃত" নামক পুস্তকেও পূজায় পশু বলিদানের অবৈধতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।'[৬]

[কৃষ্ণপ্রসন্নের বৈষ্ণবীয় ভাবের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি বৈষ্ণবদের বর্ণ ও জাতিভেদমুক্ত সমাজব্যবস্থাকে সমর্থন করেননি। নাম সাধনার প্রয়োজনীয়তা মনে প্রাণে অনুভব করলেও, বৈদিক বর্ণাশ্রম যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের বেদ শিক্ষার জন্য তিনি কাশীতে একটি বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনধিকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগ করলে পাপগ্রস্ত হতে হয় বলে তাঁর ধারণা ছিল। অসংখ্য "হরিসভা" প্রতিষ্ঠা করে তিনি এই ভাবটিকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন।]

শশধর তর্কচূড়ামণি রামকৃষ্ণকে 'পরমহংস' বলে স্বীকার করতেন না। রামকৃষ্ণের শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কিন্তু রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়েছিল। এ সম্বন্ধে 'সাহিত্য' পত্রিকার 'বৈঠকী' শীর্ষক আলোচনায় (সম্ভবতঃ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা) লেখা হয়েছে—'শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়কে আমরা আমাদের শৈশব অবস্থা হইতে চিনিতাম এবং জানিতাম। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, আমরা তাঁহার নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম, এমন কি আমাদের হস্তাক্ষর এবং বাচনভঙ্গী অনেকটা তাঁহারই অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্নের সঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম পরমহংস রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সে বোধহয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। সাধু সন্ন্যাসী ফকির প্রভৃতির দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তিনিই আমাদের হৃদয়ে জাগাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যাইয়া আমরা বহু বড় বড় সন্ন্যাসী ও সাধুর দর্শন লাভ করি। তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রতি

অতিমাত্রায় শ্রদ্ধালু ছিলেন।'[৭] রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। কৃষ্ণপ্রসন্ন দয়ালদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণের গুরু ছিলেন তোতাপুরী। তোতাপুরীকে দয়ালদাস স্বামী বেশ ভাল রকমেই চিনতেন। তাছাড়া, রামকৃষ্ণ ছিলেন ভক্তিবাদী, কৃষ্ণপ্রসন্নও ছিলেন তাই। সেজন্য উভয়ের মধ্যে এ-বিষয়ে সাধর্ম্য ছিল। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন রামকৃষ্ণের জীবনী লেখার জন্যও উৎসুক হয়েছিলেন। এ কারণেই হয়তো কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের উপর স্বামী বিবেকানন্দের আস্থা ছিল। ১৮৯৫ খৃঃ নিউইয়র্ক থেকে মিঃ ষ্টার্ডিকে তিনি লিখেছিলেন—'স্বামী কৃষ্ণানন্দ ইংলণ্ড আসছেন, তাই যদি হয়, তবে আমি যাঁদের পেতে পারি তাঁদের মধ্যে ইনিই হবেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী'। (পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১)।

বৈষ্ণব ভাবের সঙ্গে নীতির উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীতগুলিতে একদিকে যেমন :—

"বাজলো হরিনামের ভেরী গগণভেদী স্বরে।
আর্যধর্মের জয় পতাকা উড়িল অম্বরে॥
মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি ভবের গণ্ডগোল।
সবে ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি বোল॥"—

প্রভৃতি কথা ছিল ; অন্যদিকে তেমনি শিক্ষাকে তিনি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য নীতির সঙ্গে বর্ণাশ্রম শিক্ষার আদর্শটিও বাদ যায় নি। 'আর্য শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, স্বকীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যের অগ্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করা উচিত, পরে গুরু ও বেদান্ত বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করিয়া ক্রমশঃ অধ্যাত্ম-রাজ্যে—অনুভবের রাজ্যে প্রবেশ করা উচিত।' রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি যখন ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেখানে বিজ্ঞান ও বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে অস্বীকার করে আমাদের দৃষ্টিকে প্রাচীন ভাবের স্বপ্নলোকের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। '…………মিথ্যাত্মক জড়বিজ্ঞান প্রণোদিত বর্তমান শিক্ষা প্রণালী বর্তমান সমাজকে কি ভয়ানক অযথা পরিমাণে কলুষিত করিয়া দিতেছে। শীঘ্রই এই শিক্ষা প্রণালীর গতি পরিবর্তিত করা নিতান্ত আবশ্যক। সুনীতি ও ধর্মজ্ঞান মিশ্রিত শিক্ষা প্রচলিত হইলেই, ভারতের মলিন মুখ পুনরুজ্জ্বল হইয়া হাস্য-বিকাশে মনোহর রূপ ধারণ করিবে। সুখ ও পুণ্য-পবিত্রতা ভারতের প্রতি গৃহেই নৃত্য করিয়া

বেড়াইতে থাকিবে। তখন দেখিতে পাইবেন, বিজ্ঞানশাস্ত্র আবার অপূর্ব অভিনব মূর্তি ধারণ করিয়া পুষ্ট কলেবর হইবে এবং আজকালের বিজ্ঞানের ন্যায় কেবল ইহলোকেই বিচবণ করিয়া তাহার সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিবে না। তখন এই বিজ্ঞান জড়জগত অতিক্রম করিয়া বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের অলঙ্ঘ্য পথে দেবদুর্লভ পবিত্র রাজ্যে প্রবেশেব অধিকার পাইবে।'[৮] [শুধু বিজ্ঞানের অস্বীকৃতি নয়, ভগবানেব কৃপালাভকেই তিনি মনুষ্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করতেন। সুনীতিব পথে, ধর্মানুষ্ঠানের সাহায্যে ভগবানেব কৃপালাভ করা যায় বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সেজন্য ছাত্রদেব নীতিশিক্ষার জন্য তিনি 'সুনীতি সঞ্চারিণী সভা' স্থাপিত করেছিলেন।] এব উদ্দেশ্য ছিল: 'প্রাতঃস্মরণীয় আর্যগণেব প্রভুত্বকালে বর্ণানুসারে ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও বিবিধ সাধাবণ নীতি শিক্ষা পাইয়া ভাবতবাসীগণ তপোবল, ধর্মবল, বিদ্যাবল, বাহুবল, ধনবল আদিব গুণে জাতীয় প্রকৃতি উপার্জন পূর্বক এই পবিত্র ভূমিকে সভ্য সমাজচূড়ামণি করিয়া তুলিয়াছিল। এক্ষণে শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের অভাবে সুকুমারমতি বালকগণ স্বেচ্ছা ও যথেচ্ছাচাবেব বশবর্তী হইয়া বহুল দুঃখ দুষ্কর্মময় জীবন লাভ কবতঃ পুণ্যশীল ভাবতীয় সমাজকে কলঙ্কিত ও উপদ্রবগ্রস্ত করিতে প্রবৃত্ত এবং স্বয়ং পবিণাম দুঃখাবহ দুর্বহ দুর্দশাব ভাব গ্রহণে অন্ধেব ন্যায় ধাববান হইতেছে দেখিয়া "ভাবতবর্ষীয় আযধর্ম প্রচারিণী সভা" ভবিষ্যৎ ভাবতেব পরম হিতসাধনার্থ স্নেহভাজন কোমল হৃদয় তবলমতি বালকবর্গকে কল্যাণ-কল্পতরুর শীতল ছায়ায় সুখী কবিবাব নিমিত্ত "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" স্থাপনের প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছেন।'[৯]

জীবনেব শেষদিকে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন নাকি অবতাব হয়ে ওঠেন। ১২৯০ সনে তিনি 'কৃষ্ণানন্দ স্বামী' নাম নিয়ে নতুন তন্ত্রসাধনা শুরু কবেন। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়েব মতে তিনি নিজেকে 'কল্কি অবতার' বলেও ঘোষণা করেন। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, ভক্তি, গুরুবাদ, সন্ন্যাস কোন কোন ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে অবতারবাদেব দিকেই নিয়ে যায়। উনিশ শতকে এ দৃষ্টান্ত একেবারে বিবল নয়। উনিশ শতকে যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রতিস্পর্ধী হিসেবে পুনরভ্যুত্থানবাদী নব-অবতারবাদ বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। অনেকেই এই অবতাববাদেব বিবোধিতা কবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে অগ্রগণ্য। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'অবতার আসিলে চেলার অভাব হয় না, তাহা গত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার সামাজিক

ইতিহাস আলোচনা করিলে খুবই স্পষ্ট হয়। কৃষ্ণানন্দের চেলারা শিক্ষিত (!) বাঙালি। এই কল্কি অবতারকেই বিদ্রূপ করিয়া প্রিয়নাথ সেনকে কবি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

'ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটাব মতো পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন, 'আমি কল্‌কি' গাঁজার কল্‌কি হবেন বুঝি।
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলি ঘুঁজি!'[১০]

'ব্যঙ্গকৌতুক'-এর 'নূতন অবতারে'র মধ্যেও এই ইংগিত আছে। রুদ্রনারায়ণ বক্‌শি নতুন অবতাব হয়ে কি বকম ফ্যাসাদে পডেছিল, তার এক নিপুণ চিত্র এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'আমাব এই পুকুবেব জল যে-বকম হয়ে এসেছে আর দু'দিন বাদে তাঁর মকরটা তাব শুডশুদ্ধ মবে ভেসে উঠবে, আমাব মতো ভগীরথ ঢের মিলবে কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থেব ঘরে ঘবে অমন বাহন আব পাবেন না। এই নতুন গঙ্গাব তাঁব স্নেহেব ভগীবথও যে বেশীদিন টিঁকবে কোনো ডাক্তারেই এমন আশা দেয় না। সত্যযুগেব নামটার জন্যে মায়া হয় বটে, কিন্তু আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি, দাদা, এই কলিযুগের প্রাণটার মায়াও ছাড়তে পারিনে।' কতগুলি সংবাদপত্র এই নব-অবতাববাদ প্রচারে সহায়ক হয়ে উঠেছিল; সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কটাক্ষ কবে লিখেছেন, 'এ দেখোনা "হিন্দু প্রকাশে" কী লিখেছে। ওবে তিনকডে, চট করে সেই কাগজখানা নিয়ে আয় তো। এই দেখো—"কলিযুগের ভগীরথ এবং ফজুগঙ্গের ভাগীরথী"—লোকটাব রচনাশক্তি দিব্য আছে। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন শেষ জীবনে গঙ্গাসাগর মাহাত্ম্য প্রচাব করেছিলেন। এই গঙ্গা ভক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'কলিযুগের ভগীরথ'-এর মিল থাকা আশ্চর্য নয়।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল (১৮৫২-৯৮) তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে এই অবতারবাদকে প্রচণ্ড আক্রমণ কবেছিলেন। 'মানুষেব উপর 'ঈশ্বরত্ব' বা 'অবতাবত্ব' আবোপের তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন।' চৈতন্যের 'অবতারত্ব'-কেও তিনি অস্বীকাব করেছিলেন। 'অবতাবত্ব', কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য :—'অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হওয়া এখনকার কালেও যে একেবারে অসম্ভব তাহা নহে। ····· প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল তমলুক মহকুমায় আমি এক কল্কি অবতার দেখিয়া আসিয়াছি। ······বিশ্বম্ভর মিশ্রের অন্ততঃ গৌরবর্ণ ছিল, জলামুঠার কল্কি

মহাশয়ের তাহাও নাই। আবার সেদিন দেখিতে দেখিতে ঈশ্বর নাকি পরমহংস সাজিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন শুনিতে পাই।'[১১]

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন শেষদিকে একটি কুৎসিত মামলায় জড়িয়ে পড়েন। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনেব প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা, 'ববিশাল হিতৈষী' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক দুর্গামোহন সেন ১৯৬৪ খৃঃ ৩০শে নভেম্বব একখানি পত্রে এই মামলা সম্বন্ধে লিখেছেন, 'যাহা হউক, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তখন স্বামী কৃষ্ণানন্দ আখ্যা নিলেন ও কাশীতে অন্নপূর্ণা আশ্রম করিয়া স্থায়ীভাবে ধর্মপ্রচাব করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে শশধর ও বঙ্গবাণী পত্রিকা ঈর্ষাকাতব হইলেন। ফলে একটি দ্বাদশ বৎসবেব বালিকাকে তাহাবা আশ্রমে পাঠাইয়া নাবীধর্ষণের এক মোকদ্দমা কবিলেন। বঙ্গবাণীতে তখন বিশেষ উল্লাস সহকাবে এই মোকদ্দমার বিবরণ প্রকাশিত হইতে থাকিল। বঙ্গবাণীতে ক্ষান্তমণি নামক ঐ বালিকাব বৃহদাকাবের প্রতিকৃতি বাহিব হইল। মোকদ্দমায় স্বামীজীর ৩ বৎসবেব জেল হইল। পববর্তীকালে মোকদ্দমা বানাট জানিয়া গভর্ণমেণ্ট এক বৎসব পবে তাঁহাকে খালাস দিলেন।'[১২]

এবপরও শিশিরকুমার ঘোষ ও শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবেব মতো ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা[১৩] থেকে বঞ্চিত হতে না হলেও শেষ জীবনে তাঁকে কিছুটা যে অবহেলিত জীবন যাপন করতে হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪—১৯১০)

'পুনরভ্যুত্থানবাদী'দের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসুর স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভূদেব—শিষ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রীতিভাজন চন্দ্রনাথ বসুর জীবনালেখ্য বিভিন্ন দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩) যুগে তাঁর জন্ম, হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদের শেষ দিকে তাঁর মৃত্যু। কাজেই ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গালী সমাজের বিভিন্ন ভাব-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া তাঁর জীবনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ইতিমধ্যেই হয়েছে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা ও ইংরাজি শিক্ষার ক্রমপ্রসার এসময়ের আর দু'টি স্মরণীয় ঘটনা। পাশ্চাত্য দর্শন চর্চার ফলে এই সময়ের ছাত্রদের মনে সংশয়বাদ ও নাস্তিক্যবাদ দেখা দিয়েছিল, বিশেষ করে ডিরোজিও শিষ্যদের কথা এই সূত্রে মনে আসে। চন্দ্রনাথ বসুর জীবনের প্রথম পর্ব এই ভাবের দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

চুচুঁড়ার নৈষ্ঠিক হিন্দু পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতামহ কাশীনাথ বসু ধর্মনিষ্ঠ, ক্রিয়াবান্ হিন্দু হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও পিতা সীতানাথ বসু তাঁকে ইংরাজি স্কুলে পড়াতে কোনো আপত্তি করেন নি। আটবছর বয়সে ('৮৫২) চন্দ্রনাথ বসু ডাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রতিষ্ঠিত হেদুয়ার 'জেনারেল এসেম্ব্রিজ ইনস্টিটিউশনে' (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৩০) ভর্তি হন। মাষ্টার মশাইদের নস্যদানটি দেখে সেখানে গোমাংস আছে বলে বালক চন্দ্রনাথের মনে প্রথম প্রথম ভয় হলেও ক্রমে সেই ভয় তিনি কাটিয়ে ওঠেন। গৌরমোহন আঢ্য প্রতিষ্ঠিত 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী'র মূল স্কুলে ক্যাপ্টেন, ডি, এল, রিচার্ডসন, হার্মান জেফরয়, ক্যাপ্টেন পামার, উইলিয়ম কার প্যাট্রিক, রবার্ট ম্যাকেঞ্জি প্রভৃতি দিক্‌পাল শিক্ষকদের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেন। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিলেন। 'যখন জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ Preparatory ক্লাসে পড়ি তখন রিচার্ডসন সাহেব আমাদিগকে দুই একদিন পড়াইয়াছিলেন। এনট্রান্সের

পাঠ্যের মধ্যে **Roger's pleasures of Memory** নামক কাব্য ছিল। প্রথম দিন সাহেব **Rogers, Goldsmith, Campbell, Akenside, Thompson** প্রভৃতি **descriptive** কাব্য-প্রণেতাদিগের দোষগুণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে কথাগুলি বলিয়াছেলেন তেমন কথা আর কখন শুনি নাই।'[১] রিচার্ডসনের কাছে কাব্যপাঠ করার সময় তিনি বিশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণেব জন্যও সচেষ্ট হন। ১৮৬১ খৃঃ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হবাব পব সেকালের অনেকের মতো ক্রমে হিন্দু পৌরাণিক দেব-দেবীতেও বিশ্বাস হারাতে লাগলেন তিনি। এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেনেব ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যা নব্য শিক্ষিতদের কাছে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৮৫৯ খৃঃ সিন্দুরিয়াপটীতে ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপিত করে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে 'সহজ জ্ঞানে'র উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এ-বিষয়ে বিদ্যালয়ে নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের প্রশংসাপত্রও দেওয়া হতো। ১৮৬১ খৃঃ কৃষ্ণনগরে পাদ্‌রী ডাইসনেব সহজজ্ঞান-বিরোধী প্রশ্নের সমুচিত জবাব দিয়ে কেশবচন্দ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জন কবেছিলেন ('আচার্য কেশবচন্দ্র'—গৌবগোবিন্দ উপাধ্যায়, পৃঃ ১৪১)। চন্দ্রনাথ বসু এ-সময়ে কেশবচন্দ্রেব প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়ে নিয়মিত যেতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শনেব প্রভাব তখনও তাঁর মধ্যে কিছুটা প্রবল থাকায় তিনি কেশবচন্দ্রেব সমস্ত বক্তব্য উপলব্ধি করতে পারতেন না। কেশবচন্দ্রেব মুখে বীড, হ্যামিল্‌টন, কাণ্ট, ভিক্টব কুঁজা প্রভৃতি ইউবোপীয় দার্শনিকদেব দার্শনিকতত্ত্বেব আলোচনা শুনতেন, ভালো বুঝতে পাবতেন না। কাবণ, এঁবা ছিলেন প্রজ্ঞাবাদী দার্শনিক। টমাস রীডই (১৭১০—১৭৯৬) 'স্কটিশ স্কুল অফ ফিলজফি'র প্রতিষ্ঠাতা। হিউমের যুক্তি ও সংশয়বাদেব প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তিনি। তাঁব রচিত **'An Inquiry Into the Human Mind, On the Principles of Common Sense'** (১৭৬৪) গ্রন্থে হিউমের প্রত্যুত্তরে লিখিত **'Philosophical Orations'**-এর প্রবন্ধগুলিও স্থান পেয়েছে।

স্যার উইলিয়ম হ্যামিল্টন (১৭৮৮—১৮৫৬) ছিলেন রীডেব ভাবশিষ্য। তিনি **'Scottish Metaphysics'**-এ বিশ্বাস করতেন। অক্‌সফোর্ডে তিনি প্রেতবিদ্যা (**Witchcraft**) শিখেছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবে তিনি যুক্তিকে নস্যাৎ করে রহস্য ও অতীন্দ্রিয়বাদ প্রচার করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরকে তিনি অচিন্তনীয়, অবাঙ্‌মানসগোচর বলে মনে করতেন। তাঁর বক্তব্য

হল, 'A God understood would be no God at all ; 'To think that God is, as we can think him to be, is blasphemy.'

১৮৫৩ খৃঃ প্রকাশিত 'Discussions in philosophy, Literature' এবং 'Lectures on Metaphysics and Logic' গ্রন্থে তিনি এই মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯—৩১) তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের প্রতিবাদে হোরেস হেম্যান উইলসনকে যে দ্বিতীয়পত্র[২] লিখেছিলেন তাতে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের হিউমের বিরোধী কথোপকথন (cleanthes এবং philo) শিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে রীড ও ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট-এর প্রতিবাদী মতও পড়ান হতো বলে জানা যায়। কিন্তু এই প্রতিবাদীদের চেয়ে বড় হিউমই যে বেশি জনপ্রিয় ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হিন্দু ছাত্রদের মনে ধর্মবিরোধী মনোভাবসৃষ্টি, হিন্দুছাত্রদের আচার-ভ্রষ্টতা প্রভৃতি 'মিথ্যা' অভিযোগে ১৮২৮ খৃঃ ডিরোজিও কর্মচ্যুত হলেও তাঁর ভাবাদর্শের অস্তিত্ব ১৮৬০-এর পরেও কিছু কিছু ছিল। কাজেই চন্দ্রনাথ বসু যদি কেশবচন্দ্রের রীড, হ্যামিল্‌টন ব্যাখ্যা ভালো বুঝতে না পারেন, সেজন্য বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রেসিডেন্সী কলেজের যুক্তিবাদী শিক্ষার প্রভাব তাঁর মনে কিছুদিন সক্রিয় ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এই কলেজে তিনি বেশ কয়েক বছর অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৮৬৫ খৃঃ বি এ, ১৮৬৬ খৃঃ এম এ পরীক্ষা তিনি এখান থেকেই পাস করেন। ১৮৬৯ খৃঃ ২৯শে এপ্রিল বেথুন সোসাইটির (স্থাপিত ১৮৫১) ষষ্ঠ অধিবেশনে 'The effects of English education upon Bengali Society'—শীর্ষক আলোচনায় যোগ দিয়ে চন্দ্রনাথ বসু ইংরাজি শিক্ষা, য়ুরোপীয় আচার-ব্যবহার সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইউরোপীয় আচার-আচরণ সমাজ মধ্যে প্রবর্তিত যে হবে তা কারো ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করবে না। ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই তা আসবে।[৩] ১৮৭৮ খৃঃ পর্যন্ত তাঁর এ মনোভাব বজায় ছিল।

দেব-দেবীতে তখনও তাঁর বিশ্বাস ছিলনা। তিনি ছিলেন 'ইংরাজী ভাবাপন্ন।' তাঁর এ-মনোভাব ফুটে উঠেছে ১৮৭৮ খৃঃ ২৫শে এপ্রিল বেথুন সোসাইতে প্রদত্ত High Education in India' নামক একটি বক্তৃতায়।[৪] ফাদার লাফোঁ সেই বক্তৃতাসভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'

পত্রিকায় ৭ই মে তারিখে লেখা হয়েছিল, **'At last Thursday's meeting of the Bethune Society Babu Chandranath Bose M.A., delivered an exhaustive and eloquent lecture on High Education in India. The very Revd. Father Lafont Presided and wound up the discussion with a thoughtful and telling speech'.**

ব্রহ্মসমাজে অন্তর্দ্বন্দ্ব, কেশবচন্দ্রের অতিমাত্রায় 'প্রত্যাদেশ'-বিশ্বাস ও খৃষ্টপ্রীতি, ১৮৭২ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় 'ব্রাহ্ম বিবাহ বিল' পাশ হওয়ার ফলে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মনে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই সময় থেকে চন্দ্রনাথ বসুর জীবনে কিছুটা পরিবর্তন আসা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ১৮৭৮ খৃঃ পর্যন্ত তিনি সংশয়বাদ ও পাশ্চাত্য ভাবধারার বিশ্বাসী ছিলেন। সংশয়ের কুয়াশা তাঁর মন থেকে একেবারে কাটেনি বলে এরপর তিনি ফরাসী দার্শনিক অগস্ত কঁতের (১৭৯৮-১৮৫৭) প্রত্যক্ষবাদ দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। এখানে স্মর্তব্য যে, প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় চন্দ্রনাথ বসু বিখ্যাত কঁৎ-পন্থী কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কাছে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন, তিনি ঈশ্বর বা পরকাল কিছুই মানতেন না।[৫] চন্দ্রনাথ কঁতের দু'একখানি গ্রন্থও অধ্যয়ন করেন। বিখ্যাত কৎ-পন্থী দ্বারকানাথ মিত্রের (১৮৩২-৭৪) সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেক সংস্কারপন্থী, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও কঁৎ-অনুরাগী ছিলেন। এর কারণ আছে। কঁতের অধিকার ভেদ, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি সংস্কার, পঞ্জিকা পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ক মতবাদ হিন্দুধর্মের সঙ্গে মেলে।[৬] তিনি প্রাচীন ঐতিহ্য ও বিশ্বাসকে ভাঙতে চাননি। তাছাড়া কঁৎ রোমান ক্যাথলিকদের চাঁদাস্বরূপ টাকা দিতেন বলেও জানা যায় ('পুরাতন প্রসঙ্গ', প্রথম পর্যায়, পৃঃ ৬৩-৬৪)। কঁৎ বিবাহকে যেভাবে তিনভাগে ভাগ করছেন, তার সঙ্গে মনুর যথেষ্ট মিল আছে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও বিশ্বাস ভেঙ্গে দিতে চান নি বলে তিনি এমন কতগুলি অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছিলেন যার সঙ্গে প্রাচীন বিশ্বাসের যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু শ্রাদ্ধের অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান কঁতের পঞ্জিকাতেও আছে। শুধু পার্থক্য এই যে, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট না করে মৃত ব্যক্তিদের জন্য তিনি একটিমাত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। বিভিন্ন মাসের নামকরণে তিনি দেবতাদের বাদ দিয়ে তেরজন মনীষীর নাম ব্যবহার

করেছেন। তাঁর ব্যবস্থামত একটি মাস হবে আটাশ দিন নিয়ে। এ হিসাবে ৩৬৪ দিন পাওয়া যায়। বাকি যে একদিন রইল, সেদিনের নাম দেওয়া হয়েছে **'Feast of all the dead'.**

ভক্ষ্য-অভক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব অনেকটা হিন্দু শাস্ত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি মনে করতেন, আহার্যে বাছ-বিচার থাকলে মানুষ সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে। এ-বিষয়ে প্রাচীন গ্রীক, ল্যাটিন এবং আধুনিক ফরাসী, স্পেনীয়, ইটালী, জার্মান ও ইংরাজী ভাষায় যত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে সেগুলি বাছাই করে **Political Library** নামাঙ্কিত করে একটি তালিকাও তিনি রচনা করেছিলেন।

কঁৎ স্ত্রী-পুরুষকে সমান বলে মনে করতেন না। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন (**Representative Government**) এবং নারীর ভোটাধিকারের তিনি বিরোধী ছিলেন। এ সব বিষয় নিয়ে জন স্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে (১৮০৬-৭৩) তাঁর মতভেদ হয়েছিল। মিল ছিলেন নারী ভোটাধিকারের প্রধান সমর্থক। বিধবা বিবাহকেও কঁৎ কার্যতঃ অস্বীকার করেছেন। হিন্দু উত্তরাধিকার ও জাতিভেদকে তিনি পরোক্ষে উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন। এজন্য মনুকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ হয়তো কঁতের আদর্শ অনুসরণ করেই চতুরাশ্রমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের **'Calcutta Review'** (**June-Dec. P. 284**) পত্রিকায় **'Caste in India'** নামক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দুজাতি বিনা আইনে দারিদ্র্যসমস্যা দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। এই পত্রিকায় প্রকাশিত মিঃ শেরিং (**Shering**)-এর **'Caste in India'** শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে তিনি প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। এসব কারণে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ধ্রুববাদের হিন্দুরূপমূর্তিদানে অগ্রণী হয়েছিলেন। **'Humanity'**র নারায়ণী রূপ-কল্পনা কঁৎকে ঋষি আখ্যানদানের চেষ্টা এবং ধ্রুববাদী দর্শনে জবাকুসুম-সঙ্কাশং ইত্যাদি সূর্যের স্তব যোগ করার প্রেরণা তার সাক্ষ্য বহন করে। আসলে কঁতের প্রচারিত মতাদর্শের মধ্যে বুদ্ধিসুলভ রক্ষণশীলতা ছিল বলেই অনেকে এ-কার্যে অগ্রণী হয়েছিল। কঁৎ-শিষ্য দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনীকার দীনবন্ধু সান্যাল মহাশয় লিখেছেন, উনিশ শতকে হিন্দু স্থিতিবাদ ও আনুগত্য-স্পৃহাকে কঁৎ-দর্শন প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।[৭]

চন্দ্রনাথ বসু ঐ একই কারণে কঁতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে মনে

হয়। কিন্তু কঁৎ-এর মতবাদে 'ঈশ্বর' নেই দেখে তিনি অপ্রসন্ন হন। অবশেষে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে শশধর তর্কচূড়ামণির একটি মন্তব্য শুনে তাঁর সমস্ত সংশয় কেটে যায়। এর পর থেকে চন্দ্রনাথ বসুর জীবনে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায় যুক্তির নয়—ভক্তি ও বিশ্বাসের। শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছেন, 'তিনি (শশধর তর্কচূড়ামণি) যেমন বলিলেন—ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম, অর্থাৎ যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম—অমনি আমার সকল সংশয় দূর হইল, বিশ্বে যাহা কিছু আছে সকলই ধর্মের অন্তর্গত দেখিলাম, বিশ্বে যাহা কিছু আছে বিশ্বনাথ হইতে তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে বিশ্বনাথকে পাওয়া যায় না বুঝিলাম, কারণ বিশ্ব তাহা হইলে আমাদিগকে রক্ষা না করিয়া বিনাশই করে, যাহা এত অন্বেষণে পাই নাই তাহা পাইলাম।[৮]

এই সময় থেকে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য-খ্যাপন তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ হল। 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১৮৮১) থেকে 'কঃ পন্থা' (১৮৯৮) পর্যন্ত তারই একটানা ইতিহাস। শুধু ভাবের দিক থেকে নয়, ভাষার দিক থেকেও পরিবর্তন এসেছিল। 'শকুন্তলাতত্ত্বে'র পর তিনি একমাত্র সরকারী কাজ ছাড়া আর ইংরাজীতে কিছু লেখেন নি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু-জাগরণের ধারাকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ব্রাহ্ম সমাজ ও খৃষ্টান মিশনারীদের হাত থেকে শিক্ষিত হিন্দু-যুবকদের উদ্ধার করার জন্য এক শ্রেণীর উগ্র হিন্দু প্রচারক উদ্ভট যুক্তি-জালকে সর্বস্ব করেছিলেন। অপর শ্রেণী গ্রহণ করেছিলেন যুক্তির আশ্রয়। এঁরা প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ তাঁদের কাছে সেদিন নৈতিক ভীরুতা বলেই মনে হয়েছিল। যুবশক্তির একটি অংশ যখন প্রচলিত হিন্দু আচার-ব্যবহারকে উপেক্ষা করে স্বাধীন চিন্তার নামে প্রায় উচ্ছৃঙ্খলতায় মেতে উঠেছে তখন এঁরা হিন্দু ধর্মের পুনরুদ্ধার ঘটিয়ে সমাজ-বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই পথই অবলম্বন করেছিলেন। ভাবাবেগকে বাদ দিয়ে তিনি যুক্তিকে বেছে নিয়েছিলেন। অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও সম্পূর্ণ অলৌকিক বিষয়গুলিকে সমর্থন না করে হিন্দু ধর্মের মূল সত্যকে যুক্তির দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রণী হলেন তিনি। ভূদেব-শিষ্য চন্দ্রনাথ বসু এই দলভুক্ত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের উক্তিটি প্রণিধান-যোগ্য—'যাহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া হিন্দু ও হিন্দুত্বকে কেবল ঘৃণা করিতে

শিখিয়াছে, তাহাদিগকে মনে ঘৃণার পরিবর্তে অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দেওয়াও যেমন একটি কর্তব্য, তেমনিই আর একটি কর্তব্য, হিন্দুধর্মের মধ্য হইতে স্ব-ধর্মনিরত হিন্দুদিগের নিমিত্ত অনুরাগের ও শ্রদ্ধার সামগ্রী আহরণ করা। সমাজ-বন্ধন যে স্থানে শিথিল হইয়াছে, সে স্থানে সে বন্ধন দৃঢ় করা, এবং যে স্থানে দৃঢ় আছে, সে স্থানে তাহা চিরকাল দৃঢ় রাখিবার বন্দোবস্ত করা উভয়ই কর্তব্য কর্ম। চন্দ্রনাথ বাবুর সমস্ত শক্তি এই কার্যে নিয়োজিত হইল।'[৯]

'পুনরভ্যুত্থানবাদী'গণ অতীতের অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে জাতিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হন। চন্দ্রনাথ বসু শুধু অতীত-কথা স্মরণ করেননি, তাকে সক্রিয় করতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। শুধু তত্ত্ব নয়, বাস্তব সমাজের প্রতিও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। 'এক সময়ে আমাদের এত বড় মন ছিল, শুধু এই গর্ব করিলে আমরা হিন্দু নামের যোগ্য হইব না, বরং অধিকতর অযোগ্যই হইব। প্রাচীন বৈভবের গর্ব করা মনুষ্যত্ব নয়, প্রাচীন বৈভব পুনর্লাভ করাই মনুষ্যত্ব। কিন্তু আমাদের প্রাচীন বৈভবের ন্যায় বৈভব জগতে আর নাই। অতএব আমাদের ন্যায় বিপুল চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা আর কাহারো নাই।·····আর সে বিরাট মন লাভ করিতে না পারিলে আমরা আর যাহাই করি—আচার পালনই করি, অনুষ্ঠান অনুসরণই করি, যাহাই করি—কিছুতেই প্রকৃত হিন্দু হইব না। প্রকৃত হিন্দু হওয়ার ন্যায় কঠিন কাজ আর নাই—মহৎ কাজ আর নাই।'[১০]

এই মহৎ কাজ করার জন্য তিনি হিন্দু জাতির প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করে অন্যান্য জাতির তুলনায় এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। এযুগে এঘটনা অবশ্য নতুন নয়। ১৮৭২ খৃঃ 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' গ্রন্থে আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা রাজনারায়ণ বসু এর প্রথম সূচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (চৈত্র ১২৭৯, পৃঃ ৫৭১-৭৬) এই গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছিলেন, 'রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক।' ইউরোপীয় সভ্যতা থেকে হিন্দু সভ্যতা অনেক শ্রেষ্ঠ – সে কথা বলে চন্দ্রনাথ বসুও অন্ধ ইংরাজ-প্রীতি দূর করতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি যে যুক্তিগুলি দেখিয়েছেন সেগুলি হল :

১। হিন্দুর সোঽহং বা ব্রহ্মের সঙ্গে একত্বদর্শিতা অভিনব। 'খৃষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপের সাহিত্যে, ধর্মের ইতিহাসে, মহত্ত্ব এবং বীরত্বের কাহিনীতে অহং বা আত্ম বড়ই গৌরবের জিনিষ। মানুষের সেই

পরব্রহ্ম—এক হিন্দু ছাড়া আর কেহই এত উচ্চ ভাবনা ভাবিতে সক্ষম হয় নাই, আর কাহারই এমন কথা ভাবিবার সাহস হয় নাই।……সূক্ষ্মদর্শী বিবাটমতি হিন্দুব সূক্ষ্মতম অতি-বিরাট সোহহং—এর অর্থ—প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান, প্রকৃত আত্মজ্ঞান—অপরিসীম মন, অপরিমিত সাহস—সমস্তের সামঞ্জস্য, সমস্তের মহত্ত্ব, সমস্তের একত্ব, অত্যুচ্চ বিশ্বব্যাপী কবিত্ব।

হিন্দুর সোহহং বলিতেছে, হিন্দুর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মদর্শী ব্রহ্মভক্ত, ব্রহ্মাণ্ড-গ্রাহী, অপবিমিত-সাহসসম্পন্ন বিরাটমনা মনুষ্য পৃথিবীতে আব কোথাও দৃষ্ট হয় নাই।'[১১]

২। হিন্দুব লয়তত্ত্ব বা অলৌকিক পৌরুষেয়তাব মধ্যে জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, পৃথিবীব আব কোন ধর্মে নেই।

('সোহহং'—'হিন্দুত্ব')

৩। নিষ্কাম কর্মবাদ হিন্দু ধর্মের একটি লক্ষণ। এই লক্ষণ খুবই উৎকৃষ্ট—অসাধাবণ অলৌকিক। ('সোহহং'—'হিন্দুত্ব')

৪। পৃথিবীতে হিন্দু সবচেয়ে বেশি দৃঢপ্রতিজ্ঞ। এই দৃঢ প্রতিজ্ঞা হিন্দুব লক্ষণ—হিন্দুত্বেব লক্ষণ। ('সোহহং'—'হিন্দুত্ব')

৫। হিন্দু অন্য সম্প্রদায়েব তুলনায় বেশি কষ্ট-সহিষ্ণু। ইউবোপেব কষ্ট দেহেব জন্য, হিন্দুব কষ্ট আত্মার জন্য। ইউবোপের কষ্ট নিজের জন্য, হিন্দুর কষ্ট সবেব জন্য। ('তুষানল'—'হিন্দুত্ব')

৬। হিন্দুধর্মেব সুদূবগামিতা সবচেয়ে বেশি। হিন্দুধর্ম তুচ্ছ বিষয়কে বাদ দেয় না, জীবনের কডাক্রান্তি হিসেবের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

('তুষানল'—'হিন্দুত্ব')

৭। অনিত্যে নিত্যত্বপ্রিয়তা একমাত্র হিন্দুছাডা আর কারো নেই। পূর্ণ ও প্রকৃত নিত্যত্বপ্রিয়তা হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুধর্মেব লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ। ('তুষানল'—'হিন্দুত্ব')

৮। আহার-বিহারে কোন্‌টা গ্রহণীয়, কোন্‌টা বর্জনীয় সেগুলি নির্বাচনে হিন্দুধর্ম যে দূবদর্শিতার পবিচয় দিয়েছে অন্য কোন ধর্ম তা পাবেনি।

('তুষানল'—'হিন্দুত্ব')

৯। হিন্দুধর্মে যে সংযম ও ব্রহ্মচর্যেব কথা আছে সেরকম আব কোথাও দেখা যায় না। ('তুষানল - হিন্দুত্ব')

১০। হিন্দু-বিবাহ ইউরোপীয় বিবাহ থেকে অনেক উৎকৃষ্ট। ইউরোপের মত তা চুক্তি বা Contract নয়—দুটি হৃদয়েব একীকরণ।
('তুষানল'—'হিন্দুত্ব')

১১। হিন্দু সমাজবাদী—পাশ্চাত্যের মত ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। হিন্দুর বিবাহ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে সমাজমুখী। (ঐ)

১২। হিন্দুর মত সর্বত্র ব্রহ্মদর্শী জাতি আব কোথাও দেখা যায় না। এজন্যই তেত্রিশ কোটি দেবতাব পবিকল্পনা। হিন্দুব মন বিশ্বব্যাপী, সমগ্রগ্রাহী, সমগ্রদর্শী বলিয়া হিন্দু জগদীশ্ববেব এত মূর্তি দেখেন, এবং জগদীশ্ববের এত মূর্তি দেখেন বলিয়া হিন্দু জগদীশ্বরেব পূজায় এত পাগল, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়.. তেত্রিশ কোটি দেবতা বা সর্বত্র ব্রহ্মদর্শিতা একমাত্র হিন্দুব লক্ষ, হিন্দুধর্মের লক্ষণ। এ লক্ষণের অর্থ সমগ্রদর্শিতা—সমগ্রগ্রাহিতা।
('তেত্রিশ কোটি দেবতা'—হিন্দুত্ব)

১৩। মূর্তিপূজার ব্যবস্থা কবে হিন্দু শাস্ত্রকার যে 'অধিকারদর্শিতা ও বাজনৈতিকাব' পবিচয় দিয়েছেন, আব কোন শাস্ত্রকার সে পরিচয় দেন নি।

১৪। হিন্দুধর্মেব যে মৈত্রী, সর্বভূতে অনুবাগ বা বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতার কথা আছে, আর কোন ধর্মে তা নেই। (ঐ)

১৫। হিন্দু সবচেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক, সেজন্য পরলোকের দিকে তার এত ঝোঁক। (ঐ)

১৬। হিন্দুব দাম্পত্য জীবনেব মত আদর্শ দাম্পত্য-জীবন আর দেখা যায় না। বিশেষভাবে হিন্দুনারীব সতীত্ব জগতে অতুলনীয়। 'হিন্দুপত্নী' একটি প্রেম-রহস্য—হিন্দু ভিন্ন সে রহস্য আর কাহারো হৃদয়ঙ্গম হইবার নয়। হিন্দুপত্নীকে যে না বুঝে সে প্রেমতত্ত্ব পূর্ণমাত্রায় বুঝে না, বুঝিতে পারে না। সে বোধ হয় প্রকৃত ও পূর্ণ প্রেমিক হইতে পারে না।' ('দুইটি হিন্দু পত্নী'—ত্রিধারা)

১৭। ইংবাজের মত বাহ্য সম্পর্কে সমৃদ্ধ না হলেও, ধর্মজ্ঞান ও চরিত্রশক্তিতে হিন্দু শ্রেষ্ঠ। ('দুইটি হিন্দু পত্নী'—ত্রিধারা)

'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১৮৮১) থেকে 'কঃ পন্থা' (১৮৯৮) পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি এই তত্ত্বগুলি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা

প্রয়োজন যে, এ-যুগে প্রাচীন সাহিত্যালোচনায় হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতির জয়গান ঘোষিত হয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেযুগের অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক-সমালোচক শকুন্তলাতত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন। ১৮৮১ খৃঃ চন্দ্রনাথ বসু শকুন্তলাতত্ত্ব আলোচনা করার পর, ১৮৮৭ খৃঃ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রবন্ধের অনেকটা প্রত্যুত্তর হিসাবে ১৯০২ খৃঃ লিখেছিলেন বিখ্যাত 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটি। 'বঙ্গদর্শন'-যুগে রচিত প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলার চেয়ে মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনাকে বড়ো করেছেন। চন্দ্রনাথ বসু (বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গিকৃত) 'শকুন্তলাতত্ত্বে' নাট্যরস বা শিল্প-সৌন্দর্য বিশ্লেষণ না করে হিন্দু-সমাজবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে সমাজ, সৌন্দর্য ও কল্যাণের প্রশ্নটি এনেছেন।

চন্দ্রনাথ বসু সাহিত্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে হিন্দুসমাজ ও ধর্মের পুনর্জাগরণে সম্ভবতঃ সর্বাধিক সহায়তা করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থে এর পরিচয় স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। 'শকুন্তলাতত্ত্বে'র অন্তর্গত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলের অর্থ' প্রবন্ধটিতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, বিবাহের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় সুখ নয়—পুত্রোৎপাদনও নয়—সমাজের সার্বিক কল্যাণ। সমাজকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত সুখভোগের জন্য উন্মুখ হলে দুর্বাসার অভিশাপের মত সামাজিক অভিশাপ নেমে আসতে বাধ্য।

'কঃ পন্থা'য়ও ভারতের গৌরব-মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। বর্তমান ভারত কোন্ পথে যাবে—ইহলোকবাদী ইউরোপের পথে না, পরলোকবাদী ভারতের পথে; 'ভারতের পথ ঠিক না, ইউরোপের পথ ঠিক'—তার মীমাংসা করেছেন তিনি এই গ্রন্থে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ইউরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করে ভারতীয় সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছেন। 'ইউরোপীয় সাহিত্যের মানুষ প্রায়ই স্থূল মানুষ—সে মানুষের কথা অধিক পড়িলে মানব প্রকৃতিতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত আছে তাহার বিকাশের ব্যাঘাত হইবারই সম্ভাবনা। এমন কি, ঐ সাহিত্যের শিরোমণি সেক্সপীয়রের গ্রন্থাদি পাঠও বোধ হয় সকলের পক্ষে এবং সকল বয়সে নিরাপদ নহে।'[১২] সুতরাং চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সিদ্ধান্ত: 'আবার বলি, অনিবার্য কারণে হিন্দুর পার্থিব অবস্থায় আজ যে পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছে তাহার জন্য হিন্দু যদি আপন মহতী প্রকৃতিতে জলাঞ্জলি দিয়া ইউরোপের পথে ইউরোপের ন্যায়

ছুটিতে না পারে, তাহা হইলে মানুষের কাছে তাহার যাহাই হউক; বিধাতার কাছে কোন অপরাধ হইবে না। আর ইউরোপের পথে ইউরোপের ন্যায় ছুটিতে না পারিবার জন্য তাহার যদি মৃত্যু ঘটে—মৃত্যু ঘটিবে না, মৃত্যু ঘটিতে পারিবে না, তাহা জানি—কিন্তু ধরা যাউক যদি মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে সে বড় গৌরবের মৃত্যু হইবে।'[১৩]

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে, এ-যুগের আরও কয়েকজন সাহিত্যিক-সমালোচক সাহিত্যে ইউরোপীয় ভাবাদর্শের 'অনুসৃতিকে নিন্দা করে, ভারতীয় সাহিত্যের গৌরব ঘোষণা করেছিলেন। পূর্ণচন্দ্র বসু 'সাহিত্যে খুন' (সাহিত্য—১৩০২) নামক প্রবন্ধে ইউরোপীয় ট্র্যাজেডিকে ভারতীয় জীবনাদর্শ বিরোধী বলে অভিহিত করে লিখেছিলেন, 'আজি আমরাও সেক্সপীয়রের পাঠক, পাঠক কি! তাঁহাকে পূজা করিতেছি; কালিদাস যে সাহিত্যের সিংহাসনে বসিয়া তাহা শত শোভায় শোভিত করিয়াছেন, এবং শত মাধুর্যে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সেই সাহিত্যে আজি আমাদের প্রবৃত্তি নাই। ব্যাস, বাল্মীকি অন্ধকারে বসিয়া কাঁদিতেছেন। ভবভূতির অলোক-সাধারণ 'উত্তর চরিত' অবজ্ঞাত হইয়াছে।·· ···ম্যাকবেথের বিষ ছিল কেবল ইংরেজী ভাষায়, এখনকার কুরুচিসম্পন্ন লোকে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় আনিয়াছে।' বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় 'বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২) শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিম-সাহিত্যে হিন্দু-জীবনাদর্শের বিরোধিতা করা হয়নি—একথা উল্লেখ করে উল্লসিত হয়েছেন। যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ) মহাশয়ও 'বিষবৃক্ষ' নামক প্রবন্ধে (আর্যদর্শন, ১২৮৪) সূর্যমুখীর প্রশংসা করেছিলেন। কারণ, এই চরিত্রের মাধ্যমে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় নারীত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আবার ত্যাগে, তিতিক্ষায় ভ্রমর চরিত্রকে আদর্শস্থানীয় করতে পারেন নি বলে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দাও এখানে করা হয়েছিল।

'সাবিত্রী তত্ত্ব' (১৯০০) গ্রন্থে চন্দ্রনাথ বসু ভারতীয় নারী-আদর্শের জয়গান ও পৌরাণিক ভাবধারার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সাবিত্রীর জন্ম, সাবিত্রীর বিবাহ, সাবিত্রীর বধূত্ব, সাবিত্রীর পাতিব্রত্যের মাধ্যমে তিনি হিন্দু বিবাহ-পদ্ধতি, নির্বাচন-প্রথা, দাম্পত্যজীবন এবং সতীত্বের আদর্শকে প্রচারিত করেছেন। সমগ্র জগৎ যে একদিন এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হবে, এ আশাও প্রকাশ করেছেন তিনি। 'কঃ পন্থায় বলিয়াছিলাম—একদিন সমস্ত মানবকে ভারতের বাসনা

বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে। সাবিত্রী তত্ত্বে বলিতেছি—একদিন সমস্ত মানবকে ভারতের লোক-সমষ্টি বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে।'[১৪]

'ফুল ও ফল' (১৮৮৫) গ্রন্থে অদৃষ্টবাদ, ইহকাল-পরকাল সম্বন্ধীয় মতবাদের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ভালবাসার কথাটিও স্থান পেয়েছে। 'বিশ্বব্যাপী ভালবাসা কাহাকে বলে, প্রাচীন হিন্দুরা তাহা জানিতেন, আব কেহই তাহা জানিতে পারেন নাই। কোম্‌তের ভালবাসা অতি সঙ্কীর্ণ। আমার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্পর্ক আছে, কিন্তু কোম্‌তের ভালবাসা মনুষ্য সম্বন্ধ। কোম্‌তের ভালবাসায় আমাব কুলায় না। কি জানি, মরিয়া যদি এমন স্থানে যাইতে হয়, যেখানে মানুষ নাই, তাহা হইলেও মবিলে আমার কষ্টের সীমা থাকিবেনা। তাই বলি, প্রাচীন হিন্দুব বিশ্বব্যাপী ভালবাসা শিক্ষা কব।'[১৫]

চন্দ্রনাথ বসুর কঁৎ-সম্পর্কিত উক্তি অবশ্য সর্বাংশে সত্য নয়। কঁতের প্রেম মানব-কেন্দ্রিক হলেও, তার মধ্যে যে উচ্চভাবেব আদর্শ আছে, তা খুবই বিরল। প্রকাশকেব সঙ্গে মতান্তরেব ফলে কঁতের স্ত্রী বিরক্ত হয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে যান। তা সত্ত্বেও কঁৎ স্ত্রীকে বিপদে ফেলেন নি, তাঁব অর্থকষ্ট দূরীকরণের জন্য তিনি নিয়মিত দু'হাজাব ফ্রাঙ্ক পাঠিয়ে দিতেন। একজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীব স্ত্রী ক্লোটিল্‌ডা তাঁকে ভালবাসেন। কিন্তু ক্লোটিল্‌ডাব বিবাহে সম্মতি না থাকায় কঁৎ তাঁকে বিবাহ কবেন নি। কঁৎ তাঁর **'Positive politics'** গ্রন্থখানি ক্লোটিল্‌ডাব উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কবেছিলেন। তাঁর নাবী-মাহাত্ম্য বর্ণনা নারী-মুক্তি আন্দোলনে যথেষ্ট শক্তিসঞ্চাব করেছিল

প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রনাথ বসু এসময়ে পাশ্চাত্য কোন ভাবধাবাকে ভাল বলে স্বীকাব করেন নি। ১৮৮৩ খৃঃ লিখিত ব্যঙ্গ-উপন্যাস 'পশুপতিসম্বাদে' এই মনোভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ('সাহিত্য সাধক চবিতমালা'য় 'পশু-পতি সম্বাদ'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে উল্লিখিত হয়েছে। এটা ঠিক নয়)। ইংরাজেব অনুকবণে সভা-সমিতি, বিতর্ক সভা, নাবী-উদ্ধার প্রচেষ্টা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতির অন্তঃসাবশূন্যতা প্রমাণ কবার জন্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাবত উদ্ধার' (১৮৭৭)-এব অনুসবণে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'ভারত উদ্ধারের' বিপিনকৃষ্ণেব সঙ্গে এই গ্রন্থেব পশুপতি ভট্টাচার্যের, 'আর্য-কার্যকরী সভার' সঙ্গে পশুপতির 'পটলডাঙ্গা ডিবেটিং সোসাইটি'র যথেষ্ট মিল আছে। অল্প-শিক্ষিত পশুপতিও বিপিনকৃষ্ণের মতো ভারত উদ্ধারে রত হয়েছিল। আবার ১৮৮৮ খৃঃ ইন্দ্রনাথ-লিখিত 'ক্ষুদিরাম' উপন্যাসের বিষয়বস্তুর

সঙ্গে 'পশুপতি সম্বাদের' আশ্চর্য মিল আছে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্ষেত্রে চন্দ্রনাথ বসুর অনুকরণ করেছেন বলেই মনে হয়। 'পশুপতি সম্বাদে' একশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যথেচ্ছচারিতা, সংস্কারের নামে উচ্ছৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে চন্দ্রনাথ বসুর প্রথম জীবনের সংশয়বাদের প্রতিফলন থাকাও আশ্চর্য নয়। 'পটলডাঙ্গা ডিবেটিং সোসাইটি' চন্দ্রনাথ বসুর স্কুল-জীবনের 'ওরিয়েণ্টাল ডিবেটিং ক্লাবে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'পশুপতিসম্বাদে' সংস্কারবাদী পশুপতির মাধ্যমে বঙ্কিমসাহিত্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। 'আবার দেখুন, বিষবৃক্ষে বঙ্কিমবাবু কি বুদ্ধির ধ্বজা উড়াইয়াছেন! চিত্তশালিনী, দুঃখিনী, পতিবিয়োগিণী জননী সূর্যমুখীকে সেই নরক যন্ত্রণাময়, নিদারুণ, নিষ্পীডণ, নির্বিঘ্ন অবরোধময় Zenana হইতে নিষ্ক্রান্ত দিয়া আবার তাহাকে তাহারই হৃদয়াভ্যন্তরে পুরিয়া রাখিলেন (Hear, hear)। সভ্য মহাশয়গণ, বঙ্কিমবাবুর আরো কিছু পরিচয় দিব। তিনি হীরা দাসীকে কতই না যন্ত্রণা দিয়াছেন। সে বাল-বিধবা। তাহার Physiological want কত! তা সে করিয়াছিলই বা কি? তথাপি সেই নির্দয়, নিষ্ঠুর, নিশানবাহী, নিষ্কলঙ্ক বঙ্কিম, পরিচারিকা প্রধান, পতিব্রতা চূড়ামণি হীরা সম্মোহিনীকে পাগল করিয়া ছাড়িয়াছেন' ('বঙ্গদর্শন,' অগ্রহায়ণ ১২৯০, পৃঃ ৬০)। এই মন্তব্যে চন্দ্রনাথ বসুর সংস্কার-বিরোধী মনোভাব সুস্পষ্ট।

ঐতিহ্যপ্রীতিই তাঁর এই সংস্কার-বিরোধিতার অন্যতম কারণ। 'Oriental Miscellany' নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় 'Durga Puja in my Boyhood' সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে দুর্গাপূজার সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উপকারিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ইংরাজের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিও কটাক্ষ করা হয়েছিল এই প্রবন্ধে। তিনি লিখেছিলেন, 'Our ancestors, who never consulted political economy in making their Puja expenses, served the cause of humanity and national welfare by winning the respect, the affection and the confidence of their humbler countrymen ..... Englishmen want money for money. But we are not Englishmen and their would be both folly and national danger in our adopting the Englishmen's view of the social function of money.' ('পৃথিবীর সুখ-দুঃখ'—ক্রোড়পত্র)

চন্দ্রনাথ বসুর মনোভাব বুঝতে এই প্রসঙ্গগুলি যথেষ্ট সহায়ক। হিন্দু সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তিনি যে চেষ্টা করেছিলেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও বলা যায়, তাঁর কিছু কিছু মতামত বুদ্ধির দিক থেকে আপত্তিকর—অনেকটা প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি পুরুষের ক্ষেত্রে বেশি বয়সে বিয়ে করাকে সমর্থন করেছেন, মেয়েদের ক্ষেত্রে তা করেন নি। তিনি জাতিভেদ ও বর্ণভেদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, বিধবা বিবাহের প্রতি প্রকারান্তরে অসমর্থন এবং বহু বিবাহকে সমর্থন করেছেন, জড় বিজ্ঞান, ঐহিকতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে মর্তবিমুখতার পরিচয় দিয়েছেন। অদৃষ্টবাদ, কর্মফলবাদ ও অতিলৌকিকতাকে এমনভাবে সমর্থন করেছেন যার ফলে অনেক সময় যুক্তি বা বাস্তবতা অযথা বিপর্যস্ত হয়েছে। সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রেও তিনি 'ধর্মবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়ে অবসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

'হিন্দুপত্নী' (প্রথম নাম 'হিন্দু বিবাহ', ১৮৮৭) নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, হিন্দু স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি। বিবাহকালীন সম্প্রদানের নাকি এটাই গূঢ় অর্থ। একটু পরেই তিনি আবার বলেছেন, হিন্দু স্ত্রী শুধু সম্পত্তি নয়, দেবীও বটে। সম্পত্তি কিভাবে দেবীতে রূপান্তরিত হয়, তা বহু প্রয়াস সত্ত্বেও তিনি প্রমাণ করতে পারেননি। স্ত্রী-পুরুষ ভালবেসে বিয়ে করলে কেউ কাউকে শ্রদ্ধা করেনা—তর্কের খাতিরে একথা মেনে নিলেও, কিন্তু ত্রিশ বছরের পুরুষের বার বছরের স্ত্রী কল্পনাও করা যায় না। চন্দ্রনাথ বাবুর যুক্তি: স্বামী-স্ত্রীর একত্ব সম্পাদনের জন্য, স্ত্রীকে ভালভাবে গড়ে তোলার জন্য অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়া উচিত। শাস্ত্রের উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, ত্রিশ বছরের পুরুষ মধুরদর্শনা দ্বাদশীকে বিয়ে করবে, চব্বিশ বছরের পুরুষ অষ্টম-বর্ষীয়াকে বিয়ে করবে, পুরুষের বয়স মেয়েদের তিন গুণ হওয়া আবশ্যক। কারণ, 'পুরুষ অধিক বয়সে বিবাহ করিবে, কিন্তু স্ত্রীর বিবাহ অল্প বয়সেই সম্পন্ন হওয়া চাই।' অবশ্য শাস্ত্রের কথা বলে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বালিকার সঙ্গে শারীরিক সম্বন্ধ নিষিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এ নিয়ম অনেক সময় প্রতিপালিত হতো না। চন্দ্রনাথ বসুও সেকথা জানেন, কিন্তু তার উল্লেখ করেননি। এদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বেশি উদারতা দেখিয়েছেন। ১২৯৮ খৃঃ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে 'সহবাস সম্মতি আইন' প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার মতে, আইন হইবার প্রয়োজন নাই,

হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই' (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিবিধ' পৃঃ ৩৮০)। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার জবাবে চন্দ্রনাথ বসুর প্রকৃত মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুর উক্তির প্রতিবাদে বলেছিলেন, জলবায়ু নয়—বাল্যবিবাহই বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্বলতার কারণ ('হিন্দু বিবাহ'—'সমাজ')।[১৬] রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুর 'হিন্দুয়ানি' পছন্দ করেন নি। তাই কয়েকটি ব্যঙ্গ-কবিতায় তিনি কটাক্ষ করেছিলেন। কোন কোন সমালোচক মনে করেন, 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে (১ম সংস্করণ) প্রকাশিত 'শ্রীমান্ দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু' ব্যঙ্গ-কবিতাটি নাকি যথাক্রমে চন্দ্রনাথ বসু ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে লক্ষ্য করেই লিখিত হয়েছিল। কবিতাটির 'এমন হিন্দু মিলবেনা যে সকল হিন্দুর সেরা। বোস বংশ আর্য বংশ আর সেই বংশের এঁরা! (বোস্ দামু বোস চামু!)' এই অংশে নাকি সেকথা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল'-এর ২য় সংস্করণ থেকে কবিতাটি বাদ দিয়েছিলেন। বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত প্রশ্নে, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার প্রত্যুত্তরে, চন্দ্রনাথ বসু শারীর-বিজ্ঞানকেও তিরস্কার করেছেন। 'কোন কোন দেহ-বিজ্ঞানবিদ্ বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রীলোক প্রথম রজঃস্বলা হইবার পর কিছুদিন না গেলে গর্ভধারণের উপযোগী হয় না এবং রজঃস্বলা হইবার পরেই গর্ভধারণ করিলে গর্ভজাত সন্তানও দুর্বল হয়। প্রথমে তাহাদের গর্ভধারণের উপযোগী হইবার এবং গর্ভজাত সন্তানের কথা বিবেচনা করা যাক। প্রথম রজঃস্বলা হইবার পরই স্ত্রীলোক গর্ভধারণের উপযোগী হয় না এই মতের পক্ষে সাজান কথার যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পরীক্ষার বা Experiment-এর ফল প্রদর্শিত হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের যুক্তির সফলতা যে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা সকলেরই জানা আছে।'[১৭] চন্দ্রনাথবাবুর উদ্দেশ্য বোঝা গেল। তাঁর এই মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'সমাজ' গ্রন্থে 'হিন্দু বিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষে তিনি চন্দ্রনাথ বসুর বিরুদ্ধে যে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন তা হল— 'প্রথম। হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, কিন্তু ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে হিন্দুবিবাহ সমালোচনা না করাতে তাঁহাদের কথার সত্য মিথ্যা কিছুই স্থির করিয়া বলা যায় না। শাস্ত্রের ইতস্তত হইতে শ্লোকখণ্ড উদ্ধৃত করিয়া একই বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে মত দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়। যাঁহারা বলেন, হিন্দু বিবাহের প্রধান লক্ষ দম্পতির

একীকরণভাব প্রতি, তাঁহাদিগকে এই উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা হইলে পুরুষের বহুবিবাহ এ-দেশে কোনোক্রমে প্রচলিত হইতে পারিত না।

তৃতীয়। আজকাল অনেকেই বলেন হিন্দুবিবাহ আধ্যাত্মিক। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ কী। উক্ত শব্দের প্রচলিত অর্থ হিন্দুবিবাহে নানা কারণে প্রয়োগ কবা যাইতে পাবে না।······

* * * *

চতুর্থ। সমাজেব মঙ্গল যদি বিবাহেব প্রধান উদ্দেশ্য হয়, পাবত্রিক বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য যদি তাহাব না থাকে বা গৌণভাবে থাকে, তবে বিবাহ সমালোচনা কবিবাব সময় সমাজের মঙ্গলের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবং যেহেতু সমাজেব পবিবর্তন হইতেছে এবং নানা বিষয়ে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব সমাজের মঙ্গলসাধক উপায়েবও তদনুসাবে পবিবর্তন আবশ্যক হইতেছে। পুবাতন সমাজেব নিয়ম সকল সময় নূতন সমাজের মঙ্গলজনক হয় না। অতএব আমাদেব বর্তমান সমাজে বিবাহেব সকল প্রাচীন নিয়ম হিতজনক হয় কি না তাহা সমালোচ্য।

পঞ্চম। তাহা হইলে দেখিতে হইবে বাল্যবিবাহেব ফল কী। প্রথম, বাল্য বিবাহে সুস্থকায় সন্তান উৎপাদনেব ব্যাঘাত হয় কি না। বিজ্ঞানের মতে হয়।

ষষ্ঠ। কেহ কেহ বলেন, পুরুষেব অবিক বয়সে বিবাহ দিলেই আব কোনো ক্ষতি হইবে না। কিন্তু পুরুষেব বিবাহ-বয়স বাড়াইলে স্বাভাবিক নিয়মেই হয় মেয়েদেব বয়সও বাডাইতে হইবে নয় পুরুষেব বয়স আপনি অল্পে অল্পে কমিয়া আসিবে, যেমন মনুব সময় হইতে কমিয়া আসিতেছে।

সপ্তম। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, সুস্থ সন্তান উৎপাদনই সমাজের একমাত্র মঙ্গলেব কারণ নহে, অতএব একমাত্র তৎপ্রতিই বিবাহের লক্ষ্য থাকিতে পাবে না। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনেই বিবাহের মহত্ত্ব। অতএব মহৎ উদ্দেশ্য সাধনেব অভিপ্রায়ে বাল্যকাল হইতে স্ত্রীকে শিক্ষিত করিয়া লওয়া স্বামীর কর্তব্য। এইজন্য স্ত্রীব অল্প বয়স হওয়া চাই। আমি প্রথমে দেখাইয়াছি, যথার্থ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অবিক বয়সে বিবাহ উপযোগী। তাহার পরে দেখাইয়াছি, মহৎ উদ্দেশ্য সকল স্বামীবই থাকিতে পারে না; কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই স্বভাবভেদে বিশেষ বিশেষ গুণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে, উক্ত গুণসকল তাহারা স্ত্রীর নিকট হইতে প্রত্যাশা করে; নিরাশ

হইলে অনেক সময়ে সমাজে অশান্তি ও অমঙ্গল সৃষ্ট হয়। অতএব গুণ দেখিয়া স্ত্রী নির্বাচন করিতে হইলে বড়ো বয়সে বিবাহ আবশ্যক।

অষ্টম। কিন্তু পরিণত বয়স্কা স্ত্রী বিবাহ করিলে একান্নবর্তী পরিবারে অসুখ ঘটিতে পারে। আমি দেখাইয়াছি, কালক্রমে নানা কারণে একান্নবর্তী প্রথা শিথিল হইয়া আসিয়াছে এবং সমাজের অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে; অতএব একমাত্র বাল্য বিবাহ দ্বারা উহাকে রক্ষা করা যাইবে না এবং রক্ষা উচিত কি না তদ্বিষয়েও সন্দেহ।

নবম। সমাজে এসকল ছাড়া দারিদ্র প্রভৃতি এমন কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে যাহাতে স্বতই বাল্যবিবাহ অধিককাল টিকিতে পারে না। সমাজে অল্পে অল্পে তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।'

নিরামিষ আহার সম্বন্ধেও উভয়ের মধ্যে তীব্র বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল। চন্দ্রনাথ বসু নিরামিষ আহারকে সাত্ত্বিকতার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সমাজ' গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'কতকগুলি কথা আছে যাহার উপরে তর্কবিতর্ক চলিতে পারে। আহার প্রসঙ্গটি সেই শ্রেণীভুক্ত। লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে কেবল একটি মাত্র যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহা উক্ত রচনার সর্বপ্রান্তে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, সেটি তাঁহার স্বাক্ষর শ্রীচন্দ্রনাথ বসু। পূর্বকালের বাদশাহেরা যখন কাহারও মুণ্ড আনিতে বলিতেন তখন আদেশপত্রে এইরূপ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত যুক্তি প্রয়োগ করিতেন, এবং গুরু পুরোহিতেরাও সচরাচর নানা কারণে এইরূপ যুক্তিকেই সর্বপ্রাধান্য দিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরেজ বাদশাহ কাহারও মুণ্ডপাত করিবার পূর্বে বিস্তারিত যুক্তি নির্দেশ বাহুল্য জ্ঞান করেন না, এবং ইংরেজ-গুরু মত জাহির করিবার পূর্বে প্রয়োগ করিতে না পারিলে গুরুপদ হইতে বিচ্যুত হন। আমরা অবস্থাগতিকে সেই ইংরেজ রাজের প্রজা, সেই ইংরেজ গুরুর ছাত্র, অতএব চন্দ্রনাথবাবুর স্বাক্ষরের প্রতি আমাদের যথোচিত শ্রদ্ধা থাকিলেও তাহা ছাড়াও আমরা প্রমাণ প্রত্যাশা করিয়া থাকি। ইহাকে কুশিক্ষা বা সুশিক্ষা যাহাই বল, অবস্থাটা এইরূপ...... কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় প্রমাণ করিয়াছেন প্রাচীন ভারতের আহার্যের মধ্যে মাংসের চলন না ছিল এমন নহে।'... প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরা নিরামিষ খেতেন বলে চন্দ্রনাথ বসু যে উক্তি করেছেন তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ব্রাহ্মণেরাই তো সমাজের সমগ্র অংশ নয়। অন্যদের কথাও ভাবতে হবে। নিরামিষ আহার আধ্যাত্মিক—চন্দ্রনাথ বসুর এই উক্তির প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ

লেখেন, 'খাদ্যরসের সহিত আত্মার যোগ কোথায়, এবং আহারের অন্তর্গত কোন্ কোন্ উপাদান বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক, বিজ্ঞানে তাহা এ-পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। যদি তৎ সম্বন্ধে কোনো রহস্য শাস্ত্রজ্ঞ প ণ্ডিতদিগের গোচর হইয়া থাকে, তবে অক্ষম গুরু পুরোহিতের প্রতি ভারার্পণ না করিয়া চন্দ্রনাথবাবু নিজে তাহা প্রকাশ করিলে আজিকার এই নব্য পাশবাচারের দিনে বিশেষ উপকারে আসিত।'[১৮]

বহু বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বেশি আলোচনা করেননি সত্য, তবু বিভিন্ন রচনা থেকে তাঁর মনোভাব বুঝে নিতে মোটেই কষ্ট হয় না। বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি, 'বিধবার বিবাহ নাই, কারণ বিধবা কুমারী নয়।'

সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে জাতি ও বর্ণভেদের সমর্থনে। যে ভাবে তিনি এই সমর্থন জানিয়েছেন, তাতে যথেষ্ট আপত্তির কারণ আছে। কুযুক্তিকে যুক্তি বলে চালানর প্রচেষ্টা এই শ্রেণীর রচনাগুলির সর্বত্র লক্ষ করা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এমন কি কঁৎ-পন্থী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষও বর্ণভেদকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের রচনায় যে বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য ও যুক্তির পরিচয় যায়, চন্দ্রনাথ বসুর রচনায় তার অভাব আছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে দেখেছিলেন, Discipline বা নিয়মানুবর্তিতা এবং 'শ্রমের মর্যাদা' ('বর্ণাশ্রমধর্ম', চৈত্র ১৩০৮)। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষও বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে সুষ্ঠু শ্রম বিভাজন নীতি, ধন ও শ্রমের সামঞ্জস্য বিধান লক্ষ্য করেছিলেন। (**'Cast in India', Calcutta Review, 1880, June—Dec.**) বর্ণভেদের সার্থকতা সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসুর যুক্তি হল, এর ফলে লোকের পদমর্যাদা, সম্মান প্রভৃতি ঠিক থাকে। কে পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, কে শ্রেষ্ঠ নয়—তা নির্দিষ্ট থাকায় সকলে ইউরোপের মত একাকার হয়ে যেতে পারে না। প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায়, সব মানুষ সম-শক্তিসম্পন্ন নয়। ভারতবর্ষ বর্ণভেদের দ্বারা মানুষের পর্যায় বেঁধে দিয়ে ঠিক কাজই করেছে। ইংলণ্ডে বর্ণভেদ নেই বলে সেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাল লোক জন্মেছে, কিন্তু 'হিন্দু সমাজে অসংখ্য গুহক-চণ্ডাল দেখা যাইতে পারে, ইউরোপীয় সমাজে বোধ হয় দুই চারিটার বেশী নয়, হয়ত তাও নয়।'[১৯] তাছাড়া, বর্ণভেদ থাকলে প্রত্যেকে নিজ নিজ বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, গণ্ডী বড় হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরো বেড়ে যায়। এই যুক্তিগুলির মধ্যে বিশেষ সারবত্তা আছে বলে মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ

বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, জাতি ও বর্ণভেদ, বৃত্তিবিভাগ প্রভৃতি সম্পর্কে 'স্বদেশ' 'সমাজ' গ্রন্থে যেসব মতামত প্রকাশ করেছেন তাকেও 'প্রগতিশীল' বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তখন অচলায়তন ভাঙতে চাননি। ইংলণ্ডের থেকে আমাদের দেশে বেশি ভাল লোক জন্মেছে বলে চন্দ্রনাথ বসু যে দাবী করেছেন তা-ও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। সবচেয়ে আপত্তিকর হল, তিনি বর্ণভেদ সমর্থন করতে গিয়ে বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন নিয়মের কথা বলেছেন। 'শক্তির প্রকৃতি এবং পরিমাণ বিভিন্ন, পদ ছোট বড, এবং মর্যাদা ইত্যাদি কম বেশী হইলে আরো অনেক বিষয়ে লোক মধ্যে বিভিন্নতা জন্মিয়া থাকে। একই অপরাধে একজন সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এবং উৎকৃষ্ট-ব্যবসায়াসক্ত ব্যক্তিকে যতটুকু এবং যে প্রকারের দণ্ড দেওয়া আবশ্যক, একজন অশিক্ষিত মর্যাদাহীন নিকৃষ্ট ব্যবসায়াসক্ত ব্যক্তিকে তদপেক্ষা অনেক বেশী এবং তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হয়।'[২০] রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'Equality before Law' নীতিটি চমৎকারভাবে ধরতে পেরেছিলেন। 'কালান্তর' প্রবন্ধে তিনি লেখেন, বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্র নীতি সম্বন্ধেও। নতুন শাসনে যে আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি ভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা করুক অপরাধের পংক্তি একই, তার শাসনও সমান—কোনো মুনি-ঋষির অনুশাসন ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিশেষ সৃষ্টি প্রবর্তন করতে পারে না। চন্দ্রনাথ বসুর মতে নিম্ন বর্ণের কোন ব্যক্তি বিদ্যা বুদ্ধিতে পারঙ্গম হলেও তাকে স্ববর্ণে থাকতে হবে— উচ্চবর্ণের কোন সুযোগ-সুবিধে পাবে না। কারণ কর্মফল ও জন্মান্তর। 'বাস্তবিক বর্ণভেদ বলিয়া কিছুই নাই, কেন না সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়, এই জগৎ প্রথমে ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া পরে কর্ম দ্বারা বর্ণভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে।' লক্ষ করবার বিষয় এই যে, "চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং, গুণকর্ম বিভাগশঃ" গীতার এই শ্লোকটি থেকে কথাগুলি তিনি নিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু গুণ ও কর্ম অনুযায়ী বর্ণভেদের কথা উল্লেখ না করে তিনি জোর দিয়েছিলেন জন্মসূত্রে বর্ণভেদের উপর। এ ধরনের মনোভাব সামাজিক প্রগতির পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে সব কিছু পূর্ব জন্মের উপর চাপিয়ে দেওয়া যুক্তি ও বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। হিন্দুধর্মে জন্মান্তর ও কর্মফলবাদ খুব বিতর্কমূলক বিষয়। তাতে ইহলোককে বাদ দিয়ে কাল্পনিক পরলোকের মায়া বিস্তারের সুবিধে হয়। শুধু চন্দ্রনাথ বসু নয়, এযুগের অনেক মনীষী জন্মান্তর ও কর্মফলবাদের নামে বস্তুতঃ

বাস্তব জগৎকেই অস্বীকার করেছেন। কর্মফলবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অদৃষ্টবাদ ও পরলোকবাদে বিশ্বাস চন্দ্রনাথ বাবুর মধ্যে পুরোমাত্রায় ছিল: 'দেখিলাম, অদৃষ্টের জন্ম জ্ঞানে, স্ফূর্তি হৃদয়ে। একা জ্ঞানমূলক বিজ্ঞান কেমন করিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিবে? সেজন্য বলি, অদৃষ্টবাদী ভারত যেন ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দাম্ভিক কথায় মজিয়া তাহার অমূল্যনিধি অদৃষ্ট ছাড়িয়া না দেয়। যাহা মানুষকে না মারিয়া রাখে, তাহাই মানুষের জীবন-যাত্রার সম্বল। দাম্ভিক বিজ্ঞান দুঃখীকে মরিতে বলে, কিন্তু দুঃখী মরিলে সুখীও কি মরে না; যতক্ষণ দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে পাও, ততক্ষণই তোমাদের বাঁচিয়া থাকা সার্থক। ভারত যেন ইউরোপের ঠাট্টার ভয়ে অদৃষ্টবাদ ছাড়ে না। অদৃষ্টবাদ ছাড়িলে যথার্থই ভরেতের দুরদৃষ্ট ঘটিবে, ভারতের শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইবে, মনুষ্যত্ব কমিয়া যাইবে। ভারতের মনুষ্য-সমাজ বিশৃঙ্খল হইবে। ভারত দুঃখ-ভারে অতল জলে ডুবিবে।'[২১] এখানে তিনি প্রত্যক্ষবাদী যুক্তি-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থের 'উৎসর্গ' পত্রে তিনি পরোলোকগত স্বজনদের শুধু স্মরণ করেন নি, তাদের ভৌতিক অস্তিত্বও কামনা করেছেন। কারণ, এই সময় থিওসফির আন্দোলন খুব বেড়ে উঠেছিল। তারই ফলে হয়তো চন্দ্রনাথ বসু পরলোক-তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা হয়েছিলেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

> 'দুলুমা!
>
> ..... তোমার চাতু কাতু বেশ ভাল আছে। আর বাবাজী সর্বদা তাহাদিগকে দেখিতে আসেন। বাবাজী কাতুচাঁদকে কতকি কিনিয়া দিয়াছেন। একবার দেখিতে আসিবে না, মা? যদি আস, দুই একদিন আগে আমাকে জানাইও, মা। বড় রৌদ্রের সময়ে গিয়াছিলে মা। তোমার জন্য সরবৎ প্রস্তুত করিয়া রাখিব। ইতি।
>
> সস্ত্রীক
>
> চন্দ্রনাথ বসু।'[২২]

এই পরলোকবাদ থেকেই আসে অতীন্দ্রিয়বাদ—অলৌকিক চিন্তাধারা। আধুনিক জড় বিজ্ঞান এগুলি সমর্থন করে না বলে তিনি বিজ্ঞানকেও অনেকটা অসম্পূর্ণ বলে কটাক্ষ করেছেন। 'জড়ের ক্রিয়া অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করা যায়, চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া বড় গূঢ়ভাবে হইয়া থাকে—তাহা সামান্য

বুদ্ধির অগোচর, বিশুদ্ধ চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যতীত তাহার দর্শন লাভ হয় না। তেমন চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক শক্তি অল্প লোকেরই আছে। পুরাণকার-দিগের সে চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল। জগতে মহাচৈতন্যের যে গূঢ় গভীর ক্রিয়া চলিতেছে তাহা দেখিবার শক্তি অল্পাধিক পরিমাণে তাহাদের ছিল। তাই তাঁহাদের পুরাণ এত অলৌকিক কথায় পরিপূর্ণ...... আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়াব ফলে যাহা ঘটে তাহা জড বিজ্ঞানেব মতে বিশ্বাসের অযোগ্য হইতে পারে, লোক সাধারণেব বুদ্ধিব অতীত মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহাও এতাবলম্বীব অনশনে ক্লিষ্ট হইবার পবিবর্তে বদ্ধিত শক্তিলাভ করিবাব ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং জগতেব সর্বোচ্চ বিজ্ঞান-সম্মত। যাহা সামান্য বুদ্ধিব বা স্থূলদৃষ্টিব বহির্ভূত তাহাকে অলৌকিক বলে। জড বিজ্ঞান জডের অতি সামান্য অংশ, উপবিভাগ মাত্র দেখিতে পায়, জড বিজ্ঞানের দৃষ্টি অতি সঙ্কীর্ণ। জড বিজ্ঞান যাহা দেখিতে পায় না, তাহা অলীক এমন কথা শুনিতে নাই, এমন কথা শুনা মনুষ্যোচিত নয়, এমন কথা শুনিলে মনুষ্যেব মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়।'[২৩]

সাহিত্য-বিচাবেব ক্ষেত্রেও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলেব অর্থ' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যগুণকে বাদ দিয়ে যেভাবে 'হিন্দু' ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে 'হিন্দুয়ানী'ব পবিচয়টি বেশি পবিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

উপবিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, চন্দ্রনাথের চিন্তাধাবায় কিছু কিছু গোঁড়ামি ছিল। কিন্তু তাঁকে পুবোপুবি উগ্রপন্থীও বলা যায় না। তাঁর 'গার্হস্থ্য পাঠ' এবং 'সংযম-শিক্ষায়' বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব থাকলেও, বক্তব্য বিষয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র। ভূদেবচন্দ্র তাঁব 'পারিবারিক প্রবন্ধে' বাল্য বিবাহ, দাম্পত্য প্রণয়, উদ্বাহ সংস্কার, চাকব প্রতিপালন, পরিচ্ছন্নতা, কুটুম্বতা, অতিথিসেবা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে ভারতীয় গার্হস্থ্যজীবনকে আদর্শস্থানীয় বলে প্রমাণিত কবতে চেষ্টা কবেছেন। 'পারিবারিক প্রবন্ধে'ব সূচনায় তিনি লিখেছেন, 'আমাদের পারিবাবিক সুখ অধিক—এটী নিতান্ত অল্প কথা নয়। যদি পারিবারিক সুখ অধিক, তবে ধর্মও অধিক ; এবং ধর্ম অধিক থাকিলে কখন না কখন অবশ্যই মহিমশালিতাও জন্মিতে পারে।' আধুনিক ইউবোপীয় গার্হস্থধর্মকে নিন্দা করে তিনি আমাদেব সনাতন নিয়মের জয়গান গেয়েছেন। এজন্য 'পারিবারিক প্রবন্ধে'র প্রথমেই 'মনুসংহিতা' থেকে—

'যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ
তেন যায়াত্‌ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্‌ ন রিষ্যতে।'

এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজের সবকিছু সুন্দব মনে করেন নি, কিছু কিছু আবর্জনা আছে বলেও মনে করেছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়েব মতো তিনিও প্রাচীন ভারতীয় গার্হস্থাশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা কবেছিলেন। আমাদেব সমাজেব অসুন্দর দিকটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'কিন্তু ভাল হওয়ার মতন ধাত গৃহ প্রণালী ভাল না হইলে হয় না, কেননা মানুষেব ভাল ধাত বল মন্দ ধাত বল সব ধাতই গৃহে প্রসূত হয় এবং তাহা গৃহ প্রণালীব ফল। অতএব আমাদেব চরিত্র অবস্থা ও জীবন-প্রণালী ভাল কবিতে হইলে সর্বাগ্রে আমাদের গৃহপ্রণালীব দোষ সংশোধন কবিয়া তাহাকে নির্দোষ কবিতে হইবে। তাই এই গার্হস্থ্য পাঠ লিখিলাম। ইহাতে আমাদেব গার্হস্থ্য বীতির কতকগুলি দোষ বুঝাইবাব চেষ্টা কবিয়াছি। এবং সেই দোষগুলি কেমন করিয়া সংশোধন করা যায় তাহাও যথাসাধ্য নির্দেশ কবিয়াছি।'[২৪] হিন্দুধর্মেব ধ্বজাবাহী হয়েও তিনি উগ্র-পন্থীদের মত হিন্দুধর্মকে সংস্কাবের অতীত মনে কবেন নি। এ-বিষয়ে তাঁব মত খুবই উল্লেখযোগ্য। 'এখন অনেকে পুণ্যেব সহিত চবিত্রেব বা মানসিক প্রকৃতির উন্নতিব সংশ্রব বা সম্পর্ক বুঝেন না ও দেখেন না। চবিত্র ভাল হউক আর নাই হউক, মনে পাপ থাকুক আব নাই থাকুক, গঙ্গাস্নান কবিলেই পুণ্য হয়, তীর্থদর্শন কবিলেই পুণ্য হয়, উপবাস ব্রত কবিলেই পুণ্য হয়—অনেকেবই এইরূপ সংস্কাব। কিন্তু ইহাব অপেক্ষা ভ্রান্ত ও অনিষ্টকব সংস্কাব আব হইতে পাবে না। এই বিষয় অনিষ্টকর সংস্কাবেব বশবর্তী হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করি বলিয়া আমাদেব মধ্যে প্রকৃত পুণ্যের এত অভাব এবং ধর্মচর্যা দ্বারা চবিত্রেব উৎকর্ষ লাভ এত কম ....পুণ্য সম্বন্ধে যেমন পাপ সম্বন্ধেও আমরা তেমনি ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্তী হইয়াছি। আমরা মনে করি যে যদি আমবা কেবল অখাদ্য ভক্ষণ না কবি, ঠাকুব দেবতাকে প্রণাম কবি, সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণ ভোজন কবাই, তাহা হইলে দুষ্কর্ম দ্বারা আমাদের চিত্ত কলুষিত ও বিকারগ্রস্ত হইলেও আমাদের পাপাচবণ হয় না। আমরা ইহাও মনে করি যে পাপ করিয়া দুই কাহণ কড়ি উৎসর্গ করিলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। এই দুই সংস্কারই যার পর নাই ভ্রান্ত ও অহিতকর।.....

অতএব এই সকল বিষয় অনিষ্টকর কুসংস্কার নাশ করা বর্তমান কালে আমাদের সংস্কার কার্যের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।'[২৫]

মধ্যযুগের ইউরোপের সংস্কারপন্থী ক্যাথলিকদেব সঙ্গে এ-বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রটেষ্টাণ্টদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্যাথলিক সমাজও আংশিক সংস্কারের পক্ষপাতী হয়েছিলেন। এটাই ইউরোপেব ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুত্থান বা প্রতি-সংস্কারবাদ (Counter-reformation) আন্দোলন নামে খ্যাত। 'To the Casual observer living in Europe about the middle of the Sixteenth Century, it must have seemed as though Roman Catholicism would eventually succumb to Protestantism, for it still remained on the defensive and showed few signs of spiritual vigour. However, by that time, powerful forces were already taking shape within the venerable institution which, when directed by a reformed and consecrated papacy, not only regained much that had been lost to protestantism, but made conquest among non-christians and once more became a positive force in western Civilization.'[২৬]

এই আংশিক উদাব মনোভাবেব জন্য চন্দ্রনাথ বসু অন্য সমাজেব লোকদেব সঙ্গেও মেলামেশা করতে পাবতেন। পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম ব্রাহ্মিকা প্রসন্নতাবা গুপ্তেব 'পাবিবাবিক জীবন' নামক গ্রন্থেব ভূমিকা লেখা এজন্যই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)

'নবজীবন-সম্পাদক, রাধাকৃষ্ণ-উপাসক,
খেলে সেই সুচতুর খেলা,
হিন্দু-ধর্ম-উত্থাপক, বিষ্ণুধর্ম-প্রচারক,
কর্ণিক-ম্যাকিয়াভেলি চেলা।'

বঙ্কিম-সুহৃদ্ গঙ্গাচরণ সরকারের পুত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান' আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) তাঁর ইংরেজি আত্মজীবনী 'Memoris Of My Life And Times'—গ্রন্থে অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে ব্রাহ্ম ও হিন্দু প্রগতিশীলতার প্রধান বিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন।[১] এ উক্তি পুরোপুরি সত্য কিনা এ-সম্পর্কে অনেকে ভিন্নমতাবলম্বী। কারণ, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ অক্ষয়চন্দ্র-সম্পাদিত 'নবজীবন' (১৮৮৪) পত্রিকার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। এ পত্রিকায় (১৮৮৫) শশধর তর্কচূড়ামণির 'ধর্ম ও ধর্মের অনুষ্ঠাতা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর কাটছাঁটের অভিযোগে নব্য ও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে বিরোধের বীজ দানা বেঁধেছিল। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রকে প্রগতিশীল হিন্দু দলভুক্ত করা যায় না। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি প্রচেষ্টা এবং বিধবা বিবাহের বিরোধী ছিলেন, বাল্য বিবাহ প্রথা সমর্থন করতেন। এদিক থেকে তিনি শশধর তর্কচূড়ামণি ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর মত গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন।

'নবজীবনে'র 'অনুষ্ঠান পত্রে' (১৮৮৪) প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের সহযোগিতায় হিন্দুধর্ম পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার সঙ্কল্প লক্ষ্য করা যায়। সেজন্য এর লেখকসূচীতে বঙ্কিমচন্দ্র ও শশধর তর্কচূড়ামণির নাম একই সঙ্গে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু উভয় গোষ্ঠীর এ মিলন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। 'প্রচার' (১৮৮৪)-এর প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'প্রচার'-এ ঋগ্বেদের দেবতত্ত্বের সমালোচনায় তিনি হিন্দুধর্মের গোড়াপত্তনের ইতিহাস বিবৃত করেছিলেন। এই প্রবন্ধ দু'টির উদার দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর মনঃপূত হয়নি; ফলে তাঁরা নব্য সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন। 'নবজীবন' (১৮৮৫)-এ শশধব তর্কচূড়ামণি 'ধর্ম ও ধর্মের অনুষ্ঠাতা' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রাচীন দল 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সেই প্রবন্ধটি কাটছাঁটের অভিযোগ আনেন। এই সময়ে (নবজীবনেব ২য় খণ্ডে) বমেশচন্দ্র দত্ত 'ঋগ্বেদেব দেবগণ' নামক প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশ কবে ঋগ্বেদ অনুবাদের আভাস দেন। তিনি পৃথকভাবে মূলসহ ঋগ্বেদেব অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশেও অগ্রসর হন। এ ব্যাপারে প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলী চঞ্চল হন। বেদের অবমাননা ও সর্বনাশ হল বলে তর্কচূডামণি মহাশয় 'বঙ্গবাসী'র স্তম্ভপূরণ কবতে লাগলেন ('প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় কর্তৃক হিন্দুধর্মেব সংস্কার'—চন্দ্রমোহন সেন, নবজীবন, ১২৯১)। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তর্কচূড়ামণিব বিবোধিতা কবেন। 'নবজীবন'-এব বিরুদ্ধে প্রাচীন পন্থীদের আবো কয়েকটি অভিযোগ হলো: 'নবজীবন' ধর্মের সংস্কাব কবতে চায়—প্রাচীন পন্থীরা সংবক্ষণের পক্ষপাতী। নবজীবন নাকি বলে, 'বৃটিশ ফবমাকোপিয়া ভিন্ন কোথাও আত্মার পীডার ঔষধ নাই।' তাছাড়া, 'নবজীবন সর্বজনীন উদারতা চাহেন। নবজীবন আরও বলেন, অন্য কোন ধর্ম বা অন্য কোন সম্প্রদায়েব নিন্দা করা অনুচিত।'

প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায়ের এই বিবাদ বেশ কিছুদূব গড়িয়েছিল। 'নবজীবন' ও 'প্রচাব'-এব ধর্ম সংস্কারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীব মুখপত্র 'বেদব্যাস' (১৮৮৬) পত্রিকাব উদ্ভব হয়। শশধর তর্কচূড়ামণির উৎসাহে এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তর্কচূডামণি মহাশয় এসময়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, 'প্রচাব' ও 'নবজীবন'-এর 'অহিন্দু মতামতের' প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই।[২] 'বেদব্যাস'-এব সঙ্গে 'বঙ্গবাসী'ও প্রাচীন পন্থাকে আশ্রয় করল। আসল কথা, উভয় গোষ্ঠীব মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবধান দেখা দিয়েছিল। শশধর তর্কচূড়ামণির 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যা নবীন সম্প্রদায়েব বিশেষ মনঃপূত হচ্ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আচার ধর্ম নহে ···হিন্দু ধর্ম মানি. হিন্দুধর্মের বখামি মানিনা' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে এ-মনোভাবের পবিচয় পাওয়া যায়। 'নবজীবন'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে নব্যপন্থীদের যোগাযোগ ছিল—এ ধারণা সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কই হয়তো সহায়তা করেছিল।

অক্ষয়চন্দ্র বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট এবং তিনি তাঁর বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। ১৮৭২ খৃঃ 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে এর প্রথম সংখ্যায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'উদ্দীপনা' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বহরমপুরে উভয়ের প্রথম পরিচয় হয়, সেই পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। অক্ষয়চন্দ্র সবকারের 'সাধারণী' (১৮৭৩) কাঁটালপাড়ার বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় থেকে মুদ্রিত হতো। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্গদর্শনে নিয়মিত ভাবে 'প্রাপ্ত গ্রন্থেব সমালোচনা' লিখতেন বলে জানা যায়। 'গ্রাবু', 'দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনেই প্রকাশিত হয়েছিল। 'কমলাকান্তেব দপ্তর'-এর ষষ্ঠ সংখ্যায় অক্ষয়চন্দ্র-লিখিত 'চন্দ্রালোকে' এবং চতুর্দশ সংখ্যায় 'মশক' প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে 'চন্দ্রালোকে' প্রবন্ধটিকে 'কমলাকান্তেব দপ্তব'-এর অন্তর্ভুক্ত কবেছিলেন।

কয়েকটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মত-পার্থক্য লক্ষণীয়। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে নব্য বৈষ্ণব ভাবুকতাও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবীয় প্রেম ও ভক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাংলার বৈষ্ণবধর্মের অতিবিক্ত ভাবাবেগেব সমালোচক। অক্ষয়চন্দ্র নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। 'নবজীবন'-এ প্রকাশিত (১ম ভাগ, ১৮৮৪) 'ধর্ম জিজ্ঞাসায়' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'অন্যের কথা দূবে থাকুক, শাক্য সিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য—তাঁহাবাও ধর্মেব সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এমত স্বীকার করিতে পারি না।' অক্ষয়চন্দ্র বোধকরি এর প্রত্যুত্তরে 'নবজীবন'-এ 'বাঙ্গালীব বৈষ্ণবধর্ম' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালীব বৈষ্ণবধর্ম বডই বিডম্বনার বিষয়। বিশেষ এই চসমা-চক্ষু, চপল-চিত্ত, চটুল বৃত্ত যুবকদলেব বাজত্বকালে, এই কোপ্তা, কোর্মা, করি, কটলেট প্রভৃতি ককাবাদি ব্যঞ্জনের দিনে, যে ধর্মে মাংসাহার নিষেধ করে, বিলাতী ব্যাণ্ডের বেণুবীণা বাদনের বদলে, যে ধর্মের উপাসকেরা খোল করতালে বিষম খচমচ করিয়া তুলে, কণ্ঠে ত্রিভাঁজ কলরের স্থানে যে ধর্মযাজকেরা তুলসীর ত্রিকণ্ঠী ধারণ করে,—সে ধর্ম যে এখনকার দিনে বিষম বিড়ম্বনা, তাহাও কি আর বুঝাইতে হইবে?'

আচার সম্পর্কীয় প্রশ্নেও বঙ্কিমচন্দ্রেব সঙ্গে অক্ষরচন্দ্রের কিছুটা মতানৈক্য ছিল দেখা যায়। 'প্রচারে'র প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম' নামক একটি প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আচার ধর্ম, না ধর্মই ধর্ম?', তিনি তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। একজন

জমিদার-ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ হিন্দু। তিনি প্রত্যেকদিন ঘুম থেকে উঠেই স্নান করেন এবং বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত পূজা, আহ্নিকে কাটান। তাছাড়া তিনি নিরামিষভোজী ; কিন্তু জাল-জুয়াচুরিতে মহা ওস্তাদ, এমনকি জাল করার সময়ও হরিনাম করতে থাকেন—মনে করেন, সে সময়ে হরির নাম স্মরণ করলে জাল করা সার্থক হবে। আর একজন হিন্দুর কাছে অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নেই। ব্রাহ্মণ হয়েও তাঁর সুরাপান করতে বাধে না। যে কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন। সন্ধ্যা, আহ্নিক, ক্রিয়া-কর্ম তিনি কিছুই করেন না। কিন্তু তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। যদি কখনো মিথ্যা কথা বলতে হয়, তবে লোকের মঙ্গল এবং পরহিতের জন্যই তা বলেন। তিনি ইন্দ্রিয় সংযমী, অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন, কাকেও ঠকান না, পরের ধন-সম্পদে লোভও তাঁর নেই। হিন্দুধর্মের নিয়মানুযায়ী গুরুজনকে ভক্তি, স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ, পশুর প্রতি দয়া করেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছিলেন, এ দু'জনের মধ্যে যথার্থ হিন্দু কে ? তিনি নিজেই এর জবাবে বলেছিলেন, আচার ধর্ম না হয়ে যদি ধর্মই ধর্ম হয়, তবে আচারভ্রষ্ট ধার্মিক ব্যক্তিকেই প্রকৃত হিন্দু বলা উচিত। প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখযোগ্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় 'একটি পুরাতন কথা' (অগ্রহায়ণ ১২৯১) ও 'কৈফিয়ৎ' (পৌষ ১২৯১) নামে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল, 'কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না।' 'কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'নবজীবনে' 'ভাই হাততালি' (নবজীবন মাঘ সংখ্যা, ১৮৮৪) শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে ব্যাজস্তুতি করে লিখেছিলেন, 'সেই অমল, কোমল, কমল-শোভা সমন্বিত মুখশ্রী,—সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ ভাসাভাসা, ভ্রমর-বর-স্পন্দিত-পদ্মপলাশ-লোচন—সেই রহস্যে আনন্দ মাখান হাসিখুসী-ভরা অধরপ্রান্ত—সেই সৎ চিন্তার প্রসর ক্ষেত্র, সুন্দর শুদ্ধ, পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট—ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নয়।' 'নবজীবনে' (১ম ভাগ ১৮৮৪) রবীন্দ্রনাথের 'রাজপথের কথা' রচনাটি বেরিয়েছিল। অক্ষয়চন্দ্রের এই প্রবন্ধের পর নবজীবনে রবীন্দ্রনাথ এর পর আর কোনো রচনা প্রকাশ করেন নি।

অক্ষয়চন্দ্র কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে এক্ষেত্রে সমর্থন করেন নি। তিনি আচারনিষ্ঠ জমিদারের কার্যকলাপকে যেমন সমর্থন করেন নি, তেমনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও 'ধার্মিক' বলে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর বক্তব্য : 'যাহা কেবল শরীরের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর, কেবল তাহাই কি আমাদের ত্যাজ্য ? আর যাহা আত্মার

অকল্যাণকব, তাহা ত্যাজ্য নহে? যাহা কেবল ইহকালে অকল্যাণকর, তাহাই ত্যাজ্য, আর যাহা পরকালে অকল্যাণকব তাহা ত্যাজ্য নহে? ইহা কিরূপ বুদ্ধি বুঝা যায় না; তবে হিন্দু বুদ্ধি নহে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহার পর আবার বলি—ব্রহ্মচর্য যমের অন্তর্গত। সকল শ্রেণীর পক্ষেই, সকল সময়েই অবশ্য পালনীয়।…আর সেই ব্রহ্মচর্য সনাতন ধর্মবাদী মাত্রেরই অবশ্য পালনীয় নিত্যকার্য। তা যে সর্বভুক্, সুরাপাবী—সে আর ভোগে বিরত কি প্রকারে? সুতরাং বাবুও যমী নহেন। ইহাকেও লোকে অশ্রদ্ধা কবে, তবে পতিত বলিয়া পবিত্যাগ কবিবাব ক্ষমতা, এস্থলেও সমাজেব নাই। সুতরাং ঐ জমিদাব শ্রেণীব আর এই বাবু শ্রেণীব সমান 'বোল বোলাও' চলিয়াছে। ইহা নিতান্ত ক্ষোভেব বিষয়।'[৩] শুধু তা নয়, অক্ষয়চন্দ্র মনে কবতেন, আচার মেনে চললে মানুষেব জীবনীশক্তি ও আয়ু বাডে। পিতাব মৃত্যুব পর একবার ভাটপাডায় গিয়ে ৭০, ৮০, ৯০ বছবেব আচারনিষ্ঠ দীর্ঘজীবী, সুস্থ ভট্টাচার্যদের দেখে অক্ষয়চন্দ্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁব মতে, কদাচাব ও অনাচাবের মধ্যে থাকলে এবকম হবাব সম্ভাবনা নেই। তিনি ইংবেজি নবিশদেরও এই দলভুক্ত কবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ বাদ যায় নি। 'অপরদিকে কদাচারের, অনাচাবেব ফল, আমরা হাতে হাতে দেখিতেছি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, সরলপ্রাণ বামতনু লাহিডী, খৃষ্টান প্রবব কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জন কয়েক ব্যক্তি ছাডা, ইংবাজিওয়ালা প্রায় সকলেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া আমাদিগকে শোকসাগরে মগ্ন কবিয়াছেন। হিন্দু-হিতৈষী হবিশ্চন্দ্র, বিখ্যাত ব্যবহাবজীবী দ্বারকানাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব,—কত নাম কবিব? এই সকল শোককব অকাল মৃত্যুব নানা কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু ইংবাজিওয়ালার অনাচার, কদাচাব কি অন্যতম কাবণ নহে?'[৪]

ভারতের 'সনাতন ধর্মে'ব প্রশস্তি বর্ণনায়, ভারতের জাতীয়-চরিত্রের প্রশংসা কীর্তনে এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য প্রচাবে তিনি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব থেকে কম রক্ষণশীল ছিলেন না। অক্ষয়চন্দ্র ববাবর ধর্ম-সংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন। 'নবজীবন'-এ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশধব-শিষ্য হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রভৃতির লেখাও ছাপা হতো। হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'সংসার আশ্রম' উপন্যাস 'নবজীবন' ৪র্থ ভাগে (১৮৮৭) প্রকাশিত হয়েছিল। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সঙ্গেও অক্ষয়চন্দ্রের যোগাযোগ ছিল।

হিন্দুদের জাতীয়-চরিত্রের প্রশংসা করে 'নবজীবন'-এর ৫ম ভাগে (১৮৮৮) অক্ষয়চন্দ্র লিখেছিলেন, 'ধর্ম সম্বন্ধীয় এত সারগর্ভ, এত জ্ঞানগর্ভ, এত উপদেশ-পূর্ণ, চিন্তাশক্তির উচ্চ অঙ্গের পরিচায়ক ধর্মগ্রন্থ হিন্দু জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, অন্য কোন জাতিব মধ্যে তত নাই। যে বিষয়ের চর্চা অধিক থাকে, সেই বিষয়েরই অধিক গ্রন্থ অবশ্যই সভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বাহুল্য দ্বাবা বেশ জানা যাইতেছে যে, অন্য জাতির আদিম অবস্থা হইতেই ভাবতে ধর্মভাব অতাব প্রবল ছিল, এবং সেই ধর্মই আর্য জাতিকে পবিত্র স্বভাব, নৈতিক বলশালী, ব্রত শৃঙ্খলে আবদ্ধ, জন্মভূমির প্রতি অনুবাগী, এবং জগতেব মঙ্গল সাধনে তৎপব কবিয়া বাখিয়াছিল, ইহা কে অস্বীকাব কবিবে?' 'সনাতনী' গ্রন্থে তিনি ভাবতেব শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কবেছেন। উক্ত গ্রন্থে 'ধর্মেব যাজনা সাধ্যমত কর্তব্য' প্রবন্ধে মনিয়েব উইলিয়ামস্-এব "Hinduism" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অক্ষয়চন্দ্র দেখাবার চেষ্টা কবেছেন যে, জীবনেব সব কিছুকে নিয়েই হিন্দুব ধর্ম। শাবীবিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক—এই তিন রকমেব কাজেই হিন্দুব ধর্ম নিহিত আছে। 'কোন বিষয়েই হিন্দুব ধর্ম হিন্দুকে যথেচ্ছাচাবে প্রশ্রয় দেয় না।' এমনকি ভারতের আপাত-বৈষম্যের মধ্যেও সাম্যেব ভাব আছে। তিনি বলেন, 'ভাবতবর্ষ কর্মভূমি—অন্যান্য দেশ ভোগ ভূমি।' ঐ প্রবন্ধে তিনি আরো বলেন, সত্য অহিংসাদি নিত্যধর্ম অনুসবণেব ফলে ভাবত একদিন জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দখল কবেছিল, আজ সেই অনুষ্ঠানগুলি পুনরুজ্জীবিত করলে ভারতের সমূহ উন্নতি হবে। তিনি ভাবতবাসীকে আহ্বান করে বলেছিলেন, 'দেখাইতে হইবে, আমাদের দয়া আছে, মায়া আছে, মমতা আছে, স্নেহ আছে, ভালবাসা আছে, ভক্তি আছে—এ সকল নবকে থাকিতে পাবে না, দেখাইতে হইবে জগতের সকল জাতি অপেক্ষা আমরা জীবে দয়া অধিক করিয়া থাকি, অধিকাংশ লোক আমিষত্যাগী, সকল জাতি অপেক্ষা কলহ-বিদ্রোহ, রক্তারক্তি কম করিয়া থাকি,—আমরা সকলেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' তিনি দাবি করেন, ইউরোপের মতো আমাদের দেশেও 'Liberty', 'Individuality' ছিল। তবে ইউবোপীয় 'Individuality' থেকে 'ভাবতের স্বচ্ছন্দাচারের প্রভেদ এই যে, য়ুরোপীয় স্বেচ্ছাচার স্ব-প্রধান, সনাতন ধর্মের স্বচ্ছন্দাচার শাস্ত্রাচার ও সদাচারের মুখাপেক্ষা করে।' এই স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে এসেছে শ্রেষ্ঠত্ব বোধ। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাই তিনি মন্তব্য করেছেন, 'হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত

শক্তি অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই আর্যনামের এখনও এত সম্মান রহিয়াছে। ব্যক্তি বিশেষই হউক, আর জাতি বিশেষই হউক, শক্তিই তাহাদের মহত্ব—তাহাদের উৎকর্ষ বা পরিমাণ করিবার উপায়। যে পরিমাণে শক্তির বিকাশ হয় অথবা যে পরিমাণে তাহার ফল উৎপন্ন হয়, তদনুসাবে সে শক্তির পরিমাণ বা তাহার গুরুত্ব নির্ধারণ করিতে পাবা যায়। তবে যখন কোন শক্তি অন্য কোন শক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়, তখন বিরুদ্ধ শক্তি যে পরিমাণে হীনবীর্য হয়, তাহা দ্বারাই সেই শক্তির প্রকৃত ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এইরূপে ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের শক্তির পরিমাণ করিয়াই তাহাদেব মহত্ব—তাহাদের উপযোগিতা নির্ণয় কবা যুক্তিসঙ্গত। আর্য জাতিব শক্তি অসীম ছিল, তাহার পূর্ণ বিকাশও হইয়াছিল। তাঁহাবাই প্রথম বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, জ্যোতিষ, গণিত রসায়ণ, চিকিৎসা, বাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে সমগ্র মানবজাতির আদিগুরু এবং এসিয়ার এক সীমা হইতে ইউবোপেব সীমান্ত পর্যন্ত সকল জাতিবই শিক্ষক ছিলেন। প্রাচীন বোম বা গ্রীস অধিক শক্তিব বিকাশ করিতে পারে নাই। এই কারণেই হিন্দু জাতির সমতুল্য মহৎ বা উন্নত জাতি আর নাই।'[৫] অক্ষয়চন্দ্র 'নবজীবনে' (৩য় ভাগ) 'তোমবা যদি আর্য হও, আমবা অনার্য' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি ইউরোপীয়দেব তুলনায় ভাবতবাসীব শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি সেখানে বলেন, খাদ্য, বিবাহ, উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুদের চিন্তাধাবা অন্যান্যদের তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট।[৬] তারপব তিনি বলেন, হিন্দু বিবাহ 'যোটনা' নয়! 'যোটনা-দ্বাবা সংস্কাবই বিবাহেব উদ্দেশ্য।' জাতিবিচাব, বয়স-বিচাব, শরীর-বিচাব, সম্পর্ক-বিচাব, নাম ও কাল-বিচার, স্থান ও ক্রিয়া-বিচার প্রত্যেকটি বিষয় উদ্দেশ্যমূলক। বিবাহ হিন্দুদের কাছে সংস্কাব, ইউবোপীয়দের 'কারবার' বিশেষ।[৭]

তাঁর মতে হিন্দুরা এ বিষয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। কোন জাতি নিজেদের পুনরুজ্জীবনের জন্য যদি প্রাচীন মহত্বকে জাগাবার চেষ্টা করে, তবে তা নিন্দনীয় হতে পাবে না। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত্ববোধের অভিমান যদি যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, তবে তা কিছুতেই সমর্থনীয় হতে পারে না! অক্ষয়চন্দ্রের মধ্যেও এই মনোভাবের পরিচয় কিছুটা ফুটে উঠেছে বলে কারো কারো ধারণা হতে পারে।

'হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থা', 'নারী ধর্ম প্রভৃতি আলোচনায় তিনি মনুর নিয়মকে

অভ্রান্ত মনে করে বর্তমান যুগের দাবিকে ও বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করেছেন। তাই তিনি 'মনুসংহিতা' থেকে নারী ধর্মের আদর্শ খুঁজেছিলেন। তিনি মনে করতেন, স্ত্রী-জাতিকে কখনও স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দেওয়া উচিত নয়। তারা 'কৌমরাবস্থায় পিতা কর্তৃক, যৌবনে ভর্তা কর্তৃক এবং স্থবিবাবস্থায় পুত্র কর্তৃক রক্ষণীয়া; ইহারা কদাপি স্বাধীনাবস্থায় অবস্থানেব যোগ্য নহে।' এমনকি সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতাব' প্রবন্ধে রুশোব Remarks On Female Education' থেকে মন্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি প্রমাণ করাব চেষ্টা কবেছেন যে, এসব মনীষীরাও নারী-স্বাতন্ত্র্য সমর্থন করেন নি।[৮] রুশোব মন্তব্যটি হলো: 'The whole education of women ought to be relative to men. Women is specially made to please men, to be useful to them, to rear them when young, to console them, to render their lives agreeable and sweet to them; these are the duties of women at all times, and should be taught to them from their childhood .....All her reflections should centre in the study of man, or in agreeable acquirements which have taste as their object. Search after abstract truth is not suitable for her. Works of genius are beyond her. In short, feminine studies should relate exclusively practical matters......' অক্ষয়চন্দ্র এই মন্তব্যে উল্লসিত হয়ে নাবী-স্বাতন্ত্র্যকে ভয়াবহ ব্যাপাব বলে আখ্যা দিয়েছেন। ব্রাহ্মসমাজ ('নববিধান' ও 'সাধাবণ') যে নারী-মুক্তি আন্দোলন প্রচলন করেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র তাব বিরোধিতা কবতে চেয়েছিলেন। এসব প্রবন্ধের সেই হল মূল উদ্দেশ্য। বস্তুত 'মডেল ভগিনী'ব লেখকেব উদ্দেশ্যের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের মত-পার্থক্য নেই।

'হিন্দু বিবাহেব ব্যবস্থা' সম্বন্ধেও তিনি বক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির পবিচয় দিয়েছেন। 'মনুসংহিতা'ব বিভিন্ন শ্লোক তুলে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহদান অবশ্য কর্তব্য। দশ, এগারো বছরের বেশি মেয়েদের অবিবাহিতা রাখা উচিত নয়। অবশ্য পুরুষের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই বিবাহ করার তিনি পক্ষপাতী। তাঁর যুক্তি: বর্ণাশ্রমের খুঁটিনাটি নিয়ম পালন করতে গেলে পুরুষেব বয়স বেশি হওয়া স্বাভাবিক। সেই নিয়মগুলি পালন না করে এবং প্রতিষ্ঠালাভের পূর্বে পুরুষের বিবাহ অনুচিত।

এই হিসেবে দেখা যায়, ৩০।৩২ বছরের পুরুষ ১১।১২ বছরের মেয়েকে বিবাহ করতে পারে। এটা খুবই আপত্তিকর বিষয়, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বয়সের এই পার্থক্য নানা দিক থেকে ক্ষতিকর। অক্ষয়চন্দ্র অবশ্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, এ-রকম বিবাহে শারীরিক মিলন অবৈধ। তিনি এজন্য গুরুজনদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন। সরকার-প্রস্তাবিত 'সহবাস-সম্মতি আইনের' বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। 'বঙ্গবাসী'তে তথাকথিত রাজদ্রোহ সূচক যে প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, সেটি তাঁরই লেখা। এই প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, প্রকাশক ও মুদ্রাকরের হাজতবাস হয়। যে পাঁচটি প্রবন্ধের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তার মধ্যে দুটি অক্ষয়চন্দ্রের এবং একটি নাকি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে, অক্ষয়চন্দ্রের 'হিন্দুবিবাহ' বিষয়ক মতবাদের সঙ্গে চন্দ্রনাথ বসুর 'হিন্দু বিবাহ' (১৮৮৭) শীর্ষক প্রবন্ধের অনেকটা মিল আছে। অক্ষয়চন্দ্র 'সহবাস সম্মতি বিধি'র প্রতিবাদ করলেও বঙ্কিমচন্দ্র এ-বিষয়ে মধ্যপন্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে 'আইন হইবার প্রয়োজন নাই, হইলেও ক্ষতি ক্ষতি নাই।' রবীন্দ্রনাথ বাল্য বিবাহকে বাঙ্গালীর শারীরিক অপটুতার জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করে 'সম্মতি বিধির' প্রয়োজনীয়তা অনেকটা স্বীকার করে নিয়েছেন। 'বিধবা বিবাহ'-এর ব্যাপারেও অক্ষয়চন্দ্র অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ছিলেন। এই প্রথার ঔচিত্য অনৌচিত্যের কথা বাদ দিলেও দেখা যায়, অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিকেও কিছুটা প্রভাবিত করেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রধান সমর্থক ছিলেন বলে অক্ষয়চন্দ্র তাঁর অনুগামী ছিলেন না। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ পেয়েছে একটি বক্তৃতায়। ১৮৮৪ খৃঃ কলকাতায় সাবিত্রী লাইব্রেরীতে তিনি সেই বক্তৃতা দেন। এর নাম হলো ঃ 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না ?' 'নবজীবন' ১ম খণ্ডে বক্তৃতাটি ছাপা হয়েছিল। চন্দ্রনাথ বসুর 'বিধবা বিবাহ' বিষয়ক মহামতের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। তাঁর প্রধান বক্তব্য তিনটি—১। 'হিন্দুর বিবাহ অধ্যাত্মিক ব্যাপার -- শরীরের যোগ নহে, আত্মার যোগ। ২। আত্মা চিরজীবী, আত্মায় আত্মায় যোগ অনন্তকাল স্থায়ী। ৩। অতএব আত্মার যোগের বিয়োগ নাই। বিধবা বিবাহার্থিণী না হইয়া ব্রহ্মচারিণী হইবেন, ইহাই শাস্ত্র, নীতি ও যুক্তিসঙ্গত।' তিনি আরো বলেন, হিন্দুর বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য—পাশ্চাত্ত্যের মত তা 'Contract' বা চুক্তি

নয়। তবে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, অক্ষয়চন্দ্র শুধু বিধবাদের চরম ত্যাগ স্বীকারের কথা বলেছিলেন, কিন্তু বিপত্নীক পুরুষদের পুনর্বিবাহের প্রশ্নে হিন্দু সমাজের সাম্যবাদ বিরোধী মনোভাবের কথা উল্লেখ করে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন। তিনি নারীকে পুরুষের সমানাধিকার দিতে রাজি নন। তাঁর উক্তি: 'হিন্দু সাম্যবাদ মানেন না, হিন্দু মানেন অনুপাতবাদ। ক খ যখন সমান নহে, তখন তাহারা সমান অধিকার পাইবেও না; ক যেমন, তেমনই ক পাইবে; খ যেমন তেমনই খ পাইবে।' পরিষ্কার বোঝা গেল, পুরুষকে তিনি অনেক বড়ো বলে মনে করতেন। তাই নারীদেরই কেবল ত্যাগের কথা শুনিয়েছেন তিনি। এই অনুদার মনোভাবের ফলে সেযুগে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে সাবিত্রী লাইব্রেরীর যে-সভায় অক্ষয়চন্দ্র এই প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেখানে বিপিনচন্দ্র পাল উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন তরুণ যুবক। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম দুর্গামোহন দাসের ছেলেদের শিক্ষকতার কাজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি তখন 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকার সহঃ-সম্পাদকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সভায় অক্ষয়চন্দ্রের ভাষণের তীব্র প্রতিবাদ করে বিপিনচন্দ্র বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতা সমসাময়িক কালে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'আলোচনা' পত্রিকায় তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম প্রকাশিত হয়। কাজেই অক্ষয়চন্দ্র যে কিভাবে সমকালীন প্রগতিবাদী অভিমতের বিরোধিতা করবার জন্য সনাতনী মত ও পথকে তুলে ধরছিলেন পূর্বের আলোচনা থেকে তার পরিচয় পাওয়া গেল।

জাতিভেদের প্রশ্নেও তিনি রক্ষণশীল ছিলেন। জাতিভেদকে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ গৌরব বলে অভিহিত করেছেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রভৃতির মতো অক্ষয়চন্দ্রও গুণ ভেদে জাতিভেদ স্বীকার করতেন না। গুণ যতই থাকুক না কেন, তাঁর মতে মানুষ তবু উচ্চবর্ণে উঠতে পারবে না। জন্ম সূত্রেই জাতি নির্ণীত হয়ে যায়। কারণ ভাল বীজে ভাল ফসল ফলে, খারাপ বীজে ফলে না। অতএব বীজশুদ্ধিই নাকি জাতিভেদের একমাত্র লক্ষ্য:—

'কোন বিষয়ের কতটুকু লইয়া জাতিভেদ, তাহা বুঝা আমাদের অগ্রে কর্তব্য। আমরা যতদূর বুঝি তাহাতে এই মাত্র বুঝা যায় যে, জন্মভেদেই জাতির সৃষ্টি; বিবাহের নিয়মেই ইহার স্থিতি এবং সঙ্কর বীজেই জাতকের জাতি নষ্ট। গুণভেদে জাতিভেদ,—অসম্ভব কথা। আপনার গুণে সিবিলিয়ান

হওয়া যায়, ইলবর্ট বিলের গুণে সমান অধিকার পাওয়া যায়, কিন্তু কোনও বিধি ব্যবস্থায় বাঙ্গালি ইংরেজ হইতে পারে কি?'[৯] অক্ষয়চন্দ্র আরো বলেন, ইউরোপ, আমেরিকা, এই বীজশুদ্ধির কথা বুঝে না। কারণ, সেখানে অশুদ্ধ বীজের সংখ্যা এত বেশি যে তার পরিমাপ করা যায় না। জন স্টুয়ার্ট মিল ও স্পার্কওয়েদাবের Law of Sex-এর কথা উল্লেখ করে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, তাঁরা যে জাতিশক্তির মাহাত্ম্য-খ্যাপনের চেষ্টা করেছিলেন, তা প্রকারান্তরে বীজশুদ্ধির মতকেই স্বীকার করে। ইউরোপে অশুদ্ধ বীজের সংখ্যা যদি এতো বেশি হয়, তবে তাদের এত উন্নতি হলো কেমন করে তার জবাব অবশ্য অক্ষয়চন্দ্র দেননি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার এ, কে কন্নেলের 'Discontent and Danger in India' গ্রন্থ পড়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, 'জাতিভেদগত সংস্কারই ভারতবাসীকে রক্ষা করিয়াছে—আসুরীয়, মিশরীয়, যবন, রোমক কোথায় অতলে চলিয়া গিয়াছে, ভারতবাসী আজিও দাঁড়াইয়া আছে।' এ-যুক্তির সারবত্তা গ্রহণে অনেকে অসমর্থ। কারণ, জাতিভেদ, বর্ণভেদের বাড়াবাড়ির ফলে ভারতের যে অধঃপতন হয়েছিল, তার ফল সবাইকে ভুগতে হয়েছে। নব্য সম্প্রদায়ের জাতিভেদ-সম্পর্কিত মনোভাবকেও অক্ষয়চন্দ্র সহ্য করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, 'নব্য সম্প্রদায় প্রায়ই বলিয়া থাকেন—সমাজের বেষ্টন-প্রাচীর ক্রমেই উচ্চতর করা হইয়াছে—জাতিভেদের নিয়ম ক্রমেই কঠোর হইতে কঠোরতর করা হইয়াছে, যদি তাহাই হইয়া থাকে—তবে কি সেটা নির্বুদ্ধিতার কার্য? আমাদের বোধ হয়, এখনকার দিনে বিদেশীয় বিধর্ম-বন্যা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অত্যন্ত সুদৃঢ়, সুগঠিত প্রাকার-প্রাচীরের আমাদের প্রয়োজন।' ('জাতিভেদে ব্যবসায় ভেদ' প্রবন্ধ, সনাতনী)। এটা প্রতিক্রিয়াশীল পুনরভ্যুত্থানবাদের লক্ষণ বলে মনে হতে পারে। এ-মতগুলি প্রমাণ করে যে, অক্ষয়চন্দ্র একদিকে দারুণ গোঁড়া ছিলেন।[১০] ব্রাহ্ম সমাজের যুক্তিবাদী ও জ্ঞানবাদী ধারার তিনি বিরোধী ছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁর মনোভাব অনেকটা বিরূপ ছিল। 'নবজীবন' ২য় ভাগে তিনি দিগম্বর ভট্টাচার্যের ছদ্মনামে রামমোহনের কয়েকটি ব্রহ্ম-সংগীতের প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। তাঁর এই সংগীতগুলিতে ব্রাহ্মদের নিরাকারবাদ ও জ্ঞানবাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। দিগম্বর ভট্টাচার্য ছদ্মনাম গ্রহণের মধ্যেই এই বিরোধের ভাব লুকিয়ে আছে। 'দিগম্বর ভট্টাচার্য কোন ব্যক্তি-বিশেষ নহেন—

গ্রন্থকারের কল্পনাভূত রসের মূর্তি।' রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসায়ের মধ্যে যেমন প্রতিদ্বিতার কথা শুনা যায়, দিগম্বরও যেন সেইভাবে রাজা রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের পাল্টা জবাব দিতেন। বলা বাহুল্য, দিগম্বর ভট্টাচার্যের সমস্ত গান গ্রন্থকারের নিজের রচনা। 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালীর গানে' ভ্রমক্রমে ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গান মুদ্রিত হইয়াছে।'

এই প্রত্যুত্তরগুলি খুব কৌতূহলজনক। যেমন রামমোন রায়ের গান,—

মন তুমি সদা কর তাঁহার সাধনা,
নির্গুণ গুণাশ্রয় রহিত কল্পনা।
যে ব্যাপিল সর্বত্র, তবু মন বুদ্ধি নেত্র
নাহি পায় কি বিচিত্র, কেমন জান না।
জানিতে তায় পরিশ্রম,
করিছ সে বৃথা শ্রম,
সে সব বুদ্ধির ভ্রম, দুঃসাধ্য সূচনা।
বিচিত্র বিশ্ব-নির্মাণ,
কায় রেখে কর্তা মান,
আছে মাত্র এই জ্ঞান অতীত ভাবনা।

উত্তরে ভট্টাচার্যের গান,—

কেন ক্ষ্যাপা কর তবে তাঁহার সাধনা,
নির্গুণ যদি তিনি, রহিত কল্পনা?
"আছে মাত্র" এই জ্ঞান—
তবে কেন গাও গান,
চক্ষু মুদি কর ধ্যান, কিসের ভাবনা?

রামমোহন রায়ের গান,—

ভুল না নিষাদ-কাল পাতিয়াছে কর্মজাল,
সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ।
দেব নানাবিধ ফল, ওযে কর্মতরুফল,
গরলময় কেবল দেখিতে সুরঙ্গ।
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন,
নিত্য সুখে জ্ঞানারণ্যে করহ গমন।

সুন্দর তরু-নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়
পাইবে ভোগিতে কত আনন্দ-বিহঙ্গ।

ভট্টাচার্যের উত্তর,—

দেখরে! বুদ্ধি-নিষাদ
পাতিয়াছে জ্ঞান-ফাঁদ,
সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধ ফল, ওযে গরল কেবল,
তর্কে তর্কে ঢল ঢল, দেখিতে সুরঙ্গ।
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছে মন,
কর্মরথে ভক্তি পথে করহ গমন,
মিলিবে মুক্তির ফল, মধু তাহে অবিরল,
মত্ত হবে সুধাপানে দেখিবে যে রঙ্গ।

রামমোহনের 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' গানটির প্রত্যুত্তরে উভয়ের জীবনদৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রামমোহনের গান—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,—
অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া --
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যাজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।

ভট্টাচার্যের উত্তর—

মনে কর শেষের সেদিন সুখকর,
আধনীরে গঙ্গাতীরে শঙ্কাহীন নর।
কাটায়ে সংসার-মায়া, আশীর্বাদি পুত্র-জায়া
নিরমাল্য বিল্বপত্র মাথার উপর।
চিন্ময়ী ধরেছ বুকে, কালী কালী নাম মুখে,
কালী নাম সবে ডাকে, করি উচ্চস্বর।

কালী নাম অবিচ্ছেদ, স্বর্গে মর্ত্তে নাহি ভেদ,
ব্রহ্ম রন্ধ্র করি ভেদ উঠে দিগম্বর।'[১১]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অক্ষয়চন্দ্রও জাতি রক্ষার জন্য ধর্মরক্ষা প্রয়োজন মনে করতেন। 'বাঙ্গালির জাতীয় জীবন ও হেমচন্দ্র' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'দেশ, জাতি, ভাষা আচার, ব্যবহার সকলই সনাতন ধর্মের অন্তর্গত। ধর্ম রক্ষা করিতে হইলে, সকলই রক্ষা করা আবশ্যক। যে স্বধর্ম-প্রতিপালক সেই আমাদের দেশের প্রকৃত পেট্রিয়ট্; স্বদেশ, স্বজাতি সনাতন আচার-ব্যবহার সকলেরই অনুরাগী। কেবল দেশভক্ত হওয়ার অর্থ নাই।' এজন্য স্বধর্মের প্রতি আস্থাহীন স্বদেশীদের তিনি কটাক্ষ করতেন। তাঁর বিদেশী-বিদ্বেষ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় (১৯০৫) এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, তাঁর পবিবারে ডাক্তাবী ওষুধ পর্যন্ত তখন ব্যবহৃত হতো না। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে (১৯০৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবর্তিত 'রাখী-বন্ধন' দিবসে অক্ষয়চন্দ্রের অধিনায়কতায় ও উৎসাহে চুঁচুডার গ্রাম্য দেবতা ষণ্ডেশ্ববের ষোডশোপচাবে পূজা হয়েছিল। বৃদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র স্বহস্তে মন্দিব-চত্বরে সহস্রাধিক দবিদ্র-নাবায়ণকে চিঁড়া, মিঠাই প্রভৃতি বিতরণ করে জনসেবায় সাবাদিন কাটিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি 'মা'! আমি স্বদেশী হব। ওমা বিদেশীর কাছে না যাব' গানটি রচনা করেছিলেন।

'সাধারণী'র সূচনায় (১৮৭৩), তিনি ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করলেও পরে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার বিরুদ্ধে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতই অনাস্থা প্রকাশ কবেছিলেন। ১৮৮৩ খৃঃ কবিকঙ্কণেব অনুসরণে 'নব বাণিজ্য' শীর্ষক একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন,—

এ নব বাণিজ্যে, ভাই! জীবন খোয়াই।
হিসাব করিয়া দেখি কি দিয়া কি পাই॥
আরে কি দিয়া কি পাই!

* * *

পাণ্ডিত্য বদলে ভাণ্ডিত্য পেয়েছি,
শিক্ষার বদলে শিখা,
বেদাঙ্গ বদলে বিড়ম্বনা আছে,
মূলের বদলে টীকা।

ক্ষমতা বদলে সমতা হয়েছে,

সমান মিছরি মুড়ি,

রক্ষক বদলে ভক্ষক জুটেছে,

(দেয়) পনের বদলে বুড়ি।

পঞ্চায়েৎ বদলে লাঞ্ছনা হয়েছে,

জজের গোলাম জুরি,

শাসন বদলে শোষণ চলেছে

দেহি দেহি ভুরি।

রাজত্ব বদলে বাণিজ্য হতেছে,

কোটীব বদলে লক্ষ,

অযুত বদলে নিযুত লইয়া

ভাণ্ডার ভরিছে যক্ষ।

সর্বস্ব বদলে সভ্যতা পেয়েছি,

চক্ষু থাকিতে অন্ধ !

কাঞ্চন বদলে অক্ষয় গাইছে

কাব্যের বদলে ছন্দ।'

স্বদেশপ্রেম থাকলেও তিনি ধর্মভিত্তিক উগ্র স্বদেশপ্রেমীদেব মতো পরমত-অসহিষ্ণু ছিলেন না। এ-শ্রেণীব অনেকেব মতো মুসলমান বিদ্বেষও তাঁর ছিল না। বাংলাদেশেব অর্ধেক মুসলমানকে তিনি বামার্ধ বলে মনে করতেন। সেজন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতিও তিনি মনে-প্রাণে কামনা করতেন।[১২]

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯–১৯১১)

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কথিত হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের যে দুটি ধারার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তার মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মধ্যপন্থী বলা যেতে পারে। উচ্চশিক্ষিত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বাংলা সাহিত্যে ইন্দ্রনাথের আবির্ভাবকে হেলীর (Halley) ধূমকেতুর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম, স্বজাতি-প্রেম ও ব্যঙ্গাত্মক রচনাভঙ্গি ইন্দ্রনাথের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ততটা ইংরেজ বিদ্বেষী না হলেও, ইংরেজের বিভিন্ন অন্যায় আচবণের বিরোধী ছিলেন। শাস্ত্র ও দেশাচারে বিরোধ দেখা দিলে কোন কোন ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র দেশাচারকে সমর্থন করার কথাও বলেছেন। আবার শশধব তর্কচূডামণিকেও ইন্দ্রনাথ বর্জন করেন নি। শশধর তর্কচূড়ামণিব বর্ণাশ্রম ধর্ম-মাহাত্ম, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক অন্যান্য অতিমাত্রায় রক্ষণশীল মত ইন্দ্রনাথ সমর্থন করতেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী সংক্ষেপে উল্লেখ করি। ইন্দ্রনাথের পিতা বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী গঙ্গাটিকুরীর অধিবাসী। তিনি পূর্ণিয়ার উকীল ছিলেন। ছ'বছর বয়সে ইন্দ্রনাথ পূর্ণিয়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ভর্তি হন। ন'বছরে পিতৃবিয়োগ হবার পর তিনি পড়াশুনার জন্য কৃষ্ণনগর যান। শারীরিক অসুস্থতার জন্য সেখান থেকে ১৮৫৭ খৃঃ তিনি বীরভূম গমন করেন। ১৮৫৯ খৃঃ বিবাহের পর তিনি ভাগলপুব গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৬৩ খৃঃ সেখান থেকে তিনি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেন। ১৮৬৪ খৃঃ তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কিছুদিন পরে 'লার্সিপ ট্রান্সফর' নিয়ে তিনি হুগলী কলেজে চলে যান। ১৮৬৫ খৃঃ তিনি ডাফ সাহেব প্রতিষ্ঠিত 'ফ্রী চার্চ ইনষ্টিটিউসনে'ও কিছুদিন পড়েছিলেন। ১৮৬৯ খৃঃ 'ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ' থেকে তিনি বি,এ পাশ করেন। ১৮৭১ খৃঃ বি, এল পাশ করার পর তিনি হাইকোর্টে যোগ দেন। পূর্ণিয়া, দিনাজপুরে ওকালতী

করার পর ১৮৮১ খৃঃ জুলাই মাসের পর থেকে তিনি বর্ধমানে বসবাস শুরু করেন।

ইন্দ্রনাথের আবির্ভাব কাল বাংলা দেশের ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে মনে রাখবার মতো। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিপত্তি, ইংরাজি শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ প্রভৃতি এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মন এগুলি সমর্থন করেনি। তাই তিনি ১৮৮১ খৃঃ থেকে সমসাময়িক ঘটনাগুলি নিয়ে ব্যঙ্গার্থক রচনামালা 'পঞ্চানন্দ' লিখতে শুরু করেন। এগুলি প্রথমে 'সাধারণী' 'পঞ্চানন্দ' 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরে 'পঞ্চানন্দ' ও পাঁচু ঠাকুর নামে কয়েক খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছিল। 'পঞ্চানন্দ' নামকরণে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের প্রভাব থাকতে পারে। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে ইন্দ্রনাথের স্ব-রচিত যে জীবনী প্রকাশিত হয়েছে তা পাঠ করে জানা যায়, 'পঞ্চানন্দ' রচনায় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পরামর্শ ছিল। এর কিছু রচনা সাধারণী'তে (১২৮০) প্রকাশিত হয়েছিল (সাধারণীর পত্রে-প্রবন্ধ শীর্ষক রচনা ইন্দ্রনাথেরই লেখা)। তবুও ইন্দ্রনাথ তখনো যেন নিজের মনোভাবকে প্রকাশ করার উপযুক্ত বাহন খুঁজে পাননি। হঠাৎ সেই সুযোগ এসে গেল। 'সাধারণী'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ১৮৮২ খৃঃ 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁর 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ইন্দ্রনাথের সাহায্য প্রার্থনা করেন। 'বঙ্গবাসী'র সঙ্গে ইন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বাড়ল। 'বঙ্গবাসী'-গৃহে অবস্থান করে ইন্দ্রনাথ 'পঞ্চানন্দ' ও অন্যান্য রচনা লিখতে লাগলেন এবং বিভিন্ন বিষয়েও তিনি যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন। 'বঙ্গবাসী' প্রথমে ঠিক গোঁড়া রক্ষণশীল পত্রিকা ছিল না। সেজন্য কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মনে হয়, ইন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'বঙ্গবাসী' বেশি রক্ষণশীল হয়ে উঠে। উদাহরণ-স্বরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ইন্দ্রনাথ 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ব্রাহ্ম নারী-শিক্ষা-স্বাধীনতাকে কটাক্ষ করে একটি ব্যঙ্গ-রচনা লেখার পর ঐ পত্রিকার ব্রাহ্ম-সদস্যরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা এই রচনার জন্য মার্জনা চাইতে বললে ইন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে তা অস্বীকার করেন। এর পর ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে 'বঙ্গবাসী'র সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ব্রাহ্ম-সভ্যরা 'বঙ্গবাসী'র বিরোধিতার জন্য 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন।[২]

এই ঘটনার পর থেকে দেখা যায় ইন্দ্রনাথ শুধু ব্রাহ্ম-বিরোধী নয়, ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী হয়ে উঠলেন। ফলে তাঁর রচনায় হিন্দু-ব্রাহ্ম প্রসঙ্গ মুখ্য স্থান অধিকার করল এবং ব্রাহ্ম-বিবোধিতা প্রায় তাঁর 'Mission'-এ পবিণত হল। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকেব মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—'ইন্দ্রনাথেব যুগে ব্রাহ্ম সমাজের শ্লেষাত্মক সমালোচনা একটা সাময়িক গুরুত্ব লাভ কবিয়াছে। বোমান বাগ্মীপ্রবর সিসাবো যেমন তাঁহাব বক্তৃতার মধ্যে কার্থেজের ধ্বংসকে বিষয়রূপে সন্নিবিষ্ট ক'বিতেন, তেমনি ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাদের সমস্ত বচনাতেই ব্রাহ্মধর্মেব বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম ঘোষণা কবিয়াছেন। তাঁহাদের অস্ত্রাগাবেব তীক্ষ্ণতম ব্যঙ্গাস্ত্র, তাঁহাদের নীতি ও রুচিবোধেব তীব্রতম প্রতিবাদ ব্রাহ্ম সমাজেব উপবেই বর্ষিত হইয়াছে।'[২] ব্রাহ্মদেব মধ্যে আবার কেশবচন্দ্র সেনই ছিলেন ইন্দ্রনাথেব আক্রমণেব বিশেষ লক্ষ। পঞ্চানন্দেব বিভিন্ন ব্যঙ্গ-রচনায় কেশবচন্দ্রেব বিভিন্ন মতামত ও মনোভাবকে তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে। এই কেশব-বিদ্বেষেব বিশেষ একটি উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৬০ সালের পরে কেশবচন্দ্রই হয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যবিত্ত তরুণ বুদ্ধিজীবী অংশের প্রধান নেতা। তাঁব অসাধাবণ বাগ্মিতা, ধর্মপ্রাণতা যুবকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কেশবচন্দ্রের বিভিন্ন সমাজ-সংস্কাব প্রচেষ্টা, যেমন 'স্ত্রী-জাতির উন্নতি সাধন বিভাগ', 'সাধারণ ও ব্যবসায় সম্পর্কীয় জ্ঞান শিক্ষা বিভাগ', 'সুলভ সাহিত্য বিভাগ,' 'সুরাপান ও মাদক নিবাবণী বিভাগ', 'দাতব্য বিভাগ' সে যুগে বিফর্মিস্ট গোষ্ঠিব কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন কবেছিল। এই সংস্কার-প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তিনি আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সেযুগের শিক্ষিত যুবকদের মনকে ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম সমাজের দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন। ইন্দ্রনাথ ছিলেন সংস্কার-বিরোধী আন্দোলনের প্রধান নেতা। গতিবাদকে তিনি সমাজ-স্থিতির পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে কবতেন। তাই, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে—বিশেষভাবে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল অপরিহার্য। 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, এর প্রায় দু'বছর পরে শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁর মত প্রচার শুরু করেন। ইন্দ্রনাথ তাঁর পথ অনেকটা প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। ১২৯১ (১৮৮৪) সালের বৈশাখ মাসে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বীরভূম থেকে বর্ধমানে এসে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অবস্থান করেন। ইন্দ্রনাথই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শশধর তর্কচূডামণির পরিচয় করে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কাজেই, কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁর এই বিদ্বেষ খুব সহজ ও

স্বাভাবিক। কেশবপন্থীদের ধর্মোন্মাদনা, খৃষ্ট-প্রীতি ও পাপবোধ, সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রয়াস, নারী-স্বাধীনতার কিঞ্চিৎ অপব্যবহার শুধু গোঁড়া হিন্দুদের মনে নয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত আদি ব্রাহ্ম সমাজেও অস্বস্তির সঞ্চার করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২) তার দৃষ্টান্ত। হিন্দু সমাজ এজন্য একটা শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণ সেই প্রতিরোধ শক্তির নমুনা। হিন্দু যুব সমাজের উপব কেশবচন্দ্রের প্রভাবের ফলে দেশে খৃষ্ট ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এই আশঙ্কায় হিন্দু সমাজ অধিক আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। ইন্দ্রনাথ প্রধান সেনাপতি হিসাবে এই যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবেছিলেন। পঞ্চানন্দের বিভিন্ন বচনা না পডলে এই ব্রাহ্ম-বিরোধিতার স্বরূপ স্পষ্ট বোঝা যাবে না। 'দ্রব্যগুণ' নামক একটি ব্যঙ্গ-রচনায় ইন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের বৈরাগ্য, সর্বধর্ম সমন্বয়কে তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন। 'কেশব সেন চক্ষে চশমা দিয়া, চক্ষু মুদ্রিত কবিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া নিরাকাব ব্রহ্মকে দেখিতে পাইলেন, ব্রহ্মের দক্ষিণ হস্তে যীশু খ্রীষ্টকে, বাম হস্তে মুসাকে, যীশুর দক্ষিণে চৈতন্যকে, মুসার বামে শাক্য মুনিকে, এইরূপ প্রতিমা সাজান গোছ সমস্ত দেখিতে পাইলেন। সহজে, শুদ্ধ চর্মচক্ষুতে এইরূপ কিছু দেখিলে অন্যে পরে দূরে থাকুক, কেশব সেনই তাঁহাকে ভণ্ড, পাপিষ্ঠ প্রভৃতি আখ্যা দিতে ত্রুটি করিতেন না। দ্রব্যগুণ স্মরণ করিয়া সকলে একবাক্যে স্বীকার করিতেছে, কেশব সেন পরম ধার্মিক, একেশ্বরবাদী নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, বৈরাগ্য ব্রতধারী, সংসারের মায়াব অতীত, নিষ্কাম এবং গুণধাম।'

কেশবচন্দ্র জাতি ও বর্ণভেদপ্রথা লোপ করে ব্রাহ্ম সমাজে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। জাতি ও বর্ণভেদ-প্রধান হিন্দু-সমাজ এ-ব্যাপারে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিল। নিজেদের চিরাচরিত প্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইন্দ্রনাথ তাই কেশবচন্দ্রকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-৫৯) ঢঙে রচিত, 'সেন শেষ বা লোক সংখ্যা'-নামক ব্যঙ্গ কবিতায়।

'দেশে আগে ছিল ধর্ম,
করত লোকে ক্রিয়া কর্ম,
এখন, কেশব সেনের ছাপায় পড়ে,
হিন্দুয়ানী অক্কা পান।
আবার যে তুলেছে দেশে ইত্যাদি।

তখন ছিল জাত বিচার,
করত ব্যাভার যেমন যার……
কালে, এক টেবিলে, বামুন যবন,
উইল সেনে খানা খান।
আবার যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।
* * *
কালে কালে সেনে সেনে,
দেশটা দিলে তুলো ধুনে,
ভালো, এত মুলুক বাইরে আছে,
সেন্‌জা কি আব পায় না স্থান?
আবার যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।'

এই ব্যঙ্গ-কবিতায় অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ধারাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেব 'ছুঁড়িগুলো ছিল ভালো ব্রতনিয়ম করত সবে।' কথাগুলির সঙ্গে এ-কবিতাব যথেষ্ট মিল আছে। শুধু তা নয়, কেশবচন্দ্রের নগর সঙ্কীর্তন, নববিধানেব বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, ব্যক্তিগত জীবন-যাপন প্রণালীকেও ইন্দ্রনাথ কটাক্ষ করেছেন। কুচবিহার বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং নিয়মতান্ত্রিক অধিকার প্রভৃতি ব্যাপাবে ভাবতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। সমাজের অনেক তরুণ ও উন্নতিশীল সভ্যবা স্বতন্ত্রভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (১৮৭৮) প্রতিষ্ঠা করার পর কেশবচন্দ্র নিজের সমাজের নাম রাখেন 'নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ'। এরপর তিনি অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেন। ইন্দ্রনাথ 'দিশাহাবা'য় সে-বিষয়ে কটাক্ষ করে লিখেছিলেন, 'সামাজিক নিয়ম সমূহে যে সকল দোষ আছে, তাহাব সংশোধন জন্য তুমি বিশেষ ব্যগ্র। জাতিভেদ, সম্প্রদায় ভেদ, অতিশয় অনিষ্টজনক জানিয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য তোমার বিশেষ যত্ন। জিজ্ঞাসা কবিতেছি, সেই জন্যই কি পরের মেয়ে আইবুড় রাখিবার আইন করাইয়া সকাল সকাল আপনার মেয়েকে রাজরাণী করিয়া দিলে? সেই জন্যই কি হিন্দুব ছত্রিশ জাতির উপর নিজের একটা দল? আর ঝগড়া করিয়া আবও একটা ভাঙ্গাদল বাড়াইয়া বোঝার উপর শাকের আঁটি করিয়া দিলে? বলো দেখি বাবাজী, তুমি বাস্তবিক কোন্‌ দলের, আর তোমার আসল মত খানাই বা কি?'

কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে এ-ধরনের আক্রমণ অনেকের কাছে হয়তো বাড়াবাড়ি

মনে হবে। তাঁর শিক্ষা, ধর্মনিষ্ঠা ও সততা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ওঠে না। তবুও সমাজ যুগ-পটভূমির দিকে তাকালে ইন্দ্রনাথের আচরণকে একেবারে অস্বাভাবিক বলা যায় না। [ইন্দ্রনাথ পৌরাণিক ভাবধারাকে কেন্দ্র করে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেছিলেন। স্মরণীয় যে পুরাণগুলি পুনঃ প্রকাশের ভার নেন 'বঙ্গবাসী'। পঞ্চানন তর্করত্ন (১৮৬৬-১৯৪০) ও শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৬০-১৯১৩) যথাক্রমে পুরাণ ও তন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে এ-কাজ অনেক সহজসাধ্য করেছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬) পুরাণ ও তন্ত্রকে ভিত্তি করেই তাঁর সাধন-পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন। আর একটি কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র বা শিবনাথ শাস্ত্রী কেউই পুরাণকে সমর্থন করেন নি। কারণ, পুরাণের সঙ্গে বহু দেবতায় অর্থাৎ পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রনাথের সংগ্রাম—একেশ্বরবাদ অ-পৌরাণিক আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ইন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, পৌরাণিক আদর্শই ভারতের একমাত্র আদর্শ। সমাজ-স্থিতিকে বজায় রাখতে হলে এই আদর্শকেই অটুট রাখতে হবে। তাই সেযুগে ধর্মপ্রীতি ও সমাজপ্রীতি অবিচ্ছিন্ন ছিল। ইন্দ্রনাথ মনে করতেন, সামাজিক আচার-ব্যবহার যথাযথভাবে পালন করলে ধর্মনিষ্ঠা জাগে। ধর্মপ্রীতি থেকে দেখা দেয় সমাজপ্রীতি। সমাজপ্রীতি পরিণত হয় দেশপ্রীতিতে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'আচার প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'সামাজিক প্রবন্ধের' কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ যুগের পুনরভ্যুত্থান আন্দোলন এজন্যই স্বদেশ-প্রীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। পুরাণের ভাষ্যকার পঞ্চানন তর্করত্ন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এজন্য তাঁর কারাবাসও হয়েছিল। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার পরবর্তী সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বদেশী আন্দোলনে কারাবরণ করেন। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ-যুগের স্বদেশী আন্দোলন জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই জাতীয়বাদ হল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। সুতরাং, ধর্মপ্রীতি, স্বদেশ প্রীতির সঙ্গে জড়িত থাকায় ইন্দ্রনাথ যবন, ম্লেচ্ছ তথা ব্রাহ্ম-বিরোধী হয়েছিলেন।

'কল্পতরু' (১৮৭৪) উপন্যাসে এ-মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ কলকাতায় থেকে লেখাপড়া করে—ব্রাহ্ম সমাজে যায়। নরেন্দ্রনাথের ভাই

মধুসূদন গ্রামে থাকে, নবেন্দ্রনাথেব টাকা পয়সা যোগায়। তা সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষা এবং 'আধুনিক সভ্যতার' প্রভাবে অশিক্ষিত মধুসূদনকে 'পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অগ্রজ মহাশয়' লিখতে লজ্জাবোধ করে। গ্রামে যাওয়া-আসা সে প্রায় ছেড়েই দেয়। তাব বাড়ীর পাশেই সপবিবারে থাকেন বাপান্তবাগীশ। নরেন্দ্রনাথ চোখ বুজে ধ্যান করাব ছলে জানলার খড়খড়ি দিয়ে বাপান্তবাগীশেব 'সাডে তেব বৎসরেব একমেটে, ঝুলবর্ণা, বডী নাকী বিধবা ভ্রাতৃবধুব' দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ছাদে গিয়ে সে তাকে উপদেশও দেয়। এই উপদেশগুলি ব্রাহ্মসমাজ থেকেই ধাব কবা—যেমন 'মনুষ্য মাত্রেই ভাই এবং ভগিনী—এবং আপন পব ভেদ বাখা মহা পাপ, তুমি আমাব, আমি তোমাব' ইত্যাদি। নবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যায়। সেখানে যখন বক্তৃতা হয়, তখন দেশের দুর্দশা, নাবী-জাতিব অধীনতাব প্রসঙ্গ উঠলে সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে। আব একটি 'ভ্রাতাও' 'কৃষ্ণমোহন লাহিড়ীর কন্যা সমাজগৃহ হইতে বাটী যাইতেছেন, সপ্তাহকাল আর এখানে আসিবেন্ না' শুনে কাঁদতে কাঁদতে ঘব থেকে বেবিয়ে যায। এদিকে বাপান্তবাগীশ ভ্রাতৃবধুব ছাদে ওঠা বন্ধ কবাব পব থেকে নবেন্দ্রনাথের মন ভীষণ চঞ্চল হয়। একদিন নৈশ-অভিসাবে বাপান্তবাগীশের বাডিব সরু গলিব নর্দমার কাঠের উপর দিয়ে হাঁটার সময় নরেন্দ্রনাথের পা পিছলে যায। বাপান্তবাগীশ ছুটে এলে তাড়াতাডি পালাবার সময় নবেন্দ্রনাথেব একপাটি জুতো খোয়া যায়। পরের দিন সংবাদপত্রে সেই এক পাটি জুতোর মালিককে ধবিয়ে দিতে পারলে ৫০ টাকা পুবস্কার দেওয়া হবে বলে বাপান্তবাগীসেব বিজ্ঞাপনটি দেখার পর 'বাম-হস্তে মুখ চাপিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া চক্ষুব শ্বেতভাগ সমস্ত বাহির করিয়া 'নরেন্দ্রনাথ ভাবতে লাগল। কয়েক ঘণ্টাব মধ্যে সে মনস্থিব করে ফেলল—'সংসার অসার, ধর্মব্রত অবলম্বন করিলেই তাহাতে বহু বিঘ্ন নিশ্চিত, সাধুপথে অনেক কণ্টক'—এই সত্য আবিষ্কার কবে, বিকালে কাউকে না বলে নরেন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যায়। তারপর, কালীনাথ ধবের কৃপায় রাণীগঞ্জের ৪ ক্রোশ পূর্বদিকে রাজহাট গ্রামে শিক্ষকতা করার সময় নরেন্দ্রনাথ রামকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের আটচল্লিশ নম্বরের স্ত্রী তেইশ বছর বয়স্কা বিমলার সঙ্গে 'ভগিনী' সম্পর্ক পাতায়। ক্রমে সেই সম্পর্ক গাঢ় হলে, উভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। এক বাবাজীর আশ্রমে বিমলাকে রেখে নরেন্দ্রনাথ কলকাতায় গেলে, বিমলার জীবনে চরম অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

'ক্ষুদিরাম' (১৮৮৮) উপন্যাসেও স্ত্রী-স্বাধীনতা, আধুনিকতা ও ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা করা হয়েছে। জেলের ছেলে ক্ষুদিরাম ইংরাজি শিখে 'ক্ষুদিরাম বাবু' হয়ে ওঠার পর গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে বাস করতে থাকে। মা মাছ বেচে বলে ক্ষুদিরাম আর বাড়ি যেতে চায় না। এদিকে মায়ের সাধ—ক্ষুদিরামের বিয়ে দেবে, সেজন্য ক্ষুদিরামের মা অনেক কষ্টে একখানি ছোট অলঙ্কার বাঁচিয়ে রেখেছে বধূকে উপহার দেবে বলে। কিন্তু মায়ের সাধ হলে কি হয়! 'এত আর ইংরাজী কপচানী, নভেল্ পড়নি, চেয়ারে বসুনি, সুশিক্ষিতা মা নয়। এযে মাছ বেচুনী সত্য সত্য মৎস্য গন্ধা!' তার আবার মনের সাধ কি? ক্ষুদিরাম কি এত ইংরাজি পড়ে 'চেলীর পুঁটুলী' জেলের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে?

ক্ষুদিরাম কলকাতায় ভুসীভোজন বাবুর সঙ্গে এক বাসায় থেকে 'বিধবা বিবাহ, স্বাধীন মত, স্ত্রী-স্বাধীনতা' প্রভৃতি বড বড় সমস্যার সমাধান এবং ভুসীভোজন বাবুর কাছে 'ঈশ্বরের অভিপ্রায়, বিবেক, নীতি ও যুক্তি' বিষয়ে অপূর্ব জ্ঞান লাভ করতে লাগল। এব ফলে সে সহস্র বাধা-বিঘ্ন পদদলিত করে বিধবা শ্রীমতী নিরয়নীর সঙ্গে 'পবিত্র দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ' হয়ে জগতে সৎ সাহস, সত্য-নিষ্ঠা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখাল।

উপরিউক্ত উপন্যাস দুটিতে ইন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তার অন্যান্য রচনায় তাব প্রতিধ্বনি শোনা যয়ে। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতাকে ইন্দ্রনাথ আদৌ সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর রক্ষণশীল মনে সব জিনিস ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই তিনি মনে করেছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের অনুতাপ, 'চোখ বুজা' 'ভ্রাতা ভগিনী' সম্বোধন প্রভৃতি সবই ভণ্ডামি। স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার ফলে সমাজ-স্থিতি ধ্বংস হতে পারে, অত্যাচার-ব্যভিচারে দেশ পরিপূর্ণ হতে পারে। সমাজ-স্থিতি নষ্ট হবার ভয়ে ইন্দ্রনাথ আধুনিকতার সব লক্ষণকে আক্রমণ করেছেন।

ইন্দ্রনাথের কেশব-বিদ্বেষ এবং ব্রাহ্মবিদ্বেষ এতই চরমে উঠেছিল যে, যেসব সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টায় কোন মত পার্থক্য থাকার কথা নয়, সেখানেও তিনি প্রতিপক্ষকে খোঁচা মেরেছেন। কেশবচন্দ্র মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এজন্য মাতলামির কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছিল। ইন্দ্রনাথ এজন্য ব্যঙ্গচ্ছলে লিখেছিলেন ১. মাতলামি কি দ্বাদশ বৎসর কাল নিরুদ্দেশ হইয়াছিল? ২. মাতলামি নিরাকার। ব্রাহ্ম হইয়া মাতলামির কুশপুতুল

অর্থাৎ মূর্তি নির্মাণ করা কি পৌত্তলিকতার চিহ্ন নহে ? ৩. দাহ করিবার আগে মুখাগ্নি করা হইয়াছিল কি না ? হইয়া থাকিলে, কে করিয়াছিল ? ৪. ব্রাহ্ম মতেই হউক, আর হিন্দু মতেই হউক, যখন সৎকার হইয়াছে, তখন শ্রাদ্ধ চাই। মদের শ্রাদ্ধ কবে হইবে, এবং কোথায় হইবে ?'[৪]

ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষের কারণ 'ব্রাহ্মকোর্স' নামক একটি ব্যঙ্গরচনায় লিপিবদ্ধ বিষয়সূচী থেকেই পাওয়া যায়।

ব্রাহ্ম কোর্স

(যাহাতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে ভববন্ধন মোচন হইবে)

COMPULSORY SUBJECTS

অর্থাৎ

যে সকল বিষয় লইতেই এবং মানিতেই হইবে।

১. জাতিভেদ— উচ্চতর জাতি নষ্ট করা পর্যন্ত।
২. স্ত্রী স্বাধীনতা—পঞ্চদশ অবধি চত্বারিংশ বর্ষ পর্যন্ত।
৩. স্ত্রীশিক্ষা— সঙ্গীত-প্রকরণ ; নৃত্য-প্রকরণ ; প্রণয়-প্রকরণ ; বিরহ-প্রকরণ ; গৃহত্যাগ, পিতৃমাতৃ ভ্রাতৃত্যাগ প্রকরণ ; নাটক, উপন্যাস, পদ্যরচনা, পত্ররচনা এবং গুরুজন লাঞ্ছনা।
৪. বিবাহ— বিধবা বিবাহ, সধবা বিবাহ, কুমারী বিবাহ, অচির বিবাহ বিবিধ বিবাহ।
৫. উপাসনা— মন্দির-মিলন এবং নিরাকার নিবাকরণ। নয়ন-মুদ্রণ, ভেউ ভেউ করণ পর্যন্ত এবং পৈতা ছেঁড়া।
৬. ভারত উদ্ধার—সম্পূর্ণ।

OPTIONAL SUBJECTS

অর্থাৎ

যাহা লইলেও চলিবে, না লইলেও চলিবে।

১. মদ ও মুর্গী
২. 'বঙ্গবাসী'- বিরোধ
৩. দেশভক্তি— ঠোঁট হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত

৪. দাড়ি ও চশমা

৫. ধনোপার্জন— পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ প্রকরণ

৬. রাজ ভক্তি— বক্তৃতা ও ইংরেজ তাড়ান পর্যন্ত।'

ইন্দ্রনাথ এই অনুকরণপ্রিয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের অভিন্নতা কল্পনা করেছেন। তাঁর ধাবণা ছিল, ব্রাহ্মসমাজেব স্ত্রী-স্বাধীনতা, অবাধ মেলামেশা, ইংরাজ ও ইংরাজি প্রীতির জন্যই দেশে এই অনুকরণের স্রোত এসেছিল। তাই, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েব 'বাঙালীর মেয়ে' কবিতাটির অনুকরণে তিনি লিখেছিলেন—

'হায় হায় অই যায় বাঙালীর ছেলে
সমুখে টেবিল শোভে হংসপুচ্ছ হাতে,
মাছি মেবে কপি করে বাহাদুরি তাতে ,
যখন বক্তার বেশ, চোখে দিয়া ঠুলি,
গলা চিরে ঝাবে তোতা বিদেশীর বুলি।
মাথামুণ্ডু মুর্গী মটন, বিলক্ষণ টান,
কালিয়ে কাবাব পেলে দেমাকে অজ্ঞান।
বুক ফোলাতে, চেন ঝোলাতে, চূডান্ত নিপুণ,
"চিয়ার" "হিয়ার" গোলে চতুর্মুখ খুন,
গরম দিনে জামাজোডা জবড়জঙ্গ হয়ে,
ঠাণ্ডা রেতে হাওয়া খাওয়া বাগান-বাড়ী পেয়ে।
চক্ষু মুদে চোরা যেন—বেহ্ম সভায় গেলে,
ঘুঙুর পায়ে ঝুমুর নাচে মদের বোতল পেলে,—
সাবাস সাবাস তোরে বাঙালীর ছেলে।

* * *

উইলসন, কেশব সেন, নেয়ে পরকালে—
হায় হায় ঐ যায় বাঙালীর ছেলে।'

একথা অনস্বীকার্য যে, সে যুগে একশ্রেণীর মানুষ অন্ধ ইংরাজ অনুকরণের দ্বারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তারা যে সবাই ব্রাহ্ম একথা মনে করার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। গোঁড়া হিন্দু-সমাজের মধ্যেও এই অনুকরণের ঢেউ লেগেছিল। সেজন্য ব্রাহ্মদের পুরোপুরি দায়ি করা যায় না। তাছাড়া, ব্রাহ্মদের প্রচেষ্টার ফলে দেশে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার অনেক বেড়ে

গিয়েছিল। 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ', 'নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ' দেশে অনেক জনহিতকর কাজও করেছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের অনেকেই স্বাদেশিক কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। একথা সত্য যে, কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর নববিধান পন্থীরা অনেকেই রাজভক্ত ছিলেন। 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের' প্রচেষ্টায় দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতিব দেশপ্রেমে সন্দেহ করা অনুচিত। ইন্দ্রনাথ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এই দিকটি মোটেই দেখতে পাননি। তাই তিনি কাবণে-অকারণে সব ব্রাহ্মকে ইংবাজের স্তাবক ও অনুকারী বলে ধবে নিয়েছিলেন।

ইন্দ্রনাথের এই মনোভাবেব জন্য বিশেষ ভাবে ব্রাহ্ম বিদ্বেষের জন্য সে-যুগে কিছু কিছু প্রতিবাদও হয়েছিল। 'পঞ্চানন্দে'ব ব্রাহ্ম-বিবোধী মনোভাবকে বিদ্রূপ করে একজন অজ্ঞাতনামা লেখক ১২৯৩ সনে (১৮৮৫-৮৬) 'মহাকবি ধূর্জটি' ছদ্মনামে 'একাদশ অবতার' শীর্ষক একটি ব্যঙ্গ-কাব্য লিখেছিলেন। বইটিতে ব্রাহ্ম সমাজকে সমর্থন কবে কোন কথা বলা হয়নি, কেবল ব্রাহ্মদের হাত থেকে দেশবক্ষাব জন্য অবতীর্ণ একাদশ অবতাব 'পঞ্চানন্দে'ব ব্রাহ্মনিধন অভিযানেব বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কাব্যটি মধুসূদনেব অমিত্রাক্ষব ছন্দ ও 'মেঘনাদবধ কাব্যেব' গঠন-বীতি অনুযায়ী বচিত। 'পঞ্চানন্দ' উচ্চকণ্ঠে একথা ঘোষণা কবেছিলেন যে, ব্রাহ্মবাই হিন্দুধর্মেব শত্রু। 'একাদশ অবতার' তার ব্যঙ্গ-কৌতুকময় উত্তব।

কাব্যটিব কাহিনীর মধ্যেও একথার সমর্থন মেলে। নিরয়পুরে মহারাজ কলি পাত্র-মিত্র নিয়ে বসে আছেন, এমন সময় মন্ত্রী শনৈশ্চব মর্তলোক থেকে উত্তেজিত হয়ে এসে ব্রাহ্মদের অহিন্দু কার্যকলাপ সম্বন্ধে এক বিস্তৃত বিবরণ দেয়। সেখানে সাতাশটি মুদ্রা গচ্চা দিয়ে মন্ত্রীবরেব মেজাজ বীতিমত বিগড়ে গেছে। একথা শুনে কলিরাজ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। অবশেষে অনেক পরামর্শ করে ব্রাহ্ম-নিধনের জন্য একাদশ অবতার রূপে 'পঞ্চানন্দের' সৃষ্টি হল। দলবল নিয়ে 'পঞ্চানন্দ' ব্রাহ্ম-নিধনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। 'বিবেক'কে মাথায় ডাণ্ডার বাড়ি মেরে ঠাণ্ডা করে দেওয়া হল। একদিন গভীব রাত্রিবেলা ঘুমন্ত ব্রাহ্মপুরী অবরুদ্ধ হল। মারাত্মক 'পঞ্চানন্দ' অস্ত্রে ব্রাহ্মদের ঘায়েল করার জন্য স্বয়ং 'পঞ্চানন্দ' দলবল নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। এমন সময় অদূরে লাল পাগড়ি দেখা দিলে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে 'পঞ্চানন্দ' ও তাঁর সৈন্য-সামন্ত চোঁ চা দৌড়

মারলেন। সেই সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ ধাপার মাঠে খুঁজলে হয়তো এখনো পাওয়া যাবে।

বর্ধমান থেকেই ইন্দ্রনাথ অনেকদিন 'পঞ্চানন্দ' লিখেছিলেন। সেজন্য বর্ধমানের বর্ণনা সহ ইন্দ্রনাথকে বিদ্রূপ করা হয়েছে এই কাব্যে।

'বহে দামোদর নদ, কল কল কলে
প্রক্ষালিয়া রাঢ় দেশ; পুণ্যদেশ এবে
পঞ্চানন্দ পদার্পণে;'

'কলিরাজ'-এর চরিত্রে বোধ করি শশধর তর্কচূড়ামণিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। 'একাদশ অবতার'-এ কচ ঋষির উক্তির মধ্যে শশধরের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।

'নীরবিলা কলিরাজ। লোমকূপ হতে
তাড়িত-স্ফুরিত কত, উল্কা পিণ্ড প্রায়,
ঝরিল আশ্রম মাঝে। ত্রস্ত কচ ঋষি,
কহিলেন করপুটে। ক্ষম বৎস কলি,
ক্ষম অপরাধ মোর। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ
চির প্রতিপাল্য তব, কেন কর রোষ?
....দেখ ভাবি মনে
ইলেক্ট্রিক, ম্যাগনেটিক, বৈজ্ঞানিক আদি
শিখায়েছ যত কথা, বুঝি বা না বুঝি
বলি তা'ত মুহুর্মুহু। ইংরাজী শিক্ষায়
যত দোষ বলে দেছ, বলি বার বার,
কি আর করিব তবে? বলিতে কি হবে?
বিসূচিকা, মহাব্যাধি, জলদোষ আদি,
ইংরাজী পড়িলে হয়।

* * *

ক্ষমা কর বাপু,
আজ হ'তে কহিতেছি, শপথ করিয়া,
উদ্ধারিতে রাজকার্য, পাপ ব্রাহ্মগণে,
শাস্ত্রীয় বিধানে, আর বৈজ্ঞানিক মতে
কায়মনোবাক্যে সদা দিব গালাগালি,'

'মহাকবি ধূর্জটি' খুব সম্ভবতঃ 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের' প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কোন ব্যক্তির নাম। কাব্যে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির নামই উল্লেখ করেছেন।

শুধু ব্রাহ্ম সমাজ নয়, এক শ্রেণীর হিন্দুদেরও ইন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দ্বারা জর্জরিত করেছিলেন। বিভিন্ন দলাদলির ফলে ব্রাহ্মসমাজের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার সময় একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যদিকে শশধর তর্কচূড়ামণি, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজের পুনরুজ্জীবন হয়। এই সময়ে অনেক ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিও আবার গোঁড়া হিন্দু আচার রীতি-নীতি গ্রহণ করে। এদের মত পরিবর্তনের মূলে সমাজ-ভীতি যতটা প্রবল ছিল, হিন্দু ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ততটা ছিল না। এরা বাইরে ইংরাজের পোষাক পরিচ্ছদ পরে বাড়িতে হিন্দুয়ানী বজায় রাখার চেষ্টা কবতো। বিলাত থেকে আসার পর গোবর খেয়ে শুদ্ধ হতো। এক শ্রেণীর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিলাত যাওয়া বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁদেব মতে, হিন্দু পাচকের রান্না খেলে এবং হিন্দুদের পরিচালিত জাহাজে ভ্রমণ করলে বিদেশযাত্রা নাকি কোন দোষের হতো না। ইন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মন এই অর্ধেক গ্রহণ, অর্ধেক বর্জন' নীতিতে সায় দিতে পারেনি। তাই তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হুল ফুটিয়েছেন।

যেতে হবে জলপথে

'পঞ্চানন্দ পথেব যোগাড় করিতে চলিলেন। জলপথেই যাত্রা, জাহাজের যোগাড়টাত করা চাই। জাহাজে জাত বজায় রেখে যেতে হবে, জিনিষপত্র সেই রকম য তে হয় তার ভার এই শর্মারই উপর। ব্যবস্থা যা করা হয়েছে তা বলি। সব কণ্ট্রাক্ট বিলি করিয়া, টেণ্ডর তলব দিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার তালিকাই কেন দেখ না ?

১. সিদ্ধি—(ভারতবর্ষীয় গবরমেণ্টের আবকারি বিভাগ হইতে)।
২. তুলসীগাছ—(নর্সারী হইতে। সটনেব বীজ হইতে উৎপন্ন)।
৩. কুশ—(ঐ ঐ)।
৪. কলাগাছ—(শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের)
৫. শালগ্রাম শিলা—(অস্লারদের বাড়ীর)।
৬. গঙ্গামৃত্তিকা—(বরণ কোম্পানীর কারখানার)।
৭. আতপ তণ্ডুল—(গ্রেট ইষ্টার্নের টেবল রাইস)।
৮. কাঁচকলা—(পঞ্চানন্দের নিজের ঝাড়ের) ?'[৫]

রক্ষণশীলতার জন্যই তিনি পরানুকরণের বিরোধী ছিলেন। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি উদার বলা যায়। তিনি মনে করতেন, অনুকরণ সব সময় খারাপ নয়। ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, ঐশ্বর্যে, সুখে, সর্বাংশে বাঙ্গালীর থেকে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং 'বাঙ্গালী যে ইংরেজেব অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালীর ভরসা।' (অনুকরণ-'বিবিধ প্রবন্ধ', পৃষ্ঠা ৭১)।

রক্ষণশীল মনোভাব দেশ ও জাতিব সব কিছুকে অটুট রাখতে চায়। শিক্ষা, বিচার-ব্যবস্থা, সামাজিক নীতি-নিয়মের দিক থেকে ইন্দ্রনাথ সেজন্য তাঁর বিশ্বাস মতো প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যকে বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও ইংবেজের জুবি-ব্যবস্থা, বিচাব প্রহসনেব প্রতি মাঝে মাঝে কটাক্ষ করেছেন। তাঁব 'কমলাকান্তেব জবানবন্দী' গ্রন্থে এর উদাহবণ মেলে। কটাক্ষ করলেও ইংরাজ প্রবর্তিত বিচাব-ব্যবস্থাব গুরুত্বকে বঙ্কিমচন্দ্র অস্বীকার কবেন নি। শিক্ষার প্রশ্নে বঙ্কিম জাতীয় শিক্ষার কথা বললেও, পাশ্চাত্য শিক্ষাকেও অবহেলা কবেন নি। পাশ্চাত্যেব বিজ্ঞান-শিক্ষাকে তিনি অপরিহার্য মনে কবতেন। ইন্দ্রনাথ জোব দিয়েছিলেন বর্ণাশ্রম ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপব, বঙ্কিমচন্দ্রেব দৃষ্টি ছিল জনশিক্ষাব প্রতি। ইন্দ্রনাথেব মনোভাব বুঝবার জন্য সমগ্র বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে বিচাব করা যেতে পারে।

ইন্দ্রনাথ ইংরাজ-চবিত্র, ইংবাজ-শাসন ও ইংবাজ-সভ্যতা সম্বন্ধে মোটেই আস্থাশীল ছিলেন না। সেযুগে অনেকেই ইংবাজেব চরিত্রশক্তি ও শাসন-ব্যবস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও অনেকটা এই ধারণা পোষণ করতেন। ইন্দ্রনাথ ইংরাজেব প্রায় সব বিষয়কেই কটাক্ষ করেছেন। 'সদ্যোপ্রণীত আইন, কোন অচিববিঘোষিত যুদ্ধ, বিচার বিভ্রাটের কোন আধুনিকতম দৃষ্টান্ত, দুর্ভিক্ষ নীতিব কোন টাটকা মিথ্যা প্রচার' প্রভৃতি সবই ইন্দ্রনাথের আক্রমণেব লক্ষ্য হয়েছিল।

'কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র' শীর্ষক চাবটি প্রবন্ধে তিনি ইংরাজের ন্যায়নিষ্ঠার মুখোস খুলে দিয়েছেন। বিদ্রূপাত্মক সাংবাদিকতা হিসেবেও এই রচনাগুলি উপভোগ্য। পরাধীন মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিবোধ, নির্যাতনকারীর দয়া ও করুণার প্রতি নির্মম কটাক্ষপাতে তিনি রচনাগুলিকে সরস করে তুলেছেন। কাবুলিদের উপর চরম নির্যাতনকারী সেনাধ্যক্ষ রবার্টের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন —'লড়াই এইভাবে হইতেছিল; মনে করুন, একজন কাবুলী আমাদের বাসার নিকট দিয়া যাইতেছে, এবং তাহার দুই হাত দুই পাশে ঝুলিতেছে

বা তুলিতেছে। ইংরাজী ভাষায় বাহু এবং অস্ত্রের একই নাম—আর্ম; সুতরাং ইংরেজী মতে সে ব্যক্তি সশস্ত্র শত্রু, যুদ্ধার্থে অগ্রসর, অতএব সাধ্য পক্ষে বধ্য। * * * তিনি (রবার্ট) বলিলেন—দয়ার সহিত বিচারকে মোলায়েম করিতে হইবে; একশ বার ফাঁসি দেওয়া বিচার সঙ্গত হইলেও আমি দয়া করিয়া ইহাকে একবারের বেশী ফাঁসি দিব না। তৎক্ষণাৎ কাবুলীর একবার মাত্র ফাঁসি হইয়া গেল।'

ইন্দ্রনাথ সমস্ত ইংবাজকে এক শ্রেণীভুক্ত কবেছিলেন। সাম্রাজ্য লিপ্সা ও পরের স্বাধীনতা হরণ কবা ছাড়া ইংরাজের আব কোন সদ্‌গুণের পরিচয় তিনি পান নি। ইংরাজেব পররাজ্য গ্রাস ও স্বাধীনতা হবণকে ইন্দ্রনাথ যে ভাবে কটাক্ষ করেছেন, তাকে উঁচুদরের হাস্যরসের পর্যায়ভুক্ত কবা যায়। 'কাবুলস্থ' সংবাদদাতাব পত্র'শীর্ষক প্রবন্ধে ইংরাজদেব কয়েকটি কথার কদর্থ করে তিনি যা বলেছেন তাতে ইংরাজ চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

'আংলো আফগান অভিধান'

শব্দ	অর্থ
রুশ-শঙ্কা—	ভাবতবর্ষকে অবিশ্বাস।
বৈজ্ঞানিক সীমা—	রক্তের নদী এবং হাড়ের পাহাড।
দুর্ভিক্ষ—	যুদ্ধ
শত্রু—	স্বদেশ এবং স্বধর্মের মায়ায় যে প্রাণপণ করে।
সন্ধি—	বন্দী
দেশাধিকাব—	দাঁড়াইতে যতটুকু স্থানের প্রয়োজন, মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই পবিমাণ স্থান পদতলস্থ রাখা।
সেনাপতিত্ব—	এরূপভাবে সৈন্য সংস্থাপন কবা যাহাতে বিপৎকালে একদল অন্য দলেব সাহায্য করিতে না পারে।
অসভ্য জাতি—	যাহাদের সহিত ব্যবহারে সভ্যতার নিয়ম এবং ধর্মের শাসন মানিবার প্রয়োজন থাকে না, এবং যাহাদের শিল্প-মহিমার অপূর্ব চিহ্ন স্বরূপ অট্টালিকাদি ভগ্ন ও গৃহাদি ভূমিসাৎ কবিলে কলঙ্ক নাই।'

ইংরাজ ভারতবাসীকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস কবতো না, সেজন্য শক্তির দ্বারা তাদের দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করতো। ইংরাজের দৃষ্টিতে ভারতবাসী ছিল

অসভ্য, বর্বর। সেকলে থেকে কার্জন পর্যন্ত অনেক ইংবাজ এ-ধারণাই পোষণ করতেন। ইন্দ্রনাথ 'আংলো আফগান অভিধানে' সেই ইংগিতই দিয়েছেন।

ইংলণ্ডে দুটি দল ছিল—একটি রক্ষণশীল (Conservative), অপরটি উদারনৈতিক (Liberal)। বক্ষণশীল দলের ভাবত-বিবোধিতা প্রবাদ বাক্যে পবিণত হয়েছিল। এই দলের দলনায়ক ডিস্‌বেলী ও উদাবনৈতিক নেতা গ্লাড্‌ষ্টোন সে যুগেব এই দুজন বিখ্যাত ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে ভাবতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছিলেন। ডিস্‌বেলী-বিবোধী গ্লাড্‌ষ্টোন ভারত-বন্ধু বলে আখ্যাত হতেন।[৬] সেজন্য ভাবতবাসী বিভিন্ন দাবি আদায়েব জন্য আন্দোলনের পথে না গিয়ে ইংরাজেব সহৃদয়তাব উপব নির্ভব কবেছিলেন। ইন্দ্রনাথ সমস্ত ইংবাজকে, কি উদারনৈতিব, কি রক্ষণশীল কোন দলকেই বিশ্বাস কবেননি। তিনি বুঝেছিলেন, ইংবাজবা এক জায়গায় সবাই এক—সেটা হল সাম্রাজ্য রক্ষা। ইংবাজ ভাবতবাসী সম্বন্ধে একেবাবে নিশ্চিন্ত ছিল না, তাই ভাবতবাসীদেব সম্ভাব্য ব্রিটীশ বিবোধিতা বোধ কবাব জন্য তাবা নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন কবতো। এব কাবণ হিসেবে তাবা উল্লেখ কবতো যে, ভাবতবাসী এখনো অশিক্ষিত, অতএব আইনেব সাহায্যে তাদেব শাসন কবা দবকাব। ইন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বাজনীতিঘটিত বিষয়ে ভাবতবাসী এখনও শিশু। শিশুগণ অতিশয় অব্যবস্থিত হইয়া থাকে। অতএব যথেষ্ট পবিমাণে ব্যবস্থা করিবে। ব্যবস্থাপক সভা যাহাতে নিত্য নিত্য নূতন আইন প্রসব করিতে পারেন, তাহাব উপায় কবিবে। ছেলেব শাসন চাই, কারণ শিক্ষার মূল শাসন।

ভাবতবাসী জানে, ছত্রদণ্ডই রাজচিহ্ন। যেদিকে দেখিবে, অসন্তোষেব রৌদ্র চিন্ চিন্ কবিয়া উঠিতেছে, কিম্বা নয়নজলেব বৃষ্টি পডিতেছে, সেইদিকে বিলাতী বিক্রমেব ছত্র ধবিবে। আব, দণ্ড দুচোখো, সম্মুখে যাহাকে পাইবে, তাহাকেই বসাইবে। ভারতবাসী জানে, বসাইলে শাসন হয়, সম্মানও।'

এ-ছাড়া পুলিশ আদালত, জুরি ব্যবস্থা বিচাব সংক্রান্ত বিষয়, ইল্‌বার্ট বিল প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি বিদ্রূপগর্ভ অথচ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ কবেছিলেন।

'পুলিশ আদালত' শীর্ষক রচনায় তিনি ইংরাজ চরিত্রের ন্যায়পরায়ণতার মুখোস খুলে দিয়েছেন। 'নেয়ারণ' নামক একজন জাহাজী গোবা একজন ভারতীয়কে হত্যা করাব জন্য বিচারপতি হোয়াইট কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বারজন ইংরাজ এই নিষ্ঠুব আদেশ প্রত্যাহারেব জন্য পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের

নিকট আবেদন করে। এ-প্রসঙ্গেই ইন্দ্রনাথ তাঁর স্মরণীয় ব্যঙ্গ-রচনাটি লিখেছিলেন।

সেযুগে হোয়াইট-এর মত দু' একজন নিরপেক্ষ বিচারককে কিভাবে ইংরাজ সমাজ অপদস্ত করতো, ইন্দ্রনাথ এই রচনায় সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই উল্লেখযোগ্য রচনাটির শেষাংশটি লেখকেব স্বদেশপ্রীতি ও মমত্ববোধের জন্য বিশেষ উপভোগ্য—'ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা করিয়া ও স্বীয় ক্রোড-কুক্কুরেব সহিত বিস্তব পরামর্শ করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, বিবেচনাপূর্বক আগামী এজলাসে উচিত আদেশ করিবেন। আদালতে এ প্রকার জনতা হইয়াছিল যে, তিল-ধাবণের স্থানতো ছিলই না, ঠেলাঠেলিতে তিনটা কালো-আদমির প্লীহা ফাটিয়া স্থানটি নিতান্ত অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল। মিউনিসিপেল সীমানাব ভিতব এরূপ ময়লা কবার নিমিত্ত প্লীহাফাটাদেব আত্মীয়গণেব উপব গ্রেপ্তারি পবওয়ানা বাহিব হইবার হুকুম হইবাব পব, আদালত অন্যান্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।' প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এ-সব বচনায তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেব 'কমলাকান্তেব দপ্তব' ও 'লোকবহস্যেব' দ্বাবা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইংবাজের উচু-নিচু আদালত সমন্বিত বিচাব-ব্যবস্থাকে ইন্দ্রনাথ দোকানেব সঙ্গে তুলনা করেছেন—'ভাবতবর্ষে বিচাবের দোকান আছে; এই সকল দোকানেব প্রচলিত নাম আদালত। যে যেমন খবিদ্দাব অর্থাৎ যে যেমন দব দেয়, সে তেমনি আদালত পায়। সেই জন্য আদালতেব শ্রেণী বিভাগ আছে।' জুবি-ব্যবস্থাকে তিনি একাবণে নিন্দা কবেছেন যে, অধিকাংশ নির্বাচিত জুবি বিচাব-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একেবাবেই অজ্ঞ। টাকার জোবে এবং ইংবাজ-প্রীতিব ফলে তাবা জুরি নির্বাচিত হয়। ইংরাজ বিচাবকেব কথা মেনে চলাই তাদেব একমাত্র কাজ।

'দণ্ডনীতির' নামে ইংবাজ-সম্প্রদায়েব প্রতি পক্ষপাত, ব্যয় সংক্ষেপের নামে ব্যয় বাহুল্যকেও তিনি নিন্দা কবেছেন। অবশ্য 'ইল্‌বার্ট বিলে' (১৮৮২) এই বৈষম্য রোধ কবাব চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু, ইন্দ্রনাথেব দৃষ্টিতে সেটা লোক-দেখান একটা চেষ্টা মাত্র। ইংরাজেব ইচ্ছা ও সহৃদয়তা থাকলে নিশ্চয়ই এই বিল আইনে পরিণত হতে পারতো। দুটি সর্গে বিভক্ত 'ইল্‌বার্ট বিল' শীর্ষক কবিতাটি 'গর্ভসঞ্চার' ও 'সাধভক্ষণ' এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছিল। এর সঙ্গে 'ইল্‌বার্ট বিলের পরিণাম' শিরোনামা দিয়ে একটি ব্যঙ্গ-চিত্রও প্রকাশিত হয়েছিল।[৭] সেখানে দেখান হয়েছিল যে, একজন গোবা—জনবুল জনৈক দেশী

বিচারকের বুকে পদাঘাত করছে, বিচারকের হাতে একটি সুতো—তিনি সেটা প্রাণপণ আঁকড়ে ধবে আছেন। ছবিটির নীচে লেখা হয়েছিল—

'জনবুল। (বাবুকে লাথি মারিয়া) কালা নিগার, টুই হামার বিচার করিবে ? আঁ ? মার্ লাথ্ ড্যাম্ কালাকো !

বাঙ্গালীবাবু। (পতনোন্মুখ) যা ভেড়ে, এই দেখ, সূত্র ছাড়িনি।

John Bull (Kicking a Babu) D—d nigger, you wanted to try me, did'nt you ! Is this your fav'rite Bill !

Babu (losing his balance) Go, go, I hav'nt let go the principle,'

ইংবাজ কূটনীতি ও বাজ্য শাসনে পাবদর্শী, কিন্তু ইন্দ্রনাথেব মতে এই শাসননীতি অনেক সময় অজস্র মানুষেব জীবনহানিব কাবণ হয়েছিল। দেশে তখন দুর্ভিক্ষ প্রায়ই লেগে থাকতো। ইংরাজ শাসক-গোষ্ঠী সুকৌশলে সে কথা অস্বীকাব কবে নিজেদেব দোষ-স্খালনেব চেষ্টা কবতেন। 'দুর্ভিক্ষ' শীর্ষক একটি রচনায় ইন্দ্রনাথ 'দুর্ভিক্ষ হইযাছে কি হয় নাই' প্রসঙ্গে ইংবাজেব যুক্তি সমর্থন করাব ছলে তীব্র নিন্দা কবেছেন—

'দুর্ভিক্ষ হইলে মানুষ মরিত। কিন্তু মানুষের মত মানুষ একটাও মরে নাই। সুতবাং দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

দুর্ভিক্ষ হইলে কেহ বারিষ্টাব প্রতিপালন করিত না, সেই টাকা দিয়া কাঙ্গাল দুঃখীর প্রাণ বাঁচাইত, অতএব দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

দুর্ভিক্ষ হইলে গলাব তেজ থাকিত না, চিঁ চিঁ করিত। কিন্তু সভা-সমিতি সমান চলিতেছে, বক্তার বিবাম নাই, অতএব দুর্ভিক্ষ হয় নাই।'

ইংরাজেব সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণনীতিব মুখোস খুলে দিয়ে ইন্দ্রনাথ দেশ ও জাতির এক মহৎ উপকার করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইংরাজেব কিছু কিছু প্রগতিশীল নীতিকে তিনি যেভাবে আক্রমণ করেছিলেন তাকে সব সময় সমর্থন কবা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র এ-বিষয়ে অনেক উদার মনোভাবেব পবিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাঙ্গালি ইংরাজি শিখেই 'স্বাধীনতা' ও 'স্বতন্ত্রতা' কথা দুটি শিখেছে। ('ভাবতবর্ষেব স্বাধীনতা ও পরাধীনতা'—'বিবিধ প্রবন্ধ,' পৃঃ ১৩৮)। ইংবাজ খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারতে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন কবেছিল। ইংরাজি শিক্ষা আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছে। এই ভাষার মাধ্যমে জাতীয়-সংহতি দেখা দেওয়ায়

সংঘবদ্ধভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। ইংরাজি শিক্ষা আমাদের মনের অনেক কুসংস্কার দূর করতে সাহায্য করেছে, জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধান দিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তা অনেকদূর প্রসারিত করেছে। ইংরাজের বিচার-ব্যবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল সত্য, কিন্তু তা পূর্ববর্তী বিচার-ব্যবস্থা থেকে অনেকটা যে উৎকৃষ্ট, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জুরি-ব্যবস্থার সুফল এবং কুফল দুইই আছে। অনেক ভারতীয় নেতাও তখন জুরি-ব্যবস্থার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

ইন্দ্রনাথ ইংরাজকে যেমন সমর্থন করেননি, তখনকার স্বদেশী ভাবের প্রতিও তেমনি অসমর্থন জানিয়েছিলেন। কারণ, এই স্বদেশীদের উপর তিনি আস্থাশীল ছিলেন না। 'স্বদেশী' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন 'অনেক সামগ্রী দুই রকম দেখিতে পাওয়া যায়,—আসল আর নকল। আমার মনে হয় যে, এখনকার এই স্বদেশীটা আসল স্বদেশী নহে, ইহা নকল স্বদেশী। ইংরেজী পড়িয়া শুনিয়া, জাপানী ভাবিয়া ভাবিয়া, এইসকল স্বদেশীর সৃষ্টি করা হইতেছে।

*   *   *

যাঁহারা স্বদেশীর পাণ্ডা, তাঁহারা প্রায়ই ইংরেজের ফেন-চাটা। আজন্ম তাঁহারা ইংরেজের ফেনই চাটিয়াছেন, এখন তাঁহারা মনে করেন যে, ফেন চাটিয়া আমরা মানুষও হইয়াছি। এসব লোককে লইয়া কি দেশের উদ্ধার হইতে পারে? আমার ধারণা এই যে, চরিত্রহীন পুরুষের দ্বারা কোনও কাজেরই সিদ্ধি হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ফেন-চাটাই যে চরিত্রহীন, বোধকরি. সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন! দেখুন না কেন, যাঁহারা স্বদেশীর পাণ্ডা, তাঁহারা প্রায়ই চাকুরিয়া নহেন, অন্য যে কোনও প্রকারে হউক জীবিকা-নির্বাহ করেন। ইহাদের চাকুরী থাকিলে, ইহারা স্বদেশী হইতে পারিতেন কি? এখনই যদি ইহারা চাকুরী পান, তাহা হইলে ইহারা স্বদেশী থাকেন কি?'[৮]

১৮৮৫ খৃঃ জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টির সূচনা থেকেই জাতীয় নেতারা আবেদন-নিবেদন নীতি গ্রহণ করেন। কেননা, ইংরাজি শিক্ষিত এবং ইংরাজের ন্যায়-নীতির প্রতি আস্থাবান ব্যক্তিরাই এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন। ইন্দ্রনাথ এজন্য 'কঙ্গরস' শীর্ষক একটি ব্যঙ্গ-রচনায় বলেছেন—'কঙ্গরসটা হইতেছে ভারত ভোলানী মেলা। ভারত এখন পতিত। তাকে একটু টেনে টেনে তোলা, তাই দশে মিলে সুতরাং মেলা! এখন ঐ তোলাটা একটু

আধটু তোলা নহে, একেবারে তেতালায় তোলা। কঙ্গরসে গোড়ায় গড়াগড়ি, তাহার পর হুড়াহুড়ি, তাড়াতাড়ি, বিলাতী ছড়ি, তাহার পর দৌড়াদৌড়ি, অবশেষে যে যার আপন আপন বাড়ী।' আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান প্রধান কংগ্রেস নেতারা ছিলেন উদারনীতিতে বিশ্বাসী। আন্দোলনের পথে না গিয়ে, আবেদন-নিবেদনের সাহায্যে তাঁরা বিভিন্ন দাবি আদায়ের চেষ্টা করতেন। কারণ, ইংরাজদের উপর তাঁদের বিশ্বাস ছিল বেশি। তাছাড়া, জাতীয় কংগ্রেসের অনেক নেতাই ছিলেন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'ভুক্ত। আগেই বলেছি, অনেক ভারতীয় নেতার গ্লাড্‌ষ্টোন-প্রীতি ছিল।[৮] তাঁদের ধারণা ছিল, রক্ষণশীল মন্ত্রীসভার পতন হলেই ভারতের সৌভাগ্যের দিন আসবে। ইন্দ্রনাথ সেকথা বিশ্বাস করতেন না। 'বৈঠকী আলাপে' পঞ্চানন্দের সঙ্গে একজন বাবুর কথোপকথনে সেকথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রথম যুগের কংগ্রেস নেতারা ভুলেই গিয়েছিলেন যে নতুন যারা আসবে, তারাও ইংরাজ। কিন্তু মোহগ্রস্তের মতো রাজভক্তি ভিক্টোরিয়া-ভক্তি তখনও তাঁদের অটুট। তারপর অনেক আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হবার পর, জাতীয় নেতারা অবশেষে আন্দোলনের কথা তোলেন। এতদিনের বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস কাটিয়ে আন্দোলনের পিচ্ছিল, রক্তাক্ত পথে নামা কি তাদের পক্ষে সম্ভব? তাই তাঁদের আন্দোলনের ধ্বনি বক্তৃতাসর্বস্বতা ও মেকি বীরত্বের শূন্যগর্ভ আস্ফালনে পরিণত হয়েছিল। ইন্দ্রনাথের 'ভারত উদ্ধার' কাব্য এই পটভূমিতেই রচিত।

বেকার বিপিনকৃষ্ণ ও বন্ধু কামিনীকুমারের মনে স্বদেশ উদ্ধারের প্রেরণা জাগে। 'আর্য কার্যকারী সভা'য় এ বিষয়ে প্রস্তাবও গৃহীত হয়। বিপিনকৃষ্ণের নেতৃত্বে সভ্যরা যেরূপ বেশভূষা করে দেশোদ্ধারের উদ্যোগ করেছে, সেই বর্ণনাটি উপভোগ্য।

'কোঁচান কাপড় কেহ করি পরিধান,
পরিয়া পিরান, গায় কোচান উড়ানী
বুকের উপরে বাঁধি ফুল উঁচু করি,
ইজের চাপকান কেহ কার্পেটের টুপি,
যাহার যেমন ইচ্ছা সাজিয়া উল্লাসে
ভারত-উদ্ধার ব্রতে উৎসৃজিলা তনু।'

সে যা হোক, ভারতোদ্ধার বাহিনী নানা জায়গায় আস্তানা গেড়ে দেশোদ্ধারের আয়োজন কবতে লাগল। প্রচুর সুঁদবি কাঠ সংগ্রহ করা হলো, তা দিয়ে কাঠের বাটওয়ালা হাজার হাজার বঁটি তৈরী হল, কারণ দেশোদ্ধারকারীদের প্রতিজ্ঞা 'বঁটাইয়া দিব যত পাষণ্ড ইংরাজে।' বাঁশের অসংখ্য পিচকারিও তৈরি করা কবা হল। এদিকে চিৎপুবের খাল থেকে ফোর্ট উইলিয়ম পর্যন্ত গোপনে একটা সুরঙ্গও কাটা হয়ে গেল, প্রচুব লঙ্কা সংগ্রহ কবে সেগুলি সুবঙ্গেব মুখে বেখে পট্‌কাব সল্‌তে তাব সঙ্গে লাগিযে দেওয়া হলো। ক্রমে যুদ্ধেব নির্দিষ্ট দিন ঘনিযে এলে বিপিনকৃষ্ণ স্ত্রীব কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে কেঁদেই ফেল্ল। অবাক স্ত্রী স্বামীর দেশোদ্ধারের কথা শুনে বল্‌লে—

'বলি প্রাণনাথ
দেশতো দেশেই আছে, কি তার উদ্ধাব ?'

যাক্ স্বামীকে যুদ্ধে যেতে দিতে বাজী হয়ে অবশেষে সে বললে—

"নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়-বল্লভ
নিতান্ত দাসীব কথা না রাখিবে যদি
আলুভাতে ভাত তবে দিই চডাইয়া
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।'

তার পবেব ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। বিপিনকৃষ্ণেব নেতৃত্বে বাঙ্গালী বীরেরা বঁটি বালিগোলা পিচকাবি নিযে যুদ্ধে গেল। বালিগোলা জল ও সল্‌তে জ্বেলে লঙ্কাব স্তূপে আগুণ দিয়ে তাবা ইংবাজ সৈন্যদেব কাবু কবে ফেলল। ইংরাজেরা পরাজিত হযে সন্ধি কবতে বাধ্য হল। সন্ধিব সর্তটিও চমৎকার—

'শান্তিব প্রস্তাব সবে কবিল অরাতি,
উকীল সম্মতি দিল, হইল নিযম
দেশে না যাইবে কেহ ইংবেজ যতেক
অনুমতি না লইয়া, থাকিবে ভাবতে
ভৃত্যভাবে ভারতেব করিবেন সেবা।'

এ হলো ইন্দ্রনাথের একটি দিক। এ-ছাডা আবো একটি দিক আছে। আগেই উল্লেখ কবেছি, ইন্দ্রনাথ খুব বেশি বকমের বক্ষণশীল ছিলেন। তিনি হিন্দুর সমস্ত সংস্কারকে বজায় বাখার পক্ষপাতী ছিলেন। বিলাত যাত্রারও তিনি বিরোধী ছিলেন। বর্ণাশ্রমীদের পক্ষে বিধবা বিবাহের ভয়ানক শত্রু ছিলেন। তাছাড়া, সহমরণ, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতিরও প্রধান সমর্থক

ছিলেন তিনি। 'বিলাত যাওয়া' শীর্ষক নিবন্ধে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে—'যাঁহারা সমাজ সংস্কারক, তাঁহারা বিলাত যাওয়ার পোষকতা করুন, কিন্তু যাঁহারা সামাজিক, তাঁহারা যেন বিলাত যাওয়ার অনুমোদন না করেন। যিনি সমাজ ছাড়িবেন, তিনি বিলাতই যাউন, আর স্বর্গেই যাউন, তাহাতে আমাদের কিছু আইসে যায় না। আমাদের সমাজ ভালই হউক, আর মন্দই হউক, এই সমাজের দোষগুণ মাথায় করিয়া যিনি সমাজে থাকিতে চাহেন, তাহারই জন্য এ কথার অবতারণা করা হইয়াছে।'

'বিধবা বিবাহের' জন্য তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও কটাক্ষ করেছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা মেয়ের বিয়ে হওয়ায় তাঁকে লক্ষ্য করে ইন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণ নূতন ব্যাপার নহে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণাশ্রমীদেরই ইহা নিষিদ্ধ। ইতর লোক যাহারা বিধিনিষেধের বহির্ভূত, তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে, সুতরাং বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণে নূতনত্ব কিছুই নাই। কোনো কোনো ব্রাহ্মণ-সন্তান অধঃপাতে গিয়াছে, এখনও যাইতেছে, পরেও যাইবে—তাহাতেও নূতনত্ব কিছুই নাই। দুই দিনের ধন সম্পদ তৃণ তুল্য জ্ঞান করেন, এমন লোক এখনও বিস্তর আছেন, তবে আর ভয়ের কারণ কি? বরং যদি এই উপলক্ষে সাচ্চার বিচার আবার উঠে, তাহা হইলে, আমিত মনে করিব যে, আবার আমাদের উপর জগদম্বার কৃপাকটাক্ষ পড়িয়াছে।'[৯]

শিক্ষা সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথের নিজস্ব একটা পরিকল্পনা ছিল। তিনি মনে করতেন, তথাকথিত ইংরাজি শিক্ষার ফলে ইন্দ্রিয়সেবাই শুধু বাড়ে—প্রকৃত উন্নতি হয় না। এই 'ম্লেচ্ছ শিক্ষা'র ইন্দ্রিয় সর্বস্বতার জন্য জাত নষ্ট হয়। 'আমরা সাবান দিয়া শৌচকর্ম করি, সাবান সুগন্ধ আছে; সাবান সদৃশ্য। তাই আমরা ভুলিয়া যাই যে, সাবান অশুচি। চর্বিতে অশৌচ বাড়ায়। কিন্তু আমরা এখন ঠিক উল্টা কাজ করি। তাহাতেই শৌচে সাবান ব্যবহার করি। পিপাসা হউক আর না হউক, আমরা মুসলমানের কি মেথরের জল খাইতেও কুন্ঠিত হই না। পয়সা খরচ করিয়া লেমনেড খাই, আর জাতি খোয়াই।' ম্লেচ্ছ শিক্ষার হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য তিনি স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা করেছিলেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ছটি প্রবন্ধ ও একটি পরিশিষ্টে এবিষয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। তাঁর মতে সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-ব্যবস্থায়

'আমাদের কার্যসিদ্ধি, আমাদের আত্মরক্ষা হইবে কেমন করিয়া? পরতন্ত্র শিক্ষায় অন্যের যদি কুলায় কুলাউক—আমাদের কিন্তু কুলায় না।' ইন্দ্রনাথ যে স্বতন্ত্র শিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন, তা জাতিভেদ ও বর্ণভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ধারণা ছিল, প্রাচীন ভারতের মত বর্ণাশ্রমধর্মী শিক্ষার পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে পারলেই দেশের সামগ্রিক উন্নতি হবে। 'বিশেষতঃ বর্ণাশ্রমীদেব ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে আবশ্যক। ব্রাহ্মণ শূদ্রে ভেদ, ব্রাহ্মণের ধর্মে আব শূদ্রেব ধর্মে ভেদ, ব্রাহ্মণেব জীবিকায় আর শূদ্রেব জীবিকায় ভেদ,—বর্ণাশ্রম সমাজ এই সকল ভেদ রক্ষা কবে বলিয়াই অন্য অন্য সমাজ হইতে বর্ণাশ্রম সমাজের ভেদ আছে। এ ভেদ যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম সমাজও নষ্ট হইবে। আবার যদি আমাদের শুভদিন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই বর্ণাশ্রম সমাজেব পরিচয়ে পবিচিত হইয়াই যেন আমরা গর্ব-গৌবব কবিতে পারি। নহিলে বর্ণাশ্রম ভেদ নষ্ট কবিয়া ম্লেচ্ছ-যবনাদির সঙ্গে একাকাব হইয়া, অর্থাদি বিষয়ে আমাদেব প্রাধান্য হইলেই বা কি আব না হইলেই বা কি, অতএব 'আয়তনেব' দল বিবেচনা কবিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ-সন্তানকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপদেশ কবিয়া ব্রাহ্মণেব শৌচ-আচার-উপাসনাব অনুষ্ঠান দ্বারা শৌচ-আচার-উপাসনা অভ্যাস করাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে জীবিকাব জন্য যেমন অন্য অন্য বিদ্যা শিখাইতে হইবে, শূদ্র সন্তানকেও সেইরূপ শূদ্র ধর্মাদিব উপদেশ করিয়া এবং আচাবাদি শিখাইয়া অন্য অন্য বিদ্যা শিখাইতে হইবে।'[১০] ইন্দ্রনাথ মনে করেন, অতীতে বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা-নীতি নির্দিষ্ট ছিল, তাব ফলে তাদের উন্নতি সম্ভবপর হয়েছিল। বর্তমানেও তা করা দবকাব। 'যে স্বতন্ত্র শিক্ষার গুণে আমাদেব সমাজে শান্তিব সুধাধাবা প্রবাহিত হইত, সেই স্বতন্ত্র শিক্ষা পুনঃ প্রবর্তিত হইলেই আবার সুখী হইতে পারিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর, সেই স্বতন্ত্র শিক্ষা ভিন্ন, সে সুখলাভের উপায়ন্তর নাই, ইহাও নিশ্চয়। আবার বর্ণাশ্রমেব সুব্যবস্থায় আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে, আবাব এ-সমাজে সন্তোষ ধর্মের সদ্‌ব্রাহ্মণের পূজা যাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সমাদর যাহাতে সমৃদ্ধ হয়, এবং মর্যাদা যাহাতে মানসে মুদ্রাঙ্কিতবৎ হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভগবান শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইলে বৈদিক ধর্ম রক্ষিত হইবে, যেহেতু বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্রাহ্মণত্বের অধীন।'[১১] এই বর্ণভেদ জাতিগত ও জন্মগত। অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ যে বর্ণাশ্রমের কথা বলেছেন, তাতে ব্রাহ্মণই হচ্ছে প্রধান বর্ণ। অন্যান্য বর্ণের ক্রম পর্যায়ও ঠিক বজায় রেখে এগিয়ে যেতে পারলে

উন্নতি নাকি অপরিহার্য। জন্মের দ্বারা কর্মশিক্ষার ব্যবস্থা না হলে কর্মশিক্ষাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই যে যার নির্দিষ্ট বর্ণ অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করবে। 'জন্মের দ্বারা কর্মশিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে কর্মশিক্ষাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব মনে বাখিতে হইবে যে, কর্ম অনুসারে বর্ণভেদ হয় না, বর্ণভেদ অনুসারেই কর্মভেদ হয়। আর সেই বর্ণভেদ জাতিব দ্বারা অর্থাৎ জন্মের দ্বারা নিরূপিত হয়। 'জাত্যা ব্রাহ্মণঃ, জাত্যাশূদ্রঃ' ইত্যাদি রূপ প্রয়োগেব ইহাই অর্থ। বর্ণাশ্রম-সমাজ জাতিভেদের উপব প্রতিষ্ঠিত, একথার প্রকৃত অর্থ এই যে, বর্ণাশ্রম-সমাজ বর্ণভেদের উপব প্রতিষ্ঠিত এবং সেই বর্ণভেদ জাতিভেদের দ্বারাই অর্থাৎ জন্মভেদেব দ্বাবাই লক্ষিত হয়। গুণ-কর্মভেদেব উপরেই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত, ইহা ঠিক নহে। ববং বলিতে পারা যায় যে, জাতিভেদের উপবেই গুণ-কর্মভেদ প্রতিষ্ঠিত। এস্থলে গুণ শব্দে গুণবীজ (গুণেব Potentiality) বুঝিতে হয়। অর্থাৎ জন্ম দেখিয়াই ধবিয়া লইতে হয় যে, জাতকে অর্থাৎ গর্ভস্থভ্রূণে এবং ভূমিষ্ঠ শিশুতে পিতৃ-মাতৃ বর্ণসুলভ গুণের বীজ আছে। ব্রাহ্মণ-সন্তানে ব্রাহ্মণোচিত গুণবীজ আছে, শূদ্র সন্তানে শূদ্রোচিত গুণবীজ আছে ইত্যাদি। এবং এই গুণ সম্ভাবনাকে আশ্রয় করিয়াই, সেই ভ্রূণেবও পরে শিশুর সংস্কাবাদি সম্পন্ন কবিতে হয় এবং কর্মেব শিক্ষা দিতে হয়। সাধুবৃত্তিই হউক কিংবা অসাধু বৃত্তিই হউক বৃত্তি অবলম্বনেব বহু পূর্বেই গুণ এবং কর্মস্থির কবিয়া লইতে হয়, বৃত্তি অবলম্বনের পব গুণ বা কর্ম নিরূপণ কবিতে হয় না। প্রত্যেক বর্ণেরই গুণ ঈশ্বব নিরূপিত এবং প্রত্যেক বর্ণের কর্মও ঈশ্বরের বিহিত। জাতি দেখিয়াই অর্থাৎ জন্ম অনুসারেই, গুণ ধবিয়া লইতে হয় এবং কর্ম অবলম্বন করিতে হয়।'[১২]

ইন্দ্রনাথ উপবিউক্ত শিক্ষা-পরিকল্পনা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। ব্রাহ্মণ সমাজের পুনরভ্যুত্থানের ফলে বর্ণাশ্রম ধর্ম আবাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সেজন্য ব্রাহ্মণ-সমাজের অধঃপতন দেখে তাদের পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি 'নবদ্বিজ-সমাজ' প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস আব সত্য এক জিনিস নয়। ইন্দ্রনাথের পরিকল্পনার মধ্যে যতই নিষ্ঠা থাকুক না কেন, তা বর্তমান যুগে একেবারে অচল। ভারত বিশাল দেশ, এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের বাস। শুধু হিন্দুদের জন্য আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা করা বিভিন্ন দিক থেকে যেমন অসম্ভব, নীতিগত দিক থেকেও তেমনি সমর্থনীয় নয়। সাবান মাখলে যদি অহিন্দু

কাজ করা হয়, সোডা লেমনেড খেলে যদি জাত যায়—তবে এই স্বতন্ত্র শিক্ষার ফলে ভারতের ধর্মসমন্বয় একেবারে মাটিতে মিশে যেতো—হিন্দুধর্মও অনেকগুলি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়তো। তাছাড়া, তিনি জন্মের উপব শুধু গুরুত্ব দিয়ে গুণ ও কর্মকে তাব অধীন করবার চেষ্টা করেছিলেন। নিম্নবর্ণেব কোন মানুষ গুণ ও কর্মদ্বাবা উন্নতি লাভ করলে উচ্চবর্ণের সম-মর্যাদালাভ কবতে পারে না—এই মতবাদ ঘোষণা কবে তিনি সঙ্কীর্ণতার পবিচয় দিয়েছেন। তিনি মনে কবতেন, 'প্রকৃত কথা এই যে, জন্মগুণে যাহার যে প্রকার প্রকৃতি লাভ হয়, এক জন্মে সে প্রকৃতিব উৎকর্ষ করিতে পারা যায় না, কিন্তু কর্মদোষে অপকর্ষ কবিতে পাবা যায়। যিনি শূদ্র হইয়া জন্মিয়াছেন, তিনি সেই জন্মে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইতে পারেব না। কিন্তু যিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিয়াছেন, তিনি কর্মদোষে সেই জন্মেই শূদ্রত্ব পাইতে পাবেন।' এ-ধারণা খুবই মাবাত্মক ও বৈষম্যমূলক। যেখানে মানুষ হাতে হাতে ফল পেতে চায়, সেখানে জন্মান্তবেব দোহাই দিয়ে তাদেব ন্যায্য দাবীকে প্রত্যাখ্যান কবাব মধ্যে কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। তাছাডা শূদ্রেব জন্য শূদ্রের শিক্ষা, ব্রাহ্মণেব জন্য ব্রাহ্মণেব শিক্ষা—এবকম ব্যবস্থাও যুগোচিত নয়। জন্মসূত্রেই প্রত্যেক মানুষেব প্রকৃতি একেবাবে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে—এ রকম মতবাদ সমর্থন করা যায় না। অথচ ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস কবতেন, শূদ্র, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুতে গডা বলে তাদেব শিক্ষাও সেবকম হওয়া দবকাব। 'তবে আব একবাব বলিয়া বাখা ভাল যে, শূদ্রেব সন্তানকে ব্রাহ্মণেব শিক্ষা দিলেও সে শূদ্র-সন্তান কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পাবিবে না। কেননা, শূদ্রেব ধাতু পৃথক, আব ব্রাহ্মণেব ধাতু পৃথক। শূদ্রেব শূদ্র ধাতুতে যতটা খাইদ, আর যে প্রকার খাইদ,—ব্রাহ্মণ খাইদ পবিমাণেও তত নহে, প্রকাবেও তেমন নহে। আবাব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ছাডা আর যত মানুষ আছে, তাহাদের ধাতুই অন্য প্রকাব।'[১৩] যুগ ইন্দ্রনাথেব এই মনোভাব সত্য বলে গ্রহণ কবেনি। এমনকি সে যুগেও এব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছিল। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধগুলি বেরুবাব পব আলোচনা শুরু হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বসুমতী' পত্রিকায় ইন্দ্রনাথেব কিছু কিছু মতের সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ইন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রবাবুব প্রবন্ধ ১৩১২ সালের ২৪শে চৈত্র তারিখেব 'বঙ্গবাসী'-তে উদ্ধৃত হয়। ক্ষিতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মূল বক্তব্য ছিল দুটি। প্রথমতঃ, গুণ-কর্মের

উপব জোর না দিয়ে জন্মের উপর জোর দেওয়া ঠিক নয়। তাঁব বক্তব্য: 'আলোচনার ফলে আমি যতদূব বুঝিয়াছি. তাহাতে বোধ হয়, জাতিভেদ সম্বন্ধে মনুসংহিতাব মন্ত্র এই যে, গুণকর্মভেদের উপরেই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়াও কর্তব্য। পুণ্যের পুবস্কার এবং পাপেব শাস্তি অস্বীকাব কবিলে সমাজের অস্তিত্বের মূলে কুঠাবাঘাত কবা হয়। ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ কবিয়া এক ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণেব উপযুক্ত কর্ম করে, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণেব পদবীতে বক্ষা কব এবং উপযুক্ত মর্যাদা দাও; কিন্তু যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিযা ব্রাহ্মণেব অনুপযুক্ত মদ্য পান, ব্যভিচাব, প্রতারণা প্রভৃতি কর্মে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাকে যদি ব্রাহ্মণত্ব হইতে নামাইয়া দেওয়া না হয়, তবে পাপের দণ্ড কোথায়? সমাজেব বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতব পাপের দণ্ড সমাজের হস্তে থাকা কর্তব্য। যে সমাজ দণ্ড দিতে ভয় পায় বা অক্ষম, সেই ভীরু কাপুরুষ ও দুর্বল সমাজের মৃত্যুই শ্রেয়।...সমাজকে সজীব কবিতে ইচ্ছা হইলে ন্যায়েব পুবস্কাব এবং অন্যায়েব প্রতিবিধান উপায় রাখিতেই হইবে। জন্মানুসাবে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইবার একটি প্রধান কারণ আলস্য। এইরূপ জাতিভেদের উপব দণ্ডায়মান সমাজে সজীব আবশ্যক নাই।' তিনি আরো বলেন, স্বজাতিব মধ্যে নয়, বিভিন্ন জাতিব মধ্যেও যদি সদগুণ দেখা যায় তবে তাকে সেরকম মর্যাদা দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ তিনি গ্লাডষ্টোনের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তাকে সহজেই ব্রাহ্মণত্বেব মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। তারপর তিনি মন্তব্য করেন, গো-খাদক ম্লেচ্ছ জাতিকে অবজ্ঞা করা মোটেই উচিত নয়। পবজাতিবিদ্বেষ যত কম হয়, ততই আমাদের মঙ্গল। জাপানের উন্নতিকে গুরুত্ব না দিয়ে ইন্দ্রনাথবাবু গুরুতব ভুল করেছেন। পার্থিব উন্নতিকে অস্বীকার কবলে আধ্যাত্মিক উন্নতিও ব্যাহত হয়। এই মনোভাবের ফলে আমাদের অধঃপতন হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্রনাথবাবু অনন্তকাল থেকে বর্ণাশ্রম-সমাজের যে শ্রেষ্ঠতা দেখিয়েছেন, তা তিনি সমীচীন বলে মনে করেন নি। ক্ষিতীবাবুর মতে, অনাদিকাল আমরা বর্তবান শরীরে ছিলামও না এবং অনন্তকাল থাকবোও না। সুতরাং 'বর্ণাশ্রম সমাজের চিরঅস্তিত্ব বিষয়ক যুক্তির যাথার্থ পরীক্ষা আমাদের পক্ষে দুর্ঘট।' তিনি মনে করেন, বর্ণাশ্রম এদেশে এখনো টিকে থাকার কারণ এদেশের মাটির গুণ। এখানকার মানুষ পরিবর্তনকে ভয় করে বলেই এ ব্যবস্থা এখনও অটুট

আছে। 'যে দেশে পরিবর্তন-মাত্রেই সসঙ্কোচে দৃষ্ট হয়, যে দেশের অধিবাসীগণ বসিতে পাইলে দাঁড়াইতে চাহে না, সে দেশে যে কোন প্রথা, অনিষ্টকর হউক ইষ্টকর হউক, প্রয়োজনীয় হউক বা অনাবশ্যক হউক, একবার কোন সূত্রে প্রচলিত হইয়া গেলেই তাহার চির প্রতিষ্ঠা লাভ কবা কিছু আশ্চর্য কথা নহে। যে যুক্তি বলে ইন্দ্রনাথবাবু আমাদের দেশের বর্ণাশ্রম-সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, সেই যুক্তি বলে বোধ হয় প্রত্যেক সমাজ অন্তত প্রত্যেক সভ্য সমাজ নিজ নিজ সুপ্রতিষ্ঠা ও অটুটত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ।' পরিশেষে তিনি বলেন, বর্ণাশ্রমধর্মী শিক্ষা-ব্যবস্থা নয়—বাল্যবিবাহ বোধ ও ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে আমাদের দেশের হারান শান্তি আবাব ফিবে আসতে পারে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রবন্ধের প্রত্যুত্তবে বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্গের কোন ব্যক্তি ব্যভিচার প্রভৃতি অন্যায় কবলে তাদের নিম্ন বর্ণে নামিয়ে দেওয়া যেতে পাবে ; কিন্তু নিম্ন বর্ণেব কোন ব্যক্তি মহৎ কাজ কবলেও ইহজন্মে উচ্চবর্ণের পর্যায়ভুক্ত হতে পারবে না।

ক্ষিতীন্দ্রবাবুর বক্তব্য খুবই যুক্তিপূর্ণ। আব একটি কথা, ইন্দ্রনাথ শুধু বর্ণাশ্রমীদেব শিক্ষাব কথাই বলেছিলেন, কিন্তু বর্ণাশ্রমেব বাইরেও যে অজস্র মানুষ আছে, তাদেব কোন কথাই তিনি বলেন নি। কাজেই সব দিক থেকে তাঁর এই মনোভাবে যতটা গোঁড়ামি প্রকাশ পেয়েছে, যুক্তি-বিচার তেমন ফোটেনি। তিনি যে হিন্দু-পুনবভ্যুত্থানেব স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা অনেকটা ব্রাহ্মণ্য পুনবভ্যুত্থানেব দিকেই সরে গিয়েছিল। এজন্যই হয়তো সর্বধর্ম সমন্বয়ের কোন আদর্শই তাঁর চিন্তাধাবায় স্থান পায় নি।

রক্ষণশীলতা ইন্দ্রনাথকে প্রায় সকল অগ্রগতি ও প্রগতিশীলতার বিরোধী করে তুলেছিল। বর্ধমানে জলের কল বসানোর তিনি বিরুদ্ধতা কবেছিলেন, 'সহবাস সম্মতি আইন' সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেছিলেন—'নিদেন এক ছেলেব মা না হলে কোন মতেই নির্ভয়ে সম্মতি দেওয়া চলে না।' গিরিশচন্দ্র যখন অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়ে 'ষ্টার থিয়েটার' রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শুরু কবেন, ইন্দ্রনাথ তখন 'নটেন্দ্রলীলা কাব্য' লিখে এই প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করেছিলেন।

এই বিদ্রূপ-কটাক্ষ, রঙ্গ-রসিকতার জন্য ইন্দ্রনাথের সাহিত্যে চিবন্তন ভাবধারা প্রকাশ পায়নি। তাঁর অধিকাংশ রচনার বিষয়বস্তু হলো সাময়িক ঘটনাবলী। সেই ঘটনাগুলি দূরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনাথের সাহিত্য-

কীর্তিও তাই আজ অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাময়িক বিষয়কে চিরন্তনত্ব দান করতে হলে যে উচ্চ কল্পনাশক্তি, সংযম ও সহিষ্ণুতা দরকার—ইন্দ্রনাথের তা ছিল না। কয়েকটি রচনায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতিকে অনুসরণ করেছিলেন। 'উকীল মোক্তারের আইন' ব্যঙ্গ-রচনায় উকীলদের শ্রেণীবিভাগ করে তিনি লিখেছেন—'উকীল তিন জাতীয়।' প্রথম, ময়ূর—ইহারা পুচ্ছ বলে অর্থাৎ প্যাকাম দেখাইয়া খান, ইতর লোকে ইহাকে বলে পসার, ক্ষমতা, সময়, অথবা কপাল। ইহাদের ভাবনার কারণ নাই, যতদিন প্যাকাম আছে, ততদিন চিড়িয়াখানায় ইহাদের মান যাইবার নহে।

দ্বিতীয়, কাক—ইহারা ছেলে-পুলের টোকা হইতে মুড়িটা লাড়ুটা অথবা আস্তাকুঁড়ে এটোটা কাঁটাটা খুঁটিয়া খায়, ইহাদের কেহই যত্ন করিতে নাই, কাহারও প্রত্যাশাও নাই, তথাপি এক রকমে পেট্‌টা ভরে, জীবনটা কাটে। ইহাদেরও ভাবনা নাই।

তৃতীয়, কোকিল—ইহারা পরের বাসায় প্রতিপালন হয়, পরের আধার খাইয়া প্রাণ বাঁচায়, সময় পাইলে কুহু কুহু করে, আর বসন্ত এবং বিরহীর কাছে নামে একটু খাতির পায়, কাজে পায় না, বরং গালিও খায়, ভাবনা ইহাদেরই জন্য।' এই রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে'র দ্বারাও ইন্দ্রনাথের রীতি প্রভাবিত হয়েছে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের রুচিবোধ, কল্পনাশক্তি, বিষয় নির্বাচনে সতর্কতা কোনটাই ইন্দ্রনাথের ছিল না। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। 'কমলাকান্তের মত বিষয় নির্বাচনে অতিরিক্ত রুচি সতর্কতা পঞ্চানন্দের নাই। তাঁহার আকমাড়া কলে সব রকম ইক্ষুই—পান্‌সে, মিষ্টি, ছোবড়া-সর্বস্ব, কঠিন ত্বক্-রক্ষিত—পেষা হইতেছে, এবং আমরাও সূক্ষ্ম-স্থূল নির্বিশেষে সেই ইক্ষু পোষণযন্ত্র-নিঃসৃত রস এবং গাদ নির্বিচারে পান করিয়া স্থূল তৃপ্তির উদ্গার তুলিতেছি। কাজেই পঞ্চানন্দী রসিকতার একটি সুনির্দিষ্ট প্রথার সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ অনেকস্থলে অভ্যস্ত রীতির কাঠিন্য লাভ করিয়াছে। কমলাকান্ত কেবল সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন উচ্চ কোটির মনীষীর জন্য; পঞ্চানন্দ স্বল্প শিক্ষিত, চল্‌তি ঘটনার রসপায়ী বৃহত্তর সমাজের জন্য।' সাধারণের মনোরঞ্জনে পঞ্চানন্দ নামধারী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছিলেন। 'সেকালে ঐ পঞ্চানন্দটুকুর জন্য অনেকে উদ্‌গ্রীব হইয়া 'বঙ্গবাসীর' প্রতীক্ষা করিত।' হয়তো এজন্যই

'বঙ্গবাসী'র গ্রাহক সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে গিয়ে পৌঁচেছিল। তারপর কালস্রোত অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সহমরণ, স্ত্রী-শিক্ষা, জাতিভেদ প্রভৃতি বিষয়ে ইন্দ্রনাথের প্রতিবাদ যুগ ও কাল প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই সঙ্গে পঞ্চাশ-হাজারি 'বঙ্গবাসী'ব প্রখ্যাত পঞ্চানন্দও ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন। জাতিভেদ প্রভৃতি অন্ধ গোঁড়ামির সমর্থক ইন্দ্রনাথকে জাতি ভুলে গেলেও , মেকি স্বদেশপ্রেম, উগ্র সাহেবিয়ানা ও ইংরাজ-কুশাসনেব স্বরূপ-উদ্ঘাটনকারী ইন্দ্রনাথের স্মৃতিকে স্মরণ রাখার প্রয়োজনীয়তা এখনো কিছু আছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫)

হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানবাদের ইতিহাসে 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু একটি উল্লেখযোগ্য নাম। 'বঙ্গবাসী'র মাধ্যমে যোগেন্দ্রচন্দ্র গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু মনোভাব প্রচার করে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁর এই রক্ষণশীল ভূমিকা তেমন চোখে পড়ে না। চুঁচুড়ায় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কাছে 'সাধারণী'র সহকারী সম্পাদক হিসেবে সংবাদপত্র সম্পাদনার প্রথম পাঠ নেবার পর তিনি ১৮৮১ খৃঃ 'বঙ্গবাসী' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমদিকে 'বঙ্গবাসী'কে (১৮৮১) তিনি সংকীর্ণতার উর্ধ্বে রাখতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। সেজন্য তিনি সেযুগের বিরোধী মতাবলম্বী সাহিত্যিকদেরও 'বঙ্গবাসী'তে স্থান দিয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখ্য নেতৃবৃন্দ 'বঙ্গবাসী'র প্রথমদিকে নিয়মিত লেখক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ছিলেন 'বঙ্গবাসী'র প্রথম সম্পাদক। তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত না হলেও, ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রলালের প্রচেষ্টায় এবং ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় 'বঙ্গবাসী' একটি উদার মতাবলম্বী প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে পরিণত হয়।[১] প্রথম 'বঙ্গবাসী' প্রকাশের সময় সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তাতে বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার ভাবে লিখিত হয়েছিল। ১৮৮১ খৃঃ ১৯শে নভেম্বর তারিখের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় 'বঙ্গবাসী'র বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় 'বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য, জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার। 'আমাদের দেশের জনসাধারণ অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন; জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য জনসাধারণের চোখমুখ ফুটাইবার জন্য বঙ্গবাসীর জন্ম।' এর মধ্যে 'সনাতন' হিন্দুধর্ম প্রচারের কোন কথাই নেই। প্রথম সংখ্যার লেখক-সূচীতে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত গ্রন্থের লেখক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামও

দেখা যায়। 'নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ইহার লেখক, বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, উকীল; বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র এম. এ, বি. এল, বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম.. এ, বি. এল; বাবু অদ্বৈতচরণ বসু, চারুবার্ত্তার সম্পাদক; বাবু কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় বি. এল; ইহা ব্যতীত আরও দুইজন বহুদর্শী বিজ্ঞ লেখক ইহাতে লিখিবেন।'[২] কার্যাধ্যক্ষ উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায়ের নামে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছিল। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রথম থেকেই রক্ষণশীল ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজেব প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিল না। তিনি সেযুগের প্রধান প্রধান ব্রাহ্ম লেখকদের 'বঙ্গবাসী'তে লিখবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কাবণ, বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর তখনো ব্রাহ্মদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তাঁদেব বাদ দিয়ে 'বঙ্গবাসী'র আত্ম-প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না বলেই তিনি বাধ্য হয়ে উদারনীতিব মুখোস ধারণ কবেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল ইংবাজীতে লিখিত তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'Babu Jogendrachandra Bose, the proprietor of the 'Bangabasee' himself had no especial prediliction for Brahmo liberalism. His aim was to unite all the best intellects of Bengal in his weekly with a view to make it the most popular journal in the province.'

চুঁচুড়ায় অক্ষয়চন্দ্র সরকাবের 'সাধারণী'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সময় যোগেন্দ্রচন্দ্র ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেশ ভালভাবে চিনতেন। ইন্দ্রনাথ তখন 'অক্ষয় দাদার' বাড়ী গিয়ে দু'একদিন কাটাতেন এবং 'সাধারণী'র জন্য প্রবন্ধ লিখে দিতেন। আশ্চর্যের বিষয়, প্রথম 'বঙ্গবাসী' প্রকাশ করাব সময় যোগেন্দ্রচন্দ্র বাংলার স্বনামধন্য লেখকদের সহযোগিতা চাইবার সময় 'কল্পতরু' (১৮৭৪) ও 'ভারত-উদ্ধার' (১৮৭৮)-খ্যাত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তালিকাভুক্ত করেননি। 'বঙ্গবাসী'র আরম্ভে কিছুকাল যোগেন্দ্রচন্দ্র 'বঙ্গবাসী'র জন্য ইন্দ্রনাথেব লেখা পাইবার কোন চেষ্টা করেন নাই।'[৩] ইন্দ্রনাথের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা উদারমতাবলম্বী পাঠক-সাধারণের মনে আঘাত দিলে 'বঙ্গবাসী'র ক্ষতি হতে পারে সেকথা বিবেচনা করেই কি তিনি এ-কাজ করেছিলেন? অক্ষয়চন্দ্র সরকাবের প্রভাবই শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো। যোগেন্দ্রচন্দ্র ধীরে ধীরে রক্ষণশীলতার দিকে ঝুঁকে পডলেন এবং দেখা যায় চন্দ্রনাথ বসু এবং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানের দুই প্রধান প্রবক্তা 'বঙ্গবাসী'র ক্ষেত্র অধিকার

করলেন। এই সময়ে শিক্ষিতা ব্রাহ্মিকাদের কটাক্ষ করে ইন্দ্রনাথ 'বঙ্গবাসী'তে ব্রাহ্মদের প্রতি প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করেন। ফলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্মীরা এর প্রতিবাদে 'বঙ্গবাসী' বর্জন করে নতুন পত্রিকা 'সঞ্জীবনী' (১৮৮১) প্রকাশ করেন। বঙ্গবাসীর কার্যাধ্যক্ষ উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ রায় এবং প্রথম সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে যোগেন্দ্রচন্দ্রের মতানৈক্যও খুব সম্ভবতঃ এ-সময়েই দেখা দেয়। উপেন্দ্রচন্দ্রের পদত্যাগের পর যোগেন্দ্রচন্দ্রের নেতৃত্বেই 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত হতে থাকে। এই নতুন পর্যায়ের 'বঙ্গবাসী'র সঙ্গে আগের 'বঙ্গবাসী'র গুরুতর পার্থক্য ঘটেছে দেখা যায়। কারণ, এর পর ইন্দ্রনাথের পরামর্শেই যোগেন্দ্রচন্দ্র 'বঙ্গবাসী'কে সম্পূর্ণরূপে 'বর্ণাশ্রমাত্মক হিন্দুধর্মের ও সমাজের' মুখপত্রে পরিণত করেন।[৪] ইন্দ্রনাথই হলেন বন্ধু, দার্শনিক ও পথদ্রষ্টা। এদিকে ব্রাহ্মরাও 'সঞ্জীবনী'তে এই নব্য-হিন্দুবাদের রক্ষণশীলতাকে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলেন। কিন্তু 'সঞ্জীবনী' মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর গুরু গম্ভীর, দার্শনিক প্রবন্ধগুলি সাধারণ মানুষকে আলোড়িত করতে পারে নি। পক্ষান্তরে, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে 'বঙ্গবাসী' সহজ সরল সুরে সাধারণ বাঙালীর হৃদয়-মন জয় করে বসল। এই যুদ্ধে ব্রাহ্ম-আন্দোলন বহু দূর পিছিয়ে গেল। বাংলা দেশে নব্য-হিন্দুধর্মের জয়-পতাকা জয় গৌরবে আবার উড্ডীন হলো। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ইংরেজী আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন —'This open breach with the Brahmo Samaj instead of weakening the growing popularity of the 'Bangabasee' helped materially to increase it and soon converted it into the organ of the most hide-bound conservatism both theological and social of the Bengalee Hindu soeiety. The 'Sanjibanee's influence was more or less confined to the members of the Brahmo Samaj and their sympathisers. It was this division which gradually drove the 'Bangabasee' to an extreme position on the side of Hindu orthodoxy on the one hand, while it drove the 'Sanjibanee' also to the other extreme of Brahmo orthodoxy. Contemporary Bengalee thought and life, divided practically into these two camps, was thus deprived of reasonable reconciliation and synthesis in which alone these conflicts

of ideals could possibly find their final settlement and solution. The movement of social and religious progress represented by the Brahmo Samaj suffered most seriously, at least for the time being, on account of this seperation and conflict.'

এরপর যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে হিন্দু-গৌরব প্রচারে ব্রতী হন। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় সব ব্যাপারে ইন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে তাঁর মতামতের মিল লক্ষ্য করা যায়। এদিক থেকে তিনি শশধর তর্কচূড়ামণির ধারা অনুসরণ করেছিলেন। 'বঙ্গবাসী' এই সময় থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা, পালন ও শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে আসে। শুধু 'বঙ্গবাসী' নয়, ১২৯৭ সালে 'বঙ্গবাসী'র অধ্যক্ষরা লোকশিক্ষা ও হিন্দু-শিক্ষার জন্য 'জন্মভূমি' পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তাছাড়া, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপ-পুরাণ অনুবাদসহ স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি নামমাত্র মূল্যে প্রচার করে যোগেন্দ্রচন্দ্র হিন্দু পুনরুজ্জীবনের নতুন সম্ভাবনা সূচিত করেন। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে ইউরোপের 'প্রতি-সংস্কারবাদী (Counter-Reformation) আন্দোলনে'র তুলনা করা যায়। সংস্কারবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ইউরোপের 'প্রতি-সংস্কারবাদী'রা ধর্মীয় জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ প্রভৃতির ব্যাপক প্রচার শুরু করেছিল। মার্টিন লুথারের সংস্কারবাদী আন্দোলনের পর জার্মান, স্পেন ও ইতালীতে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। অনেক জার্মান মানবতাবাদী 'প্রোটেস্টেন্ট' মতবাদ ছেড়ে এরাসমুসের নেতৃত্বে আবার প্রাচীন বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকে পড়েন। লুথারের বাইবেলের অনুবাদকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য সেন্ট জেরোমের অনুসরণে এসময়ে বাইবেলের মধ্যযুগীয় জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এইচ. জে. গ্রীম তাঁর **'Reformation Era'** গ্রন্থে এই 'প্রতি-সংস্কারবাদে'র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তাই সঙ্গতভাবেই বলেছেন—**'a revived scholasticim, purged of its late-medieval formalism and sharpened during the controversies with protestants'.**

যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রতিটি গ্রন্থে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। সেজন্যই তিনি যেন লেখনী ধারণ করেছিলেন—অন্তরের প্রেরণার জন্য নয়। 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-৮৮) একটি সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্ম-পরিবার এবং শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মহিলাদের তীব্র আক্রমণ

করেছেন।/ ব্রাহ্মদের সংস্কারবাদকে আক্রমণ করে তিনি সমাজ-স্থিতিকে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। 'মডেল ভগিনী'র প্রথম সংস্করণের প্রথম ভাগের মুখবন্ধে গ্রন্থের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে তিনি লিখেছিলেন, 'এ গ্রন্থ উপন্যাস নহে, উপকথা নহে, তবে উপন্যাস নাম না দিলে পাঠক বই পড়েন না ; কাজেই মডেল ভগিনী উপন্যাস বলিয়া অভিহিত হইল।

বঙ্গের পূর্ব-ইতিহাস অনেকেই লিখিয়াছেন, কিন্তু নব্যবঙ্গের ইতিহাস কেহই বড় একটা লেখেন নাই। নব্য বাঙ্গালীর জীবন চবিতও এ পর্যন্ত কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। মডেল ভগিনী গ্রন্থে নব্য-বঙ্গের ইতিহাস এবং নব্য-বাঙ্গালীর জীবন-চরিত—একাধারে দুই পদার্থ দেখিতে পাইবেন।

মডেল ভগিনীতে অষ্টবজ্র আছে। চন্দ্রেব স্থবিমল স্থধা, অগ্নির জলন্ত উত্তাপ, স্থর্যের প্রখর কিরণ, বসন্তেব মলয় সমীবণ, হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ, মাধবী-লতার প্রিয়তম ভৃঙ্গ, ইন্দ্রের শ্রীমতী শচী, নরেন্দ্রেব মিসেস্ পাঁচী—এ সমস্তই আছে।

স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা মডেল ভগিনী পাঠে পবম জ্ঞানলাভ করুন, দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হউন, সংসাবে সাবধান হউন,—ইহাই গ্রন্থকারেব প্রার্থনা।' দ্বিতীয় ভাগের মুখবন্ধে লিখেছেন, '...ইংরেজেব পুচ্ছধারী বাঙ্গালী নর-নারীব নিমিত্ত মডেল-ভগিনীকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে হইল। সত্ব, রজঃ, তমঃ—ত্রিগুণাত্মক না হইলে আদর্শ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় না।

মডেল-ভগিনী প্রথম ভাগে স্বর্গে উঠিবাব পাকা সিঁড়ি, দ্বিতীয় ভাগে কেবল স্বর্গ-ভোগ, তৃতীয় বা শেষ ভাগে মোক্ষফল লাভ।' তৃতীয় ভাগের মুখবন্ধ—'মডেল ভগিনী তৃতীয় ভাগ মোক্ষধর্ম-পর্ব। স্থতরাং উন্নত পাঠক-পাঠিকার পক্ষে কালকূট বিষ পাঠে বিষম বিরক্তিকর বটে, ফলে কিন্তু করতলে স্থধাকব।

বিষমুখ পয়ঃ কুম্ভ বন্ধুর গৌরব কয়জন করিতে জানে? সাধুর সমাদর কয়জন করিতে শিখিয়াছে? স্থতরাং এরূপ আশা আছে, বহুলোকের নিকট মডেল ভগিনী তৃতীয় ভাগের আদর গৌরব হইবে না।

প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্বপাঠে লোকের এখন বিরক্তি জন্মিতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদের বিশেষ উপকারে আসিবে।' এই প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ও ব্যঙ্গ যোগেন্দ্রচন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদঘাটিত করে। কাহিনীটি সেজন্ত উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণনগরের কোনও এক গ্রামের তালুকদার শ্রীনরহরি ঘোষাল। সৎ ব্রাহ্মণ এবং জমিদার হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তারই একমাত্র পুত্র সবেধন নীলমণি রামদাস। বারো বছর বয়সে রামদাসকে ইংরেজি শেখার জন্য নরহরি কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। রামদাসকে নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল। তাকে দেখলেই সবাই রামায়ণের সুরে গেয়ে উঠতো—

শ্রীরামের দাস আমি অঞ্জনানন্দন।

ল্যাজ সাটে কাঁপে মোব এ তিন ভুবন।'

ভীষণ উত্যক্ত হয়ে বামদাস কর্তৃপক্ষেব কাছে নালিশ জানায়। কিন্তু তাতে হিতে বিপবীত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে রামদাসেব পবিবর্তে 'রামচন্দ্র' নাম রাখার জন্য বড সাহেবেব কাছে সে দরখাস্ত কবে। সেই আবেদন মঞ্জুব হলে রামদাসের নাম হলো রামচন্দ্র। নবহবি গভর্ণরকে ধরে রামচন্দ্রের জন্য ডেপুটীর কাজ যোগাড় করে দেন। তাঁবই চেষ্টায় বামচন্দ্র কলকাতাব কাছে হুগলীতে বদলি হয়। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজেব দিকে তাব ঝোঁক দেখা দেয়। 'এই সময়ে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের মহাধূম। (জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্রই কেশববাবুর নাম। ঘরে, বাহিবে. হাটে, মাঠে, বেলগাডীতে, বিয়ে-বাড়ীতে যেখানে যাই, সেইখানেই কেশববাবুব কথা। কালী, দুর্গা, কিছু নয়; শিব, কৃষ্ণ কেহ নয়; দুর্গোৎসবটা কুসংস্কাব, কালীপূজাটা পৈশাচিক প্রক্রিয়া; শ্রীকৃষ্ণ ননীচোবা—গোপিনী কুলললনার কলঙ্ক। চারিদিকে ইত্যাকার ধ্বনি উঠিল।) বিবাহের মন্ত্র নাই, বামুনদের কেবল ওটা বুজরুকি! আইনমত রেজেষ্টরী না হইলে, বিবাহ পাকা হয় নাই। পৈতাগাছটা মানবদেহের ভাবমাত্র। গাছে তুলা হয়—সেই তুলা পিঁজে সুতা হয়, সেই সুতাসমষ্টি একত্র করে পাক দিয়া পৈতা হয়—সে পৈতার আবার মাহাত্ম কি? নির্বোধ ব্রাহ্মণগণ সেই দড়ীগাছটা এক তিল বিশ্রাম নাই, দিন রাতই গলায় দিয়া রাখে! ব্রাহ্মণেব এই চিব-গলায়-দড়ী কেবল এই অসভ্য কুসংস্কারাপন্ন ভারতেই সম্ভবে। অতএব ফেলো পৈতা! শালগ্রাম বিগ্রহগুলি, ভাদ্রমাসের একটানা গাঙে, ভাটার সময় ফেলিয়া দাও, যেন বঙ্গোপসাগর পার হইয়া, গড়াইতে গড়াইতে সেগুলি মাদাগাস্কার দ্বীপে গিয়া ঠেকে! জাতিভেদ বন্ধ হইয়া যাক। হাড়ী, ডোম, চণ্ডালের সহিত ব্রাহ্মণের পার্থক্য না থাকে। যার যাকে ইচ্ছা, সে তাকে বিবাহ করুক,—উচ্চ নীচ ভেদ নাই। যার যেরূপ ইচ্ছা, সে পরের উচ্ছিষ্ট খাউক—মুসলমান, ম্লেচ্ছ, মুদ্দফরাস বিচার নাই। জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচর—চরাচরে যতপ্রকার জীব

আছে, সমস্তই মানুষের আহার্য। এটা খেতে আছে, ওটা খেতে নাই, ইহাকে বিবাহ করিতে আছে, উহাকে বিবাহ করিতে নাই, হিন্দুগণের এইরূপ কুসংস্কারেই ভারত মাটী হইয়াছে। রেলওয়ে-কেরাণিগণ, এইবার আশা করিল, কেশববাবুর নূতন ধর্ম প্রবর্তনে, ভারত নিশ্চয় উদ্ধাব হইবে। অনেক স্কুলের বালক আশা করিল, মুসলমানের দোকানেব পাঁউরুটী আর লুকাইয়া কিনিতে হইবে না। কোন কোন কুল মহিলা আশায় বুক বাঁধিলেন, এইবার তাহারা প্রকাশ্যে ফাউলকারী রাঁধিবেন। অধিকাংশ নীতিজ্ঞ বৌচিক পুরুষ বুঝিলেন, এইবার স্ত্রীজাতির উন্নতি বা উর্দ্ধগতি হইবে, গৃহস্থেব মেয়ে স্বাধীনতা পাইবে, বেশ্যার দমন হইবে।' ডেপুটী বামচন্দ্র এ সুযোগ ছাড়লেন না। কেশববাবুকে তিনি ঈশ্বরের অবতাব বলে মনে করতে লাগলেন। 'ধর্ম-হাঁসেব' মতো রামচন্দ্র কেশববাবুব সমস্ত কথা ছেঁকে নিলেন। 'সেই সারের সার, অতিসার ধর্মে দীক্ষিত হইয়া, রামচন্দ্র অনন্যমনে হুগলীতে তাহাব প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন—ধর্ম-সৌরভে হুগলী আমোদিতা হইল। সেই কুল-কুলনাদ বিশেষণে বিশেষিতা গঙ্গানদী সেই অতি-সার ধর্মের সুগন্ধ ভাসাইয়া জলপথে দিগদিগন্তে লইয়া গেল; জগৎ-প্রাণ অনিল, ব্যোমপথে সেই মহাগন্ধ, পার্শ্ববর্তী গ্রাম নিচয়ে পৌঁছাইয়া দিল, আব স্বয়ং রামচন্দ্র স্থলপথে প্রতিবেশী মণ্ডলীর ঘরে ঘরে তাহা বহন করিলেন।' ব্রাহ্ম হবার পরেই তাঁর পোষাক-আশাক, আচার-ব্যবহার সব পাল্টে গেল। রামচন্দ্র নাপিতকে একদিন 'ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন' ও তার পায়ের ধূলা নিতে গেলে সেই নাপিত ভয়ে পালিয়ে গেল। ইতিমধ্যে নরহরি ঘোষাল মারা গেলেন। ডেপুটী বাবু কলকাতার ব্রাহ্ম-গুরুজীকে তৎক্ষণাৎ লিখলেন—'আর ভয় নাই। ঈশ্বর আমাদের সহায়। ধর্মপথের কণ্টক ঘুচিয়াছে। যাহার জন্য এতদিন আমি হাডে হাডে জ্বলিতেছিলাম, জীবন্মৃতবৎ ছিলাম, পরম ব্রহ্মের করুণাকটাক্ষে, এতদিনে সে ব্যক্তি পরলোক গমন করিয়াছে। বিগত বুধবার জ্বররোগে নরহরিব মৃত্যু হইয়াছে। পিতাটা অতিশয় পাপী ছিল—তাঁহাব উদ্ধারের জন্য অনুতাপ আবশ্যক। কবে অনুতাপ করিতে হইবে, দিন স্থির করিয়া লিখিলেই, কলিকাতা গিয়া আপনার সহিত অনুতাপ করিব। রামচন্দ্র বাডী গিয়ে প্রথমেই অর্থ-সম্পদ সব হস্তগত করলেন। অনেকদিন পবে তিনি দেশে এসেছেন শুনে কুলগুরু তাঁকে দেখতে এলেন। রামচন্দ্র তাঁকে যেন চিনতেই পারলেন না। তাঁর গলায় পৈতা দেখে সবিস্ময়ে 'তুমি' সম্বোধন করে বললেন, 'কে তুমি? তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়?

একি! তোমার গলদেশে সাদা সূত্র কয়েকগাছি ঝোলান কেন? গলরজ্জু দেখিয়া আমার অন্তর কাঁদিতেছে। তুমি কি রাজদণ্ডে দণ্ডিত? তোমার উদ্ধারের নিমিত্ত আমি এখনি পরম পিতার নিকট অনুতাপ কবিতে রাজি আছি।' গ্রামের লোক কুলগুরুর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে রামচন্দ্র আবার বললেন, 'ওঃ হোঃ-সেই ব্যক্তি। উহার সহিত আমাব অনেক কথা আছে। উহাকে আপাতত কিছু ইংরেজী শেখানো দরকার।' বামচন্দ্রেব সতী-সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীর নাম অন্নপূর্ণা। তিনি 'কুসংস্কাবে' আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁর 'নাকে তিলক, গলায় তিলকণ্ঠী, তুলসীর মালা, হাতে শাঁখা। অধিক কি, সিঁথির অগ্রভাগে সুরকিব গুড়াবৎ কি একটা লাল পদার্থ সদাই সন্নিবেশিত।' এগুলি দেখে রামচন্দ্র খুব বিবক্ত হলেন। তিনি তাঁকে লেখাপড়া শেখার জন্য এবং মুর্গী-মাংস খাবাব জন্য অনুরোধ জানালেন। অন্নপূর্ণা প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করে পরে স্বামীব ইচ্ছায় নিজেকে আত্মসমর্পণ কবলেন। তাঁর উন্নতিও হতে লাগল বেশ দ্রুত গতিতে। 'প্রথম মাসে, উচ্চ শিক্ষাব হাতে খড়ি দিয়া অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, নবমীতে লাউ খাওয়া নিষেধটা বডই কুবিধি। দ্বিতীয় মাসে, উচ্চ-শিক্ষাব প্রথম ভাগ ধবিয়া বুঝিলেন, পেঁয়াজেব গন্ধ ব্যতীত আব কোন দোষ নাই। গলায় তিলকণ্ঠী, তুলসার মালা কেবল অঙ্গভাব। অন্নপূর্ণা তৃতীয় মাসে, উচ্চশিক্ষাব বোধোদয় আবম্ভ কবিলেন। এবাব দিবাজ্ঞান লাভ হইল। তাঁহার মনে মনে এই ভাব উদয় হইল, 'কেন বমণীকুল চিবদিন পুরুষের পদানত থাকিবে? পিঞ্জবাবদ্ধ শুখ পাখীব ন্যায় কেন অন্দবের ভিতর পচিবে? চতুর্থ মাসে, এই ভাব স্পষ্টীকৃত হইল। অন্নপূর্ণা, স্বামীব আদেশক্রমে, আধ ঘোমটা দিয়া, স্বামীব বন্ধুগণের সাক্ষাতে স্বচ্ছন্দে পবমানন্দে বাহির হইতে লাগিলেন। পঞ্চম মাসে, আরও উন্নতি। কেবল একটী ভৃত্যেব সাহায্যে, ছেলেপিলে সঙ্গে লইয়া তিনি কলিকাতা আসিয়া যাদুঘব, পশুবাটিকা, কেল্লা, গডেব মাঠ দেখিয়া বেডাইলেন। ষষ্ঠমাসে, প্রত্যহ বৈকালে স্বামীব সহিত নৌকাব ছাদে উঠিয়া, সর্ব-জনচক্ষুর গোচবীভূত হইয়া গঙ্গা নদীর হাওয়া খাইলেন। সপ্তম মাসে, তাঁহাব মুর্গীতে ঘৃণা বহিল না। অষ্টম মাসে, তাঁহাব গৃহে মুষ্টিভিক্ষা বন্ধ হইল। নবম মাসে, ব্রাহ্মণী-রমণীব বদলে বাবুর্চি পাকশালা অধিকার করিল। দশম মাসে অন্নপূর্ণা সঙ্গীত বিদ্যায় মন দিলেন। একাদশ মাসে, একজন মুসলমান ওস্তাদজী আসিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর সঙ্গীতের তান-লয়-মান শিখাইতে লাগিল। দ্বাদশ মাসে, শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে, অন্নপূর্ণা বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া ঈশ্বরানুরক্ত

ভ্রাতৃগণের সমক্ষে স্বয়ং হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন।' স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য অন্নপূর্ণা সবই বিসর্জন দিলেন, শুধু সিঁথির সিঁদুর এবং হাতের নোয়া ছাড়তে পারলেন না। 'উচ্চতম শিক্ষার উচ্চতম শাখায় উঠিয়াও অন্নপূর্ণাব এ নিদারুণ কুসংস্কার রহিল,—নির্মল নীলাকাশে এ গুরুগাঢ়তম মেঘবিন্দু রহিল,—ইহাই রামচন্দ্রের মর্ম যাতনা। শেষে গুরু-উপদেশে মনকে শান্ত করিলেন—'ফুল্ল-কুসুমে কীট, মৃণালে কণ্টক, চন্দ্রে কলঙ্ক থাকাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।'

রামচন্দ্র ও অন্নপূর্ণাব একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলের নাম বিপিনচন্দ্র, মেয়ের নাম কমলিনী। কমলিনী বয়সে বড়। আট বছব বয়সে কমলিনীর বিয়ে হয়। বৃদ্ধ নরহবি অনেক অনুসন্ধানেব পব সুপাত্রের হাতে পৌত্রীকে দান করে গৌবীদানেব ফল লাভ কবেন। বামচন্দ্রেব মত না থাকলেও পিতার উপর নির্ভরশীল হওবায়, তাব বিরোধিতা কবতে পাবেন নি। কমলিনীর স্বামীব নাম রাধাশ্যাম বায়। বয়স বছর ত্রিশ। প্রথম স্ত্রী মাবা যাবাব পর তিনি কাশী ধামে গিয়ে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ণ কবে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাবপর কমলিনীব সঙ্গে তাব বিয়ে হয়। রাধাশ্যামেব মা ছিল না, বাবার মৃত্যুর সময় স্ত্রী কমলিনীকে হুগলী থেকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালে রামচন্দ্র বিভিন্ন অজুহাতে কমলিনীকে পাঠালেন না। আসল কারণ, কমলিনীর স্বামী-গৃহে যাবাব ইচ্ছে আদৌ ছিল না। কাবণ, ইতিমধ্যে লেখাপড়া গান-বাজনা শিখে ব্রাহ্ম-সমাজে সে অগ্রগণ্যা ও 'প্রিয় ভগিনী' হয়ে উঠেছে। হুগলী স্কুলেব অল্প বয়স্ক 'ভ্রাতাবা' সন্ধ্যাব সময় রামচন্দ্র ভবনে কমলিনীর সঙ্গে মজলিসে মিলিত হয়। দুবার এণ্ট্রান্স ফেল-হওয়া কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রিয় ভগিনীব' মন না পাওয়ায় একদিন রাতে কমলিনী-প্রেমিক নবঘনশ্যাম নন্দীর মাথায় লাঠি মেরে নৈশ-অভিসাবে ব্যাঘাত ঘটায়। স্কুলে কৈলাসচন্দ্রের বিচার আরম্ভ হলে কমলিনীর সমস্ত কেচ্ছা-কাহিনী বেরিয়ে পড়ে। রামচন্দ্র কমলিনীর স্বাস্থ্যোদ্ধাবেব অছিলায় ডাঃ মহেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে কমলিনীকে বৃন্দাবন পাঠিয়ে দিয়ে নিজেও দেশের বাড়ীতে গিয়ে হুগলী থেকে বদলী করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত পেশ কবলেন। কৈলাসচন্দ্র বিলাত যাওয়ার উদ্দেশ্যে সাহেবের বেশে কলকাতা ত্যাগ কবলে রেলগাড়ীতে কমলিনীর স্বামী রাধাশ্যামের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে সে তাঁকে গুরুপদে বরণ করে। তাঁকে কমলিনীর স্বামী জেনে

নিজের পাপ মোচনের জন্য সে হঠাৎ কোথাও উধাও হয়ে যায়। রাধাশ্যামও তাঁকে খুঁজবার জন্য মথুরায় নেমে পড়েন। সেই গাড়ীতে কমলিনীর আর একজন প্রেমিক নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। তিনি বিহারের একজন রাজার বাড়ীতে চিঠিপত্র মুসাবিদার কাজ করতেন। রাজা তীর্থক্ষেত্রে গেলে নগেন্দ্রনাথও সুযোগ বুঝে বিনা অনুমতিতে কমলিনী-বিরহ-জ্বালা জুড়াবার জন্য কলকাতায় যান। সেখানে তাকে না পেয়ে গোপনে কার্যক্ষেত্রে ফিরে যাবার সময় কৈলাস ও রাধাশ্যাম প্রভৃতির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। এ-দিকে সেই বিহাররাজ বর্ধমান রাজের আতিথ্য লাভের পর পশ্চিম যাত্রার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হলে রাধাশ্যামের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাঁকে গুরুর মত সম্মান দেখান। রাধাশ্যামের শত আপত্তি সত্বেও তাঁকে একটি মূল্যবান শাল উপহার দেন। তাঁর কর্মচারী নগেন্দ্রনাথকে একই কামরায় মূর্চ্ছিত দেখে তিনি খুব বিরক্ত হন। কারণ, দেশত্যাগের সময় তাঁকে রাজধানীতে থাকার জন্য তিনি বারবার নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন। অসুস্থ নগেন্দ্রকে রাজার বর্ধমান-নিবাসে রেখে তাঁরা আবার যাত্রা শুরু করেন। মথুরায় রাধাশ্যাম নেমে যাওয়ায় রাজা খুব মর্মাহত হন। কিন্তু পথেই রাজার সর্বস্ব চুরি যায়। মূল্যবান পোষাক-গুলির সবই খোয়া যায়। নগেন্দ্রনাথ সুস্থ হয়ে আর রাজার রাজ্যে ফিরে গেলেন না। সন্ন্যাসী সেজে কমলিনী-দর্শনের আশায় তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কমলিনী ডাঃ মহেন্দ্রের 'সুচিকিৎসায়' আরোগ্য লাভ করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। বৃন্দাবনে কদম্ববৃক্ষ, রাসলীলা প্রভৃতি 'কুরুচিপূর্ণ' কথা শুনে কমলিনীর মূর্চ্ছা হবার উপক্রম হল। সেই সময়ে সন্ন্যাসীবেশী নগেন্দ্রনাথও সেখানে উপস্থিত হলেন। কমলিনী 'চোখের জল' ও 'পবিত্র অঙ্গের স্পর্শ' দিয়ে 'প্রিয় ভ্রাতার' সন্ন্যাস-ব্রত ভাঙালো। এদিকে রাধাশ্যামও কৈলাসের অনুসন্ধান করতে করতে বৃন্দাবনে উপস্থিত হলেন। তিনি অজস্র ভিখারী-সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। একদিন একটি গাছে রাজার দেওয়া সেই বহু মূল্যবান শালটি তিনি শুকাতে দিয়েছিলেন। পুলিশ অনেকদিন থেকে পুরস্কারের লোভে রাজার সেই হারাণ-সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টায় ছিল। পুলিশ সদলবলে রাধাশ্যামকে শাল চুরির দায়ে গ্রেপ্তার করল। কমলিনীর পরামর্শে নগেন্দ্রনাথ বিচার-প্রহসনে সাক্ষী দিলেন। বিচারে প্রকাশ্য বেত্রদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু দণ্ডদানের সময় রাজা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে রাধাশ্যামকে উদ্ধার করেন। এরপর রাধাশ্যাম গুরুতর রোগে অনেকদিন

শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কমলিনীও কলকাতায় চলে যায়। সেখানে নগেন্দ্রনাথ কমলিনীর সাহিত্য-শিক্ষক নিযুক্ত হন। পড়ার ছলে প্রেমলীলার অভিনয় চলতে থাকে। কমলিনীর প্রেমিক কিন্তু একজন নয়—অনেকজন। ডাক্তার মহেন্দ্র, নবঘনশ্যাম, বিজ্ঞান-শিক্ষক নিত্যানন্দ দাস, উকীলবাবু, ব্যারিষ্টার চ্যাটার্জী সাহেব—সবাই কমলিনীর কৃপা-প্রার্থী। রাধাশ্যাম আরোগ্য লাভ করে স্ত্রীকে নিয়ে যাবার জন্য শ্বশুরবাড়ী এলে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। তাঁকে পাগল সাব্যস্ত করে নানা রকম চিকিৎসা শুরু হয়। এই উপলক্ষে কমলিনী একটি ভোজের ব্যবস্থা করে। সেখানে তার বিভিন্ন বন্ধুরাও আমন্ত্রিত হয়। 'কমলিনী চরম সভ্যা। মার্কিন এবং ইউরোপীয় সভ্যতার গূঢ় রস একত্র মিলাইয়া কমলিনী এক নিঃশ্বাসে পান করিয়াছেন। তাই কমলিনীর অগাধ বন্ধু, অসংখ্য সুহৃদ; অপরিমেয় মিত্র। আকাশের তারা, মরুভূমির বালি, বটগাছের পাতা গণিতে পারি, কিন্তু কমলিনীর বন্ধু গণনা করিয়া শেষ করিতে পারি না। কমলিনীর নানা জাতীয় নানা শ্রেণীর বন্ধু। হিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছ, বেহ্ম—সকলেই তাঁহার বন্ধু-দলভুক্ত। তাঁহার ছোক্‌রা বন্ধু, যুবা বন্ধু, বৃদ্ধ বন্ধু। তাঁহার উকীল বন্ধু, ব্যারিষ্টার বন্ধু, ডাক্তার বন্ধু, শিক্ষক বন্ধু, ডেপুটী বন্ধু, বি. এ পাস বন্ধু, কলেজের এম. এ ক্লাসের ছাত্র বন্ধু, পণ্ডিত বন্ধু, মূর্খ বন্ধু।' একশ আটজন 'বারমেসে' বন্ধু থেকে বাছাই করে বত্রিশ জনকে নিমন্ত্রণ করা হলো। খানাপিনা শেষ করে কমলিনী স্বামী সেবার জন্য দলবলকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বন্দী রাধাশ্যামের কাছে উপস্থিত হল। সেখানে তাঁর মুখে জোর করে মদ এবং মাংস পুরে দেওয়া হলো। অবশেষে কৈলাসের চেষ্টায় বাহ্যজ্ঞানহীন রাধাশ্যামের মুক্তি ঘটে। তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এদিকে রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর কমলিনী পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। পিতার সঞ্চিত অর্থ সে অল্পদিনে উড়িয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তার সর্বাঙ্গে দগ্‌দগে ঘা হয়; ভিক্ষা করেই তার জীবন কাটে। পথই হয় তার আশ্রয়স্থল। কৈলাসের মারাত্মক অসুখের কথা শুনে রাধাশ্যাম কলকাতায় আসেন। কৈলাস মারা যায়। নিমতলা শ্মশানঘাটে মৃত্যুপথযাত্রিনী কমলিনীও এসে উপস্থিত হয়। রাধাশ্যামের পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করার পর সেও মারা যায়। রাধাশ্যাম দুজনকে দাহ করে বিজন-বনে তপস্যায়রত হন।

এই উপন্যাস সমসাময়িক কালে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

এর অনুকরণে অনেকগুলি বইও লেখা হয়েছিল। যেমন 'মডেল ভ্রাতা বা আদর্শ যুবক' (১৮৮৭), 'শ্রীযুক্ত পথিকচন্দ্র কবিবত্ন (ওরফে) বিষ্ণু শর্মা—জুনিয়ার' বিরচিত 'ভজহরি' অথবা 'সমাজ-চিত্র' উপন্যাস (১২৯৩) সবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।'[৫]

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মডেল ভগিনী' সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 'ভাতের হাঁড়ীতে ম্লেচ্ছর হাত পড়িয়াছে। অন্দব মহলে ইংরেজী শিক্ষা প্রবেশ করিয়াছে। স্রোত যদি না ফেরে, তাহা হইলে দেশেব আর রক্ষা নাই। 'বাবু' কিন্তু অন্য কাজে ব্যস্ত। সমাজ সংস্কাব করিতেছেন, রুচির ব্যবসায় ধরিয়াছেন—ঘরপানে চাহিয়া দেখেন, এমন ফুবসুৎটুকু নাই।····· মডেল ভগিনীতে অনেক 'ভ্রাতার' চিত্ত বিকাব হইবে, অনেক 'ভগিনীব' গা শিহরিয়া উঠিবে। অনেক প্রচ্ছন্ন ভাবুকের ভাব-সাগবে তরঙ্গ উঠিতে থাকিবে। সে দোষ কিন্তু গ্রন্থকাবেব নহে—দোষ আমার পোড়া কপালের। এক কথায় বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি যে, কতকগুলি লোক লুকাইয়া এ গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, একবার একবার দাঁতে জিব কাটিয়া 'ছিঃ' করিবেন, মুচকি মুচকি হাসিবেন—আর লজ্জা যদি থাকে, তাহা হইলে মনে মনে লজ্জিত হইবেন। কিন্তু যিনি পুস্তক পড়িতে জানেন, তিনি লজ্জার কাবণ কিছু দেখিবেন না। দুঃখেব গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া অন্তরে একটু আশ্বাস লাভও কবিতে পাবেন।' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, 'মডেল ভগিনী'র বচনাকালেব সঙ্গে (১৮৮৬) জড়িত রয়েছে হিন্দু-জাগৃতির অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময়ে 'প্রচাব' ও 'নবজীবন' প্রকাশিত হয়েছিল। অল্‌কট্‌দের আগমন, পরমহংসদেবেব আত্মপ্রকাশও এই সময়ে ঘটে। অমৃতলাল বসু যোগেন্দ্রচন্দ্রেব মত প্রহসন ও বিদ্রূপাত্মক নক্‌শায় (Satire) সংস্কারবাদকে আক্রমণ করেন। তাঁব 'তাজ্জব ব্যাপার' (১৮৯০) প্রহসনে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতাকে কটাক্ষ করা হয়েছিল। 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪), 'একাকার' (১৮৯৪) প্রভৃতি প্রহসনে ব্রাহ্মভাবাপন্ন যুবকদের প্রতি নিন্দাসূচক মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। 'সম্মতি সঙ্কট' (১৮৮৪) 'বাবু' (১৮৯৩) প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন-নক্‌শায় এই আক্রমণ আরও তীব্রতর হয়েছে। 'বাবু'র লক্ষ্য ছিল 'নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজ'। এই প্রহসনের শেষাংশে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'চিনিবাস চরিতামৃতে'র প্রভাব থাকা আশ্চর্য নয়। 'চিনিবাস চরিতামৃত' (১৮৮৬) গ্রন্থেও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ব্রাহ্ম-অনাচাবের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন। গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'কেবল

হাসির জন্য যদি কেহ চিনিবাস চরিতামৃত পাঠ করিতে চাহেন, তবে তাহাকে আমি গ্রন্থ পাঠে নিষেধ করি। গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে চোখেব জল আছে। শ্মশানময় দেশের বর্ণনায় হাসি কি? সেই শ্মশান ছবিতে রং দিবার সময় কেবল "এক-পোঁছ" হাসির বার্ণিস মাখান হইয়াছে ..... লোকে যেন নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে চিনিবাস চরিতামৃত পাঠ করেন— ইহাই গ্রন্থকারের আশা।'

এণ্ট্রান্স পর্যন্ত না-পড়া চিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামে হঠাৎ দেশসেবার ঝড় তুলল। নিজের বিধবা মাকে সর্বস্বান্ত করে, তাঁতিদের মেয়ে রামমনিকে নিয়ে একদিন সে চলে গেল কৃষ্ণনগবে। সেখানে একটি 'স্কুল' প্রতিষ্ঠিত করা হল। কয়েকজন ঝি ও 'বিধবা ভগিনী' সেখানে পডতে শুরু করল।

২৪ বৎসবের কম বয়স্কা দেখলেই চিনিবাস সিংহ-বিক্রমে তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলে,—'তোমাব আর ভয় নাই, আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। অন্নবস্ত্র প্রভৃতি দানে তোমাব শাবীবিক দুঃখ দুব করিব। এস আমার সঙ্গে, খরচ দিয়া তোমাকে স্কুলে পডাইব।' একদিন সেই স্কুলেব 'ভগিনী'দের ঘোডদৌড়ের ব্যবস্থা হলো। পাঁচজন 'ভগিনী' তাতে অংশগ্রহণ করলেন। রামমণি ঘোডা থেকে পড়ে আহত হলেও তাকেই প্রথম পুবস্কার দেওয়া হলো। কলকাতার 'ইংলিশম্যান' 'ষ্টেটস্‌ম্যান', 'ডেলি নিউস' 'হিন্দু-পেট্রিয়ট', 'মিরর' এবং 'অমৃতবাজাব পত্রিকায়' এই বিবরণ পাঠান হলে চিনিবাসের প্রশংসায় চারদিক মুখরিত হয়ে উঠলো। কলকাতাব টাউন হলে চিনিবাস-মহোৎসবের বিরাট আয়োজন হলো। এদিকে কৃষ্ণনগরে তখন দলে দলে যুবকেরা 'প্রিয় ভগিনীদের' সাহচর্য লাভেব আশায় চিনিবাসেব কাছে যাতায়াত শুরু করলো। ধনঞ্জয় বাচস্পতি নামক একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্রকে উদ্ধার করে চিনিবাস ধনঞ্জয়ের নামে দাঙ্গা হাঙ্গামার মিথ্যা অভিযোগ আনল। সেই ব্রাহ্মণের সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে ঢিল মেরে চিনিবাস হত্যা করে। ধনঞ্জয়ের একমাত্র পুত্র ননীগোপাল পিতাব বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ায় কলকাতার লবঙ্গলতা পত্রিকায় লেখা হলো—'ধর্মের কি অনির্বচনীয় প্রভাব। ধর্মের জন্য পরশুরাম মাতাকে বধ করেন, ধর্মের জন্য মহাবীর কর্ণ নিজ অঙ্গ কাটিয়া ইন্দ্রকে অক্ষয় কবচ প্রদান করেন, দুর্যোধনের রাজসভায় দ্রৌপদী বিবস্ত্রা হইলেও ধর্মের জন্য পঞ্চপাণ্ডব নীরব রহেন, ধর্মের জন্য রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে বনে পাঠান, আর আজ সত্যধর্মের জন্য ননীগোপাল পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া পিতার তিন

বৎসর কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা ঘটাইয়াছেন। অহো! ধর্মের কি আশ্চর্য বিকাশ!' নিরপরাধ ধনঞ্জয় ইংরেজের কাবাগারে অনাহারে থেকে মৃত্যুবরণ করলেন। পিতার মৃত্যুর পর 'উপযুক্ত পুত্র' ননীগোপাল একটা আনন্দভোজের ব্যবস্থা করলো। কলকাতার উইলসন হোটেল থেকে পাঁচশ টাকার খাবার কৃষ্ণনগরে গেল। বাচস্পতি সারা জীবনে যা সঞ্চয় কবেছিলেন, তার প্রায় সবই শ্রাদ্ধে ব্যয়িত হলো। চিনিবাস কৃষ্ণনগর জয় সম্পূর্ণ করে কলকাতা জয়ের জন্য স্থায়ীভাবে কলকাতায় গিয়ে বসবাস শুরু করল। বামমণি এখন সংস্কৃতে কথা বলে, সংস্কৃত শেখার জন্য তাব কাশী যাবাবও ব্যবস্থা হলো।

চিনিবাসের মায়ের অবস্থা এদিকে খুব শোচনীয়। তিনি এখন বৃদ্ধা। তাঁর যা ছিল চিনিবাসকে সবই দিয়েছেন। এমনকি ভিটেমাটিও বিক্রী করে চিনিবাস টাকা নিয়ে গেছে। একজন প্রতিবেশী তাদেব কুঁড়ে ঘবে তাকে থাকতে দেন। সেই ঘবে অঝোরে বৃষ্টি ঝবে, যেদিন সুতো কাটতে না পারেন সেদিন বৃদ্ধার খাবাবই জোটে না। বৃদ্ধাব মুখে কিন্তু চিনিবাস ছাডা আর কোন কথাই নেই। এক প্রতিবেশিনী বালিকা বৃদ্ধাকে খুব ভালবাসতো। সে তাঁর স্বামীর সাহায্যে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসে। এখন চিনিবাস কলকাতার তথা বাংলা দেশেব একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাছাড়া সে এখন কলকাতার মিউনিসিপাল-কমিশনার হয়েছে। সবকাব তাঁব অসাধারণ লোক-হিতৈষিতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে বাজা উপাধি দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। সেই প্রতিবেশিনী বালিকার স্বামী অঘোর চট্টোপাধ্যায় চিনিবাসের সঙ্গে দেখা করে তার মায়ের কথা জানালে চিনিবাস অবাক বিস্ময়ে বলল, 'আমাব মা কে? কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুদের যখন সহমবণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখনই আমার মাতা, পিতার সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন।' বৃদ্ধা কিন্তু চিনিবাসকে দেখার জন্য অস্থির, তাছাডা তাঁর রোগ-শোকে শীর্ণ শরীবটি যে-কোন মুহূর্তে ধ্বংস হবার সম্ভাবনা। এদিকে তখন চিনিবাসের 'রাজা' উপাধি উপলক্ষে বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হলো। অসংখ্য 'ভ্রাতা' 'ভগিনী'র আলাপ-কুঞ্জনে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠলো, 'মহোৎসব-উন্মত্তা মহিলাকুলের মধুমুখের মধু-মাখা কথায়, আসর মাৎ হইয়া উঠিল; পরশ-পাথর পুরুষকুলও প্রকৃতির সেবায় কার্য্যতৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন। কোন কামিনী কৌতুক করিয়া কোন পুরুষের গাত্রে গোলাপ ফুল ছুড়িয়া মারিলেন। পুরুষপ্রবর সেই কোমল-কামিনী হস্তপ্রক্ষিপ্ত নিজ-অঙ্গ-ঘর্ষিত, ভূপতিত, গোলাপ পুষ্পটিকে কুড়াইয়া লইয়া

একবার চুম্বন করিয়া, আপন বক্ষে তাহা ধারণ করিলেন। কোন মধুরহাসিনী, ঈষৎ কর্ণাভরণ দুলাইয়া আড়-খেমটায় তালে তালে পা ফেলিয়া, নীরবে প্রচ্ছন্নভাবে, কোন পুরুষের পশ্চাৎ-প্রদেশে উপস্থিত হইয়া অলক্ষে তাঁহার গলদেশে বেলফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। পুরুষপ্রাণ চমকিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, যেন ফুলময়ী বাসন্তীলতা গৌরবে স্ফীত হইয়া, মলয়ানিলের মন্দ মন্দ হিল্লোলে, মৃদু মৃদু দুলিতেছে। তখন পুরুষ, নয়নদ্বয় অর্ধ-মুদ্রিত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব আবম্ভ করিলেন, হে দেবি! হে সুবসুন্দরী! হে বিলোল লোচনি! তুমি কে, আমায় পরিচয় দাও। ......আবার ওদিকে দেখ, কোন তৃষাতুবা কামিনীর জন্য, কোন পুরুষ গোলাপী সরবৎ লইয়া ধাবিত হইয়াছেন; কোন হিমাঙ্গিনীর চা খাইতে সাধ হওয়ায়, পুরুষ গরম গরম চা, চামচে কবিয়া তুলিয়া, কামিনীব অধবে ঢালিয়া দিবাব সুখানুভব করিতেছেন। কোন পদ্মিনী সভা মধ্যে বিষম সর্দিরোগে আক্রান্ত হওয়ায়,—সুচিকিৎসক লালবর্ণ দ্রবময় মহামধুব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।' এমন সময় অঘোরবাবু চিনিবাসেব বৃদ্ধামাতাকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধা চিনিবাসকে আবেগে, আনন্দে জড়িয়ে ধরলে, চিনিবাস ভয়ে, সংকোচে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন রামমণি সক্রোধে চিনিবাসকে বলল—'রাজন্! কিং করিতেছং—ইয়াং বৃদ্ধাং দুষ্টাং পাপিনিং ভিখাবিনীং পদাঘাতং কৃত্বাং দূবং কুরু, দূবং কুরু।' দারোয়ান সজোবে বৃদ্ধাব গলা টিপে ধবলে তিনি মূর্চ্ছিতা হয়ে মারা গেলেন। নিমতলায় 'চন্দন কাষ্ঠেব মধ্যে বৃদ্ধার জ্বালাময় দেহ ভস্মীভূত' হলো।

'নেড়া-হবিদাস'-এব (১৯০১) উদ্দেশ্য কিন্তু ভিন্ন। এই গ্রন্থে তিনি ভণ্ড বৈষ্ণবতাব তীব্র বিবোধিতা করেছেন। মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'নেড়া হরিদাস, বর্তমান শতাব্দীর শ্রীমদ্ভাগবত, পাষণ্ডদলনের নিমিত্ত, এবং জীবের উদ্ধাবের নিমিত্ত প্রকাশিত। অপধর্ম-পাপাগ্নিতে যে সকল পতঙ্গ পুড়িয়া দগ্ধ হইতেছে—সেই পতঙ্গকুলকে দিন থাকিতে সতর্ক করাই, এই নেড়া হরিদাস গ্রন্থের উদ্দেশ্য।...নানাস্থানে ধর্মের ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম-দোকানদারের দোকান বন্ধ করিবার নিমিত্তই এই নেড়া হরিদাস গ্রন্থের উৎপত্তি। প্রকৃত বৈরাগ্যের সহিত মর্কট বৈরাগ্যের তারতম্য কি?[৬] —এ রস-রহস্য অবগত আছ কি? যদি না জানিয়া থাক, তবে শ্রবণ কর,—

প্রকৃত বৈরাগী সকল সমাজেই সমভাবে সমাদৃত। কিন্তু কালমাহাত্মে সেরূপ বৈরাগীর সংখ্যা কিছু কম হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল বৈরাগ্যের বাহ্

আড়ম্বর লইয়াই অনেকে ব্যতিব্যস্ত—শাস্ত্রোক্ত বৈরাগ্যের সমাচার অতি অল্প লোকেই রাখিয়া থাকে। বিষয়ে বিরক্তি বা অনাসক্তিই বৈরাগ্যের লক্ষণ। কিন্তু বাহিরে লোক দেখাইবার জন্য এই বিরক্তি বা অনাসক্তির ভান বা অভিনয় করিলে চলিবে না—মনে মনে বিষয়ে বিরক্ত হওয়া চাই। যে মহাজন, বাহিরে বিষয়ীর মত থাকিয়াও, মনে মনে বিষয় ভোগী হইয়াও বাহিরে বৈরাগী—আপনাকে 'বৈরাগী' বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য সতত সচেষ্ট, সে ব্যক্তি প্রকৃত 'বৈরাগী' নামধারণের অনুপযুক্ত,—তাহার প্রকৃত উপাধি—'মর্কট' বৈবাগী। ভণ্ড মিথ্যাচার, বকধর্মী, ধর্মধ্বজী, বৈডালব্রতিক বা বিড়ালতপস্বী প্রভৃতি উপাধিগুলি তাহাদের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। এই মর্কট বৈরাগীর উদ্ধারের আশা অতি অল্প—নাই বলিলেই হয়।.... খাঁটি গো-দুগ্ধে মূত্র মিশিতেছে। এক আধ ফোঁটা মূত্র হইলে, তত ধর্তব্যের বিষয় হইত না। এ যে বড় ফোঁটা,—সংখ্যায়ও নিতান্ত কম নহে, দেখিলেই ভয় লাগে। এই ঘোর দুর্দিন দূর করিবাব নিমিত্ত নেডা-হবিদাস গ্রন্থ প্রচারিত হইল।' কাহিনীর নায়ক নেড়া হরিদাসের আসল নাম 'দে মহাশয়'। বয়স প্রায় ৫৬ বছর—আকৃতি খর্ব, বং মেটে এবং গোঁফ কামানো। তাঁর মুখে সব সময় 'রাধাকৃষ্ণ-গৌর গৌর' বুলি, হাতে এক বৃহৎ হরিনামেব ঝুলি। তিনি কোন জমিদারের নায়েব ছিলেন। সেখানে তহবিল তছরুপেব দায়ে তাঁব ন'মাস কারাদণ্ড হয়। হবিদাসের আনেকগুলি 'গুণ' ছিল—তিনি সত্য কথা কম বলতেন, পরস্পরের মধ্যে ঝগডা বাধিয়ে দিতে তাঁর জুডি ছিল না। কুলকামিনীদেব সতীত্বনাশের গল্প বলতে তিনি আনন্দ পেতেন, অপবের ধাব কখনো শোধ করতেন না, মোকদ্দমা কবতে তাঁর মতো ওস্তাদ আর কেউ নেই এবং বিনা টিকিটে বেলগাড়ী চড়তেন। এহেন ব্যক্তিকে সবাই মেনে চলতো। তাঁব আসল পবিচয় সবাই জানলেও, ভয়ে সবাই তাঁকে সমর্থন করতে বাধ্য হতো। তিনি একদল গুণ্ডাগোছের শিষ্যকে দিয়ে নারীহরণ, পশুচুরি প্রভৃতি অপকর্ম করাতেন। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সর্বস্ব বিক্রী করে ১৮০০ টাকা জোগাড করেন। সেই টাকা দিয়ে কাশীবাসী হয়ে থাকাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু এত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক, তাই ব্রাহ্মণ সেই টাকা নেড়া-হরিদাসের কাছে গচ্ছিত রাখার প্রস্তাব জানালে, টাকার কথায় 'দে মহাশয়' কানে আঙ্গুল দিলেন—প্রায় মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হলো। কারণ, টাকা তিনি স্পর্শ করেন না। অবশেষে ব্রাহ্মণ নেড়া-হরিদাসের শ্যালিকার কাছে টাকা জমা রেখে কাশী চলে যান। হরিদাসের

সঙ্গে কথা হয়, প্রতিমাসে তাঁকে ১০ টাকা করে পাঠান হবে। এদিকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল, ব্রাহ্মণ কোনো টাকাই পেলো না। বাড়ীওয়ালা গলাধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিলে ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক অতিকষ্টে একটি কলকাতাগামী নৌকা করে দেশে আসেন। ব্রাহ্মণের মুখে টাকার কথা শুনে নেড়া-হরিদাস যেন আকাশ থেকে পড়লেন। দেশের কেউ ব্রাহ্মণের কথা বিশ্বাস করলো না। অবশেষে অনেক নির্যাতন করে অনেকদিনের উপবাসী ব্রাহ্মণকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। ব্রাহ্মণ অনেক ঘুরে ঘুরে অবশেষে এক ধনী মহিলা—বৃন্দার শরণাপন্ন হলেন। বৃন্দা নেড়া হরিদাসের অপকীর্তি সম্বন্ধে সম্যক পরিচিতা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের টাকা উদ্ধার করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। 'নেড়া হরিদাসের' সঙ্গে কৃত্রিম প্রেম-প্রীতিব সম্পর্ক পাতিয়ে বৃন্দা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নেড়া হরিদাসকে লিখে দেবার কথা জানালেন। নেডা হবিদাসের রসনা লক্‌লকিয়ে উঠলো। সম্পত্তি রেজেষ্ট্রীর দিন নেডা হবিদাসেব সমস্ত পূর্বকীর্তি ফাঁস হয়ে গেলো, ব্রাহ্মণ তাঁব টাকা ফিবে পেলেন। বঞ্চিত, নির্যাতিত সব মানুষ তাদেব হাবান সমস্ত জিনিস আবার ফিরে পেলো। হবিদাস দুঃখে অপমানে কিছুদিন পবেই মারা গেলেন। ভণ্ড বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণেব মধ্যে রয়েছে সমাজের আবর্জনা দূর করার প্রয়াস। যোগেন্দ্রচন্দ্র সমাজস্থিতিকে বজায় রাখার পক্ষপাতী হলেও, ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেননি। এ-যুগের সামাজিক বিদ্রূপাত্মক প্রহসনগুলিতে এ-মনোভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য কবা যায়। মধুসূদন একদিকে লেখেন 'একেই কি বলে সভ্যতা', অপরদিকে লিখেছিলেন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।'

'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' বাংলা-ভাষায় প্রকাশিত সর্ববৃহৎ উপান্যাসগুলিব মধ্যে অন্যতম। প্রায় ৯৫০ পৃষ্ঠার এই উপান্যাসে যোগেন্দ্রচন্দ্র অতীতের স্মৃতি-রোমন্থন, মানবতার জয়গান, ইংরেজ বিচার-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভণ্ড বৈষ্ণব ও অবতারবাদ, সমাজের গ্লানি ও অদৃষ্টবাদের কথা আলোচনা করেছেন। হিন্দু-পুনবভ্যুত্থানবাদের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলেও গ্রন্থের মাঝে মাঝে 'পুনরভ্যুত্থানবাদী' দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীটা সংক্ষেপে এই : শঙ্করীপ্রসাদ নামক একজন সৎব্যক্তি নিজের চেষ্টা এবং সততার সাহায্যে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হলে আত্মীয়-স্বজনেরা এসে ভিড় জমায়। তাঁর দুই ছেলে—ভবানীপ্রসাদ বড়, রমাপ্রসাদ ছোট। শঙ্করীপ্রসাদ দীনদয়াল নামে একজন ব্রাহ্মণকে অন্যায় পুলিশ-জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করে তাকে বিদেশে

পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন, তাঁর আশ্রিত রঘুদয়ালের বীরত্বে সারা বাংলা দেশ গর্বিত। রঘুদয়ালের বীরত্ব ও সততার জন্য কেউ শঙ্করীপ্রসাদের অনিষ্ট করতে পারতো না। শঙ্করীপ্রসাদের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। আত্মীয়-স্বজনেরা সমস্ত সম্পত্তি বিভিন্ন অজুহাতে গ্রাস করে। ভবানীপ্রসাদকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তাকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে। রঘুদয়ালেব অনুপস্থিতিতে একদল ডাকাত বাড়ী ঢুকে সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যায়। শঙ্করীপ্রসাদের বুদ্ধিমতী এবং ধর্মপরায়ণা স্ত্রী কাত্যায়ণী, ভবানীপ্রসাদের স্ত্রী যশোদা এবং তাঁব একমাত্র মেয়ে লক্ষ্মী ও রমাপ্রসাদকে নিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটাতে থাকেন। দিনেব পব দিন অনাহাবে কাটে, লক্ষ্মীর দুধটুকুও আর জোটে না। এই অবস্থায় কাত্যাযণীব একমাত্র সম্বল একটি মোহর ভাঙাবার জন্য রমাপ্রসাদকে কুঠী বাড়ীতে পাঠায়। সেখানে মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে আটক করে পুলিশে দেওয়া হলো। বঘুদয়ালকেও গ্রেপ্তার করা হয়। বঘুদয়াল অদ্ভুত কৌশলে গারদ ভেঙ্গে রমাপ্রসাদকে নিযে পশ্চিমে পালিয়ে যায়। কাত্যাযণী অধীব অপেক্ষায় বঘুদয়াল ও বমাপ্রসাদকে না দেখে মর্যাদা নষ্ট হবার আশঙ্কায় পুত্রবধূ ও নাতনীসহ ভূতনাথেব সঙ্গে দেশত্যাগ করেন। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তাঁবা পশ্চিমে গিয়ে ভিক্ষা করে দিন কাটাতে থাকেন। রঘুদয়াল কাশীতে এক পাগলা হাতীকে লাঠিব সাহায্যে নিহত করে বহুলোককে রক্ষা করাব পর পুলিশেব ভয়ে বিজন বনে পালিয়ে যায়। বঘুদয়ালের দুইশিষ্য-লাঠিয়াল—শিয়ালমারা ও সনাতন পুলিশের ভযে বাংলা থেকে পালিয়ে গিয়ে অবতাব সেজে প্রচুব অর্থ সংগ্রহ কবে। ভবানীপ্রসাদ অমর সিংহ ছদ্মনামে অনেক দেশ ঘুবে দীনদয়ালবেশী পীতাম্ববের একমাত্র পুত্রকে বাঁচিয়ে তাঁর আশ্রয় লাভ করেন। এই পীতাম্বরকেই ভবানীপ্রসাদেব পিতা পুলিসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। দীনদয়াল এখন বিরাট ধনী—প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী। ভবানীপ্রসাদও দীনদয়ালেব ব্যবসায়ে অংশীদাব হয়ে অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। তাঁকে সরকার 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। এমন সময় পশ্চিমে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রাজা অমর সিংহ সব জায়গায় অন্নসত্র খোলার ব্যবস্থা করেন। কাত্যায়ণী, যশোদা, লক্ষ্মীও তাঁর অন্নসত্রে আশ্রয় নেয়। অবশেষে তাঁদের সকলের মিলন হয়। রঘুদয়ালও এদিকে আদালত থেকে অব্যাহতি পেয়ে তার দুইশিষ্য সনাতন ও শিয়ালমারার সঙ্গে সেই আনন্দে অংশগ্রহণ করে। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের ধ্বংস হয়।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রধান গ্রন্থগুলির পরিচয় দেওয়া হলো। তাঁর বিভিন্ন মতবাদ টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে এ-গ্রন্থগুলিরর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সেগুলি আলোচনা করলে যে জিনিষটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো—ইন্দ্রনাথের মতাদর্শের সঙ্গে আশ্চর্যজনক মিল। ব্রাহ্মসমাজ, নব্যশিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, ইংরেজ-শাসন, বিচার-ব্যবস্থা, বিধবা বিবাহ, জাতিভেদ, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথের মতাদর্শ যোগেন্দ্রচন্দ্র সমর্থন করেছেন। একমাত্র প্রকাশভঙ্গী ছাড়া দুজনের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়না। এদিক থেকে তিনি ছিলেন ইন্দ্রনাথের যোগ্য শিষ্যের মত। ইন্দ্রনাথের মতো যোগেন্দ্রচন্দ্রও সমাজ-স্থিতিকে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। এজন্য বর্তমানের চেয়ে অতীতের দিকেই ছিল তাঁর অধিক দৃষ্টি। পুনবভ্যুত্থানবাদের এটি একটি বৈশিষ্ট্য। ইউরোপের ‘প্রতি-সংস্কারবাদ’ আন্দোলনে যেমন প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠান, নীতির উপব জোব দেওয়া হয়েছিল, যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতিও সেই রকম মনোভাব পোষণ কবতেন। উইটেনবার্গের ‘ক্যাসেন’ গীর্জায় লুথাব যে-বছব (১৫১৭) তাঁর ‘থিসিস’ টাঙিয়ে দিয়ে সংস্কারবাদের কথা ঘোষণা কবেন, সেই বছবেই রোমে ‘প্রতি-সংস্কারের’ জন্য চল্লিশজন পাদরিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল ‘Oratory of Divine Love’। এব সদস্যরা প্রার্থনা, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও নীতি প্রচাবেব দ্বাবা অধ্যাত্মিকতা জাগাবার চেষ্টা কবতেন। পোপের নেতৃত্বে প্রাচীন ‘ক্যাথলিক’ ঐতিহ্যকে রক্ষা কবার জন্য এ-সময়ে ইতালিব উদাবপন্থী মানবতাবাদী ও গোঁড়া শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। স্পেনেও নীতি, ঐতিহ্য-প্রীতি, সন্ন্যাস, বৈবাগ্যকে পুনর্জাগরিত করার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। জার্মাণ বহস্য, অতীন্দ্রিয়বাদও প্রভাব বিস্তাব করেছিল। ‘Teresa of Jesus’ (১৫১৫-১৫৮২) ছিলেন বিখ্যাত স্পেনিশ অতীন্দ্রিয়বাদী। তিনি নীতি ও প্রার্থনার উপর বিশেষ জোর দিতেন।

আধুনিক শিক্ষায় আমাদের নীতি ও মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মনে করে যোগেন্দ্রচন্দ্র এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ কবেছিলেন। ‘বাঙ্গালী-চবিত’-এ ‘শ্বাশুড়ী বউ’, ‘ননদ ভাজ’ ‘ঠাকুরমার কথা’ প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি আমাদের অতীত গার্হস্থ্য-জীবনের মাধুর্যের কথা স্মরণ করে বর্তমান সমাজের আত্ম-কেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার নিন্দা করেছেন। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের অনেক অপকার করছে বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। ‘শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী’র রঘুদয়ালের দ্রুতগমন শক্তি আমরা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলেছি বলে তিনি আক্ষেপ

করেছেন। এই আপেক্ষের মধ্যে কিছু প্রগতি বিরোধী মন্তব্যও শোনা যায়।

'এখন ইংরেজ রাজত্বের মধ্যাহ্ন, পূর্ণ সমৃদ্ধির কাল—ঘোর ঘটায় জয় ঘণ্টা চারিদিকে নিনাদিত,—এখন কিন্তু রেলপথ ব্যতীত, তাড়িত-পথ ব্যতীত, অশ্ব-যান প্রভৃতি অসংখ্য যান ব্যতীত, এ রাজত্ব কিছুতেই চলিবার নহে। আমরা এক পক্ষে যেন কলের মানুষ হইয়াছি; কলে রহিয়াছি; কলে উঠিতেছি, কলে বসিতেছি,—যেন নিজের অস্তিত্ব নাই। জল-কলের, আলোক-কলের, নর্দমা-কলের, পাইখানা-কলের, কলিকাতার প্রত্যেক গৃহই যেন কলে নির্মিত, কলে চালিত। প্রভাতে উঠিতে না উঠিতে দেখিবে, কথা নাই, বার্তা নাই—কল-সুন্দরী হুড় হুড় করিয়া তোমাকে জল দিতেছে। সন্ধ্যা সমাগত হইতে, তুমি ঘরে সন্ধ্যা দিতে না দিতে—দেখিতে পাইবে, পথে গ্যাসালোক বা বিদ্যুতালোক ঝলসিত হইতেছে। সে আলোকে তুমিও আলাকিত হইতেছ। আগে পাথরে লৌহ ঘর্ষণ কবিয়া সোলার সাহাযো আগুণ জ্বালিতে হইত; এখন দিয়াশলাই খস্ কবিয়া ঘসিলেই আগুণ এবং আলো! আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইতেছি না?—অকর্মণ্য হইতেছি না? অধিক আর কি বলিব, গান শুনিতে হইবে, এখন চৌষট্টি টাকা দিয়া একটি কল কিনিয়া আনিলেই হইল!—গোপাল উড়ের টপ্পা, কলে দিব্য গীত হইতে লাগিল! আমরা কি আত্মহাবা হইতেছি না? বৃত্তি নিচয় আমাদেব কি বিশুষ্ক হইতেছে না?

হইতেছি সবই। কিন্তু ইংবেজ-রাজত্বেব এই সুখ-বসন্তকালে এই সমস্ত না হইলেও চলিবে না। ধীবে, ধীরে, অল্পে অল্পে, তিলে তিলে আমাদের দেহ-মন ক্ষয় হইতেছে।' ····

হাবাণচন্দ্র রক্ষিত, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতো যোগেন্দ্রচন্দ্রও পরোপকারী, শাস্ত্র-অধ্যয়ণশীল, কোন কোন সময় টিকি-সর্বস্ব সাধারণ মানুষকে আদর্শোচিত করে চিত্রিত করেছেন। শিক্ষিত, ভদ্রশ্রেণীকে তিনি তো কোন আমলই দেননি, বরং নির্মম কটাক্ষে বিদ্ধ করেছেন। শিক্ষিত-ব্রাহ্মদের পাশাপাশি তিনি এ-চরিত্রগুলি সৃষ্টি করে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র রঘুদয়াল ও দীনদয়াল, 'চিনিবাস চরিতামৃত'-এর ধনঞ্জয় বাচস্পতি; 'মডেল ভগিনী'র রাবাশ্যাম এই জাতীয় চরিত্র। অতীত-গৌরবের স্মৃতি-বোমন্থন করতে গিয়ে তিনি অনেক বিষয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তার কথা উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রাচীন ভারতীয়

চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা করে এ রকমভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের তুলনায় তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছিলেন।[৭] রঘুদয়ালের সর্প-চিকিৎসা সম্বন্ধে যোগেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন, 'গোখুরা সাপে দংশন করিলে মানুষ বাঁচে কি? ডাক্তার কৃতান্তকুমার বি. এ এম. বি. বলিয়া উঠিলেন, না—বাঁচে না। সাপ কামড়াইবার পর, ক্ষতস্থানে বিষটা যদি ঢালিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মানুষ কিছুতেই বাঁচেনা। জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে, তদ্বারা সে বিষয়ের কিঞ্চিমাত্রও গতির প্রতিরোধ হইতে পারে।'

ডাক্তার-পুঙ্গব ভৈরববাবু এম. ডি. একথার অনুমোদন করিয়া কহিলেন, 'ঠিক কথা। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মানী, আমেরিকার বড় বড় শুভ্র চর্ম-বিশিষ্ট ডাক্তারগণ এ পর্য্যন্ত এ-রোগের ঔষধ বাহির করিতে পারেন নাই, এবং আমি নিজে কোন সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পুনর্জীবন লাভ করিতে দেখি নাই।'

বাবু বিক্রম কেশরী—বৈজ্ঞানিক নর শার্দুল কহিলেন—বিজ্ঞানের বল অসীম অনন্ত হইলেও, বিজ্ঞান বলে এক মুহূর্তে শত যোজন দূরস্থ পথের সংবাদ আনিতে পারিলেও, বিজ্ঞান কিন্তু এইখানে পরাজিত। বিজ্ঞানের ফাঁদ পাতিয়া চাঁদ ধরিতে পারি,—অধিক কি, এই বিজ্ঞান - বাগুডায় সমগ্র পৃথিবীকে বদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু বিজ্ঞান সর্পদষ্ট ব্যক্তির নিকট অজ্ঞান।' ···রঘুদয়ালের কালে সভ্যতা কিঞ্চিৎ কম ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের হাবড়ার ষ্টেশনে তখন বনিয়াদ পত্তন আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বহুলোক এ স্থানে জঙ্গল কাটা কার্যে তখন নিযুক্ত আছে মাত্র। সুতরাং তখন সভ্যতা-শ্বেতপদ্মের কুঁড়িটি মাত্র দেখা দিয়াছে। কাজেই, সে সময় রঘুদয়ালের নিকট সাপে কামড়াইবার ঔষধ ছিল। গ্রন্থকারও কিঞ্চিৎ অসভ্য। তিনি বিশ্বস্ত লোকের মুখে, সফল সর্প চিকিৎসার কথা শুনিয়াছেন, বিষাক্ত সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্য লাভ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে দেখিয়াছেন।'[৮]

ইন্দ্রনাথের মতোই ভণ্ড-বৈষ্ণবদের উপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। সে-সময়ে ভণ্ড-বৈষ্ণবদের দ্বারা সমাজ যেরকম ছেয়ে গিয়েছিল, তাতে এই বিরাগ খুব স্বাভাবিক ছিল। অনেকগুলি ভণ্ড-বৈষ্ণবের কুকীর্তির কথা শোনা যায়। বোম্বাইতে দেবতার সম্পত্তি চুরির অভিযোগে বৈষ্ণব মহারাজার মামলা শুরু হয় ১৮৮১ খৃঃ। এ-রকম আরো অনেক মামলা-মোকদ্দমার কথা সে সময়ে দেখা যায়। 'নেড়া হরিদাস', 'কালাচাঁদ', 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি গ্রন্থে এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র শিয়ালমারা, কাশীবাসী ও

সমাতনের বৈষ্ণব-মহাজন বেশ ধারণ এবং শিয়ালমারার কৃষ্ণ-অবতার রূপ গ্রহণের মধ্যে অনেক কিছু তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। এই যুগের হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানের অন্যতম পথিকৃৎ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কৃষ্ণানন্দ স্বামী নাম নিয়ে কল্কি-অবতার বলে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর নামে একটি জঘন্য মামলাও হয়েছিল। শিয়ালমারা চরিত্রে এই ঘটনার কিছুটা ছায়াপাত হয়েছে বলে মনে হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্র অনেকটা শশধরপন্থী হলেও এসব কারণে কৃষ্ণপ্রসন্নকে সহ্য করতে পারেন নি। তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধব গিরি এবং বারাণসীতে কৃষ্ণানন্দের মোকদ্দমা সম্বন্ধে তিনি 'বঙ্গবাসী'তে তীব্র ব্যঙ্গমূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সাধন-সঙ্গিনী গ্রহণের নামে শিয়ালমারার দেহ-বিলাস এবং শ্রীকৃষ্ণের পূর্বস্মৃতি স্মরণ উপলক্ষে চরম বুজরুকি প্রভৃতি ঘটনা পরবর্তীকালে পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা'র কথা মনে করিয়ে দেয়। কৃষ্ণপ্রসন্নের উপর বিরক্তি, বৈষ্ণব ধর্মের অতিরিক্ত অলস ভাবালুতার জন্য তিনি এই নির্মম আক্রমণ চালিয়েছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র কর্মবাদী ছিলেন; নিছক ভাববাদ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। যোগেন্দ্রচন্দ্রের এই তীব্র সমালোচনা সত্যি প্রশংসাযোগ্য। তিনি নির্ভীকভাবে সমাজদেহ থেকে এই বিষ দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'হিন্দুধর্মের দুর্দিন' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি গোঁড়ামির পরিচয় দেন নি। অতি সহজভাবে এই দুর্দশার কারণগুলি তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন। বিভিন্ন তীর্থ ক্ষেত্রে পাণ্ডাদের অত্যাচার, লোভ-পূজারী ব্রাহ্মণদের অর্থলিপ্সা ও ধর্মের-ব্যবসা যে ভাবে তখন বেড়ে যাচ্ছিল, তাতে তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন। ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করার চেষ্টা, দেব-মন্দিরে ইন্দ্রিয়সেবা, বিলাসিতা ও জাঁকজমকের তিনি নিন্দা করেছেন। নব্যহিন্দুদের প্রতি তীব্র কশাঘাত করতেও তিনি ছাড়েন নি। 'আজকাল আবার হিন্দুধর্মের একদল নূতন অভিভাবক জন্মিয়াছেন। হিন্দুধর্মটা তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছে। আহা, পূর্ব-পুরুষের সেই বুড়ো ধর্মটা বজায় না রাখিলে, তাঁহাদের আর মান থাকে কি? দশেরই বা উপকার হয় কৈ এবং নিজেরই বা নাম জাহির হয় কৈ? অতএব, তোল হিন্দুধর্মকে। কিন্তু এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে ভুবন ভরিয়াছে—আর সেকাল নাই। সুতরাং বর্তমান কালের সঙ্গে, হিন্দু ধর্মটাকে মাজিয়া ঘসিয়া, রিপু করিয়া মিলাইয়া লইতে হইবে। মুর্গি, পেঁয়াজ বাদ দিলে চলিবে না, সন্ধ্যার পর বন্ধু-বান্ধব লইয়া, একটু গোলাপী গোচ নেশা করা চাই। ক্লান্তি দূর এবং মনের স্ফূর্তির জন্য সভ্যা, শিক্ষিতা বারাঙ্গনাদের ভবনে গেলেও

দোষ নাই। টিকি, তিলক, সন্ধ্যা, আহ্নিক—কুসংস্কার। পৈতা গাচটা রাখিলেও হয়, না রাখিলেও হয়। সাকার দেবতা আবশ্যক বটে, কিন্তু আমার মত পণ্ডিত লোকের জন্য নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মই উপযুক্ত। আচার-ব্যবহারের সঙ্গে ধর্মের কোন সংশ্রব নাই। সত্যপ্রিয়, সদালাপী, সুভাষী, সুনীতিপরায়ণ, হিংসাহীন হইলেই হিন্দু হওয়া যায়। মুর্গি ধ্বংস কর, অথবা পেঁয়াজ-বংশ নির্বংশ কর—তথাপি তোমার হিন্দুয়ানি ঘুচিবে না। মুখে দুবার হিন্দু হিন্দু বল, আর দুটো সত্য কথা কও, তাহা হইলেই তুমি পুরা মাত্রায় হিন্দু। এই দল আপন আপন ইচ্ছামত এক একটা ঈশ্বর গড়িয়া লইতেছেন; যার যেমন সাধ হইতেছে, তিনি সেইরূপ ভূষণে ঈশ্বরকে ভূষিত করিতেছেন। কাহারও চৈতন্য হইতে বাসনা, কাহারও শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইতে সাধ, কেহ বা স্বয়ং বুদ্ধদেব বলিয়া আপনাকে ভাবিতেছেন এবং স্বপ্রণীত হিন্দু ধর্মটী, জনসমাজে প্রচার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন।'[৯]

শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন যেমন জলবায়ু, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন, যোগেন্দ্রচন্দ্রও তেমনি আধুনিক সভ্যতার তুলনায় ভারতের প্রাচীন আদর্শ ও নীতিবোধকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। 'ভাল কে, সভ্য না অসভ্য'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'রোগে-শোকে খৃষ্টানেরা মৌখিক সহানুভূতি জানায়, হিন্দুদের সহানুভূতি আন্তরিক, তারা বাইরে একটি কার্ডে নাম লিখে শোক প্রকাশ করে না। হিন্দুর দান পবিত্র। ভিক্ষুক, ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত কাউকে হিন্দু ফিরিয়ে দেয় না; কিন্তু সাহেবের বাড়ী গেলে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়, নয়ত দারোয়ানের গলাধাক্কা অনিবার্য। সাহেবেরা কোন কিছু দান করে সংবাদপত্রে নিজের নাম প্রচার করে, হিন্দু ডান হাতে দান করে, বাঁ হাতও টের পায় না। শিক্ষিত সাহেবেরা অনেক সময় ইচ্ছে করে মিথ্যা কথা বলে। ঘরে থাকলেও কেউ খুঁজলে দারোয়ানকে নেই বলতে বলে দেয়। হিন্দুরা চন্দ্র, সূর্য সাক্ষী করে শপথবাক্য উচ্চারণ করে। পরিশেষে হিন্দুনারীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'সাহেবী প্রেম কেমন? সভ্য জাতির স্ত্রী, স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আর একটা স্বামী লয়; —স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া আর একটা স্ত্রী লইতে পারে। ভালবাস, ভালবাসিব—আহার দিতে পার, তোমার হইব,—সুখে রাখ, মিষ্টি কথা শুনাইব—পেলা দাও, গান গাইব; সভ্য জাতির নীতিতে স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে এইরূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যেন প্রেমের বেচাকেনা

চলিয়াছে। কিন্তু হিন্দু-রমণীর অতুলনীয়, অপরিমেয় প্রেমের লক্ষণ সভ্য সাহেব-রমণীতে নাই। তোমার হৃদয় আমার হৃদয় এক—এ ভাব সাহেবের আছে কি? সভ্য দেশে সতীত্ব বাজার দরে যেন বিক্রীত হয়। আদালতে ক্ষতি পূরণের টাকা দিলেই দুষ্টলোক নিষ্কৃতি পায়। হিন্দু রমণীর সতীত্ব প্রাণের অপেক্ষা গরীয়ান,—শুধু অর্থদণ্ডে সে পাপেব প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে স্বতঃই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, ভাল কে? সভ্য ইউরোপ ভাল—না অসভ্য হিন্দু ভাল? খৃষ্টান, না হিন্দু! আমি মিল্ পড়ি নাই, বুদ্ধির ভ্রম হইতে পাবে; যাহা সোজা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিলাম; চিন্তাশীল পাঠক এ বিষয়ের বিচার করিবেন।'

'পুনরভ্যুত্থানবাদী' এই দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে সমালোচনার অতীত নয়। তাহলেও কয়েকটি বিষয়ে কিন্তু ইন্দ্রনাথেব মতো তিনিও প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। সে-যুগের ভণ্ড স্বদেশপ্রেমীদের মুখোস খুলে দিতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা কবেছিলেন। অবশ্য এই আক্রমণেব সময় সব বিষয়ে ব্রাহ্মদের জড়িয়ে তিনি সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইন্দ্রনাথেব মতো তাঁরও ধারণা হয়েছিল—ব্রাহ্মরা ইংবেজি শিখে, ইংরেজি আদব-কায়দা অনুকরণ কবে, চিনিবাসের ন্যায় ভণ্ড স্বদেশপ্রেমীতে পবিণত হয়েছিল। ব্রাহ্মদেব ইংবেজী-শিক্ষা ও ইংবেজ-সংস্পর্শ এই সন্দেহকে আবো বাডিয়ে তুলেছিল। অবশ্য এই মনোভাব সর্বাংশে সত্য কিনা প্রশ্ন উঠিতে পাবে। কারণ, আনন্দমোহন বসু, সুন্দবী-মোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দব চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও কর্মীবৃন্দ বৃটিশ-বিবোধী, স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র রাজনীতিতে গলাবাজী, প্রস্তাব পাশ প্রভৃতি বিদেশী নিয়ম-কানুনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর ধারণা ছিল, ভণ্ড-স্বদেশপ্রেমীরা ইংরাজের বিবোধিতা না করে দেশ-সংস্কাবেব কথা বলেন। ব্যক্তিগত জীবনে এই সংস্কাব কামীরা এক একটা ভণ্ড ছাড়া আব কিছুই নয়। 'গদাধর-চরিত'-এ তাঁর এই মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরু-চরিতের' কথাও এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে। গদাধরের মত ডমরুর চরিত্রেও অসার দেশহিতৈষিতা ও স্বদেশীভাব লক্ষ্য করা যায়।

দু'বার এণ্ট্রান্স-ফেল গদাই মাষ্টারদের দোষারোপ করে ভাবতে লাগল সে 'সংবাদপত্রের এডিটর' হবে, না দেশহিতৈষী হবে। অবশেষে সে দেশ সেবাকেই

চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করল। ভারত মাতার দুঃখে বিগলিত হয়ে সে দিনরাত শুধু বলতে থাকে—

'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি ;
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি !
সত্বরে কামস্কট্কা রেলপথ কবি,
ভাসিব আনন্দে ভাবত উদ্ধারি।'

এই প্রসঙ্গ স্মরণীয় যে এই গানটি হিন্দু মেলায় গীত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বিখ্যাত স্বদেশী গান 'মলিনমুখ চন্দ্রমা ভারত তোমাবি'র Parody।

দেখতে দেখতে গদাধবেব সুনাম চাবদিকে ছড়িয়ে পডতে লাগল। দিনরাত সে কেবল আয়নাব মুখ দেখতো, আব বিড বিড করে বলতো—'সব ঠিক, কেবল চীনে একজন দূত পাঠাইলেই হয়—উপযুক্ত পাত্র কে ? পাত্রের মধ্যে ত আমি আব মিঃ গোবর্দ্ধন। কিন্তু আমবা গেলে চলে কৈ ? তবে কি কামস্কট্কা বেল-পথ হওয়া ঈশ্ববেব অভিপ্রেত নহে ?' গদাই একা একা ভাবতে লাগলো ; আর মাঝে মাঝে বেশ জোবে জোবে বলে চলল,—

'একা আমি এ সংসাবে কোন্‌দিক্ রাখি,
দুইহাত দুই পদ, দুই নাসাপুট
দুটীব অধিক মোর নাহি কর্ণ-ছিদ্র,
হায়বে নাহিক জিহ্বা একেব অধিক,
সামান্য সম্বলে বল কেমনে পশিব,
কামস্বট্কা-ভূমি, হায় মোব কি যন্ত্রণা ?
কেননা হইল মোব দুইটি বসনা,
চারি চক্ষু চারি হস্ত, চাবিটি চবণ।
তা হলে কি আজ আমি ভাবিতাম এত ?
দুই চোক পাঠাইতাম চীন-উপকূলে,
একটি রসনা যেত লয়ে দুটী হাত—
(বক্তৃতাকারে নাড়িবার হেতু চীন দেশে)
এতক্ষণ চীনরাজ কাঁপিত সভয়ে—
পায়ে ধরি ভাব করিত, দিত ভূমি ছাড়ি ;
চলিত বাষ্পীয় যান গভীর গর্জনে
ঘোর রবে ঘর্ঘরিয়া ঘুরিয়া উঠিত

গিরিশৃঙ্গে, বঙ্গে ভঙ্গে মাতঙ্গ যেমতি
ধায় মাতঙ্গিনী-পিছে পর্বত-উপরি।
কিন্তু একা আমি; যোড়া যোড়া নাই বস্তু
কি করিতে পারি? ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে
আসি কবি করে উপাড়িয়া ডানচক্ষু,
চিরিয়া বসনা, ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু
ফেলি চৈনিক প্রাচীবে।'

এমন সময় একটি লোক এসে গদাইকে ডাকল। গদাই তাকে চিনতে না পারার ভান কবে অবাক বিস্ময়ে বললো—

'নিবাস কোথায় তব ঘব কোন্ দেশে?
কভু তুমি নহ বঙ্গে মিষ্টর গোবব।
বঙ্গ ভূমি জন্ম-ভূমি নহে রে তোমাব।
জাতীয় লক্ষণ নাই তোমার শবীরে।
হ্যাট, কোট কৈ তব? গলায় কলার কৈ?
একি বস্ত্র পবিধান?—লাজে মরি দেখে
ফিঙে ফিঙে কাণি—নীচে তাব কাল ডোরা,
উপবে উলঙ্গ অঙ্গ—বঙ্গ ভঙ্গ দেখি
শিহবে আতঙ্কে অঙ্গ মোব, হায় বিধি
কি মাটিতে গড়েছিলে এ নব-মূবতি?'

আগন্তুকেব নাম হরিদাস, গদাধবেব স্বগ্রামবাসী। গদাই হবিদাসের কাছ থেকে ৩০০৲ টাকা ধাব নিয়েছিল। সেই টাকা এখনো শোধ করেনি। তাই হরিদাস এসেছে টাকার তাগাদায়। সে গদাইকে শুধু শুধু টাকাই ধার দেয়নি, নারী-সংক্রান্ত মামলায় পুলিশের হাত থেকে বক্ষা কবেছে। গদাই দুভিক্ষ-ফাণ্ডের টাকা আত্মসাৎ করলে তখনো বাঁচিয়ে দিয়েছে, অভাবে সাহায্য করেছে, আরো কতো কি। গদাই অচেনার ভান করলে হরিদাস রেগে ওঠার পর গদাই-এর বক্তব্য:

'শুন বন্ধু নিবেদন—ক্রোধ কর কেন?
মন মোর মজিয়াছে ভাবতের ভাবে
ভাই, বন্ধু মাতা পিতা মনে নাহি পড়ে,
মুখ দেখি আর কারো চিনিতে না পারি,

তুমি হে পরমাত্মীয়, বৈস মোর কাছে,
ভাল কর্ম দিব ভাই ! কামস্কট্‌কার পথে।'

হরিদাস এই ভণ্ডামিতে বিরক্ত হয়ে চলে যাবার উপক্রম করলে, গদাই তাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে কি যেন বললে ; তারপর গদাই দৌড়ে পালিয়ে গেল।

'গদাধর-চরিত' নানাদিক থেকে ইন্দ্রনাথের 'ভলন্টীয়রী কাব্য' এবং 'ভারত উদ্ধার কাব্যের' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ছদ্ম-স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে যোগেন্দ্রচন্দ্র ব্রাহ্মদেরই যে বিশেষভাবে জড়িয়েছিলেন তার প্রমাণ 'চিনিবাস চরিতামৃত'-এ পাওয়া যাবে। ভিখারী গৌরদাস কুরুচিপূর্ণ গান গাইতে গাইতে ভিক্ষা করতে এলে তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বব শুনে চিনিবাস তাকে স্বদেশের কাজে লাগাবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। ভিখারীকে—

বাজরে শিঙ্গে বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে।
সবাই জাগ্রত মানেব গৌরবে,
ভাবত শুধুই ঘুমায়ে বয়।
আববা মিশর পারস্য তুরকী,
তাতাব তিব্বত অন্য কব কি।
চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান
ভাবত শুধুই ঘুমায়ে রয়।'

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাবত সঙ্গীতের' (১৮৭০) এই গানটি শিখিয়ে তালিম দেওয়ার কথা তুললেন চিনিবাস। এটা ব্রাহ্মদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

যোগেন্দ্রচন্দ্রেব এই সমালোচনা একেবারে নঙর্থক নয়। এ-বিষয়ে তাঁর একটা ধারণা ছিল। 'কাল্পনিক স্বদেশানুরাগ' নামক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'স্বদেশানুবাগ বড শক্ত পদার্থ। সহজে দেশের প্রতি মমতা জন্মেনা, শিক্ষা চাই, সচরাচর এক পুরুষে প্রকৃত দেশহিতৈষিতা জন্মেনা—দুঃখ এই, আমাদেব দেশে অনেক বিডালতপস্বী হইয়াছেন, আগাছা জন্মিয়া জঙ্গলময় দেশকে আরও জঙ্গলময় করিতেছেন। স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে হয়, হৃদয়ের শোণিত দিতে হয়, স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। আমাদের দেশের স্বদেশানুরাগী

পুরুষের আত্মত্যাগ দূরে যাউক,—তুই পয়সার জন্য কাতর। ম্যাট্‌সিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, সংসার সুখ ছাড়িয়া, অর্থলোভ দমন করিয়া কতকাল অন্নকষ্টে থাকিয়া স্বদেশের কার্যে ঘুরিয়াছিলেন। তেমনটি এখানে কে আছেন? আমাদের দেশেব লোকের কার্য দেখিয়া ধিক্কার জন্মিয়াছে। সকলি কাল্পনিক, সকলি মৌখিক। তাই বলিতে হয়, দেশ অন্ধকারময়; বাঙ্গালী যে জড় পদার্থ, সেই জড় পদার্থ আছে,—যেরূপ নির্জীব ক্ষীণবল ছিল, এখনও সেইরূপই আছে। শক্তিবৃদ্ধি হয় নাই,—চলিতে শিখে নাই, হামাগুড়ি দিয়া সেইরূপই চলিতেছে,—চক্ষু ফুটে নাই—পবেব চোখে সেইরূপই আবছাওয়া দেখিতেছে; লাভের মধ্যে এখন আমবাও ভণ্ড তপস্বীর প্রতাপে মারা যাইতেছি। ইহাব প্রতিকার না হইলে আমাদিগেব আর মঙ্গল নাই।'

যোগেন্দ্রচন্দ্রের এই মনোভাব সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত না হলেও, তাঁর স্বদেশপ্রেম প্রশংসনীয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দেশকে ভাল না বাসলে মনে স্বদেশপ্রেম জাগে না। দেশের মাটির সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে, দেশপ্রেম বাহ্যিক চাকচিক্য ও আড়ম্বরে পবিণত হয়। 'জাল রাজনীতি' প্রবন্ধের শেষে তিনি বলেছেন, 'দেশের বিশ্ব-প্রেমিকগণেব নিকট যোডহাতে নিবেদন, আপনারা স্বধর্মে ভক্তি, স্বজাতিব ক্রিয়া কর্মে ভক্তি করিতে শিখুন; তাবপর দেশের লোকেব সহিত মিশিয়া, বাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করুন, এখন পাষাণে পদ্মফুল ফুটাইবাব জন্য কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছেন? হাত বাড়াইয়া চাঁদ পাড়িবার জন্য কেন মাথা কুটিতেছেন।' উক্তিটির মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব প্রতি কটাক্ষ থাকাও অসম্ভব নয়।

ইংরেজের শাসন ও শোষণকে ইন্দ্রনাথেব মতো তীব্রভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না করলেও, যোগেন্দ্রচন্দ্র ইংরেজ-প্রশাসন ও বিচাব-ব্যবস্থাকে সর্বাধিক সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, পুলিশ-ব্যবস্থা অত্যাচারের একটি যন্ত্রবিশেষ। সাক্ষীরা চরম মিথ্যাবাদী, ম্যাজিস্ট্রেটবা সুবিচারের ধার ধারে না, প্রভাব-প্রতিপত্তির কাছে তারা মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। পুলিশ জোর করে অন্যায়ভাবে নির্দোষ লোককে আটক রাখে, মিথ্যা সাক্ষী না দিলে জোর-জুলুম করে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের সমসাময়িক কালে এ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। একটি বিখ্যাত পত্রিকায় ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার ও পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে লেখা হয়েছিল—'We have read with feelings of lively indignation the facts disclosed in a recent judgment of the presidency

Magistrate Mr. Gupta, in which three policemen; one an inspector of police, were charged with wrongful confinement and cheating······There are hundreds and, we were going to say thousands, who have been made the victims of this unrighteous and iniquitous enactment, but whose sufferings and complaints neither the public nor the Government have the means of knowing. These unhappy people suffer and they suffer in silence.'[১০]

সরকার ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থা সংশোধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু আসল গলদ থেকেই যায়। সেজন্য সংশোধনী-বিলের প্রতিবাদ করে লেখা হয়েছিল· · —'Under proper precautions, the retention of the accused for sufficient reasons will, as now, be allowed, but the period of retention has been limited to fifteen days in the whole. This is a dangerous provision and is liable to be worked as a powerful engine of oppression by the unscrupulous police. We know and our readers know how the police carry on their investigations in the criminal cases, in the mofussil. We all know how confessions are extorted from the accused, and when confessions are not forthcoming, how he is treated by the inquiring police officer. At one time, the police officer holds out false hopes to the accused and his friends, who in the hour of anxiety believe all that he says and bringforth their hidden treasures to propitiate him...'

শুধু পুলিশ নয়, অনেক মফঃস্বল-ম্যাজিষ্ট্রেটও পক্ষপাতদুষ্ট বিচারের জন্য দায়ী ছিলেন। অনেক সময় তাঁরা নিজেদের কাজের যোগ্য ছিলেন না। মফঃস্বল ম্যাজিষ্ট্রেট সম্বন্ধে সেই পত্রিকায় (৮ই জানুয়ারী ১৮৮১) লেখা হয়েছিল, 'In Our REPROSPECT of the year, we called prominent attention to the proceedings of several of our Mofussil Magistrates who had set the law at defiance and who had grossly abused their authority. The safety of British rule in India, its prestige and

its good name, depend in no small measure upon the impartial and efficient administration of justice.'

যে পত্রিকা থেকে (বেঙ্গলী) এই উদ্ধৃতিগুলি তোলা হয়েছে তা ছিল উদার মতাবলম্বীদের মুখপত্র। সাধারণভাবে ইংরেজ ও ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে সেই পত্রিকা আদৌ বিরোধী ছিল না। ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি এ-রকম আস্থা যোগেন্দ্রচন্দ্রের মধ্যে নেই বললেই চলে। কাজেই তিনি আরো মর্মান্তিকভাবে ইংরেজ বিচার-ব্যবস্থার ভুল-ত্রুটিগুলি দেখাতে পেরেছেন। 'মডেল-ভগিনী'র রাধাশ্যামের বিচার-প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। রাধাশ্যামকে বিনা অপরাধে পুলিশের একজন অধ্যক্ষ গ্রেপ্তার করেছিলেন, সেই অধ্যক্ষই বিচারের সময় ধীরে ধীরে ম্যাজিষ্ট্রেটের পাশে এসে বসলেন, তখন 'পরস্পর কানে কানে কি কথা হইল। হাসি তামাসা হইল। মাজিষ্টর তখন বন্দিগণের পানে আঙ্গুল হেলাইয়া অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসিলেন, "ইহারাই কি ডাকাত?" অধ্যক্ষ বলিলেন,—"হাঁ"।

'রামপ্রসাদের যত্নে ব্রাহ্মণের পক্ষ-সমর্থনার্থ এলাহাবাদ হইতে একজন প্রবীণ ইংরেজ-বারিষ্টর আসিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যকারী স্থানীয় উকীলও প্রায় আটদশ জন আছেন। বারিষ্টার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "এ মোকদ্দমায় আমার নানারূপ বাধাঘটিত আপত্তি আছে। সত্যের শ্বেতচিহ্ন ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। আপনি আজ স্বয়ং ধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ এই উচ্চ আসনে সমাসীন, তুলাদণ্ডে অতি সূক্ষ্মরূপে আপনি ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, ওজন করিয়া দেখিবেন, সহস্র সহস্র লোক আপনার সুবিচার দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া আছে, আপনার আজ পদগৌরব যেরূপ সুমহান্, দায়িত্বও সেইরূপ গভীর।......

বারিষ্টারের কথা শুনিয়া মাজিষ্টর যেন একটু আহ্লাদিত হইয়া, হাসি হাসি মুখে বলিলেন, 'আচ্ছা, আপনার যাহা বক্তব্য থাকে বলুন,—আমি তৎসমস্তই শুনিতে রাজি আছি।'

বারিষ্টার। আমার প্রথম কথা এই, আপনার আদালত হইতে আমি এ মোকদ্দমা উঠাইয়া লইব। আপনার নিকট এ মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে না।

মাজিষ্টর। (চমকিয়া) সে কি কথা! এরূপ কার্য কখনই হইতে পারে না, আমি এই মোকদ্দমার বিচার করিব বলিয়া প্রথম হইতে অভিলাষ করিয়াছি।

বিশেষ, এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমি সব কথা জানিয়াছি, সব কথা শুনিয়াছি, সুতরাং বর্তমান বিষয়ে আমি যেরূপ সুবিচার করিব, অন্য কেহ তেমন পারিবেন না।

বারিষ্টর। (ধীরভাবে) আপনি এই শাল-চুরি বিষয়ে সমস্ত কিছুই অবগত আছেন কি?

মাজিষ্টর। (সদম্ভে) হাঁ, আছি।

বারিষ্টর। (হাসিয়া) সেই জন্যই আমি আরও জেদ করিয়া বলিতেছি, আপনি এ মোকদ্দমাব বিচারে সম্পূর্ণ অক্ষম। বিশেষ, এই সম্ভ্রান্ত জমীদার শ্রীযুক্ত বামপ্রসাদ এই দরখাস্ত দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন যে, 'এই অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ যে ডাকাত—এ ধাবণা আপনার পূর্বেই হইয়াছে।' সুতরাং এরূপ স্থলে আপনি বিচাবক নহেন, একজন সাক্ষী মাত্র।

মাজিষ্টব। (ক্রোধে) আপনাব কোন কথাই সংলগ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমি মাজিষ্টর—আমি এ জেলার প্রধান বিচারক, আমি বিচার করিতে পাইব না, অন্য একজন বিচার করিবে, এমন কথা কখনই হইতে পারে না।

সেই বামপার্শ্বস্থিত অধ্যক্ষ—সাহেব মাজিষ্টবেব কানে কানে ফুস্ ফুস্ শব্দে কি কথা বলিতে আরম্ভ কবিলেন।

বাবিষ্টার। শ্রীযুতেব নিকট আমাব এক্ষণে আর এক নিবেদন এই,—প্রকাশ্য আদালতে বিচাবকালে কোন পার্শ্বচব ব্যক্তির কানে কানে কথা কওয়া, মাজিষ্টরেব পক্ষে উচিত নহে। বিশেষ, অধ্যক্ষই অদ্যকার প্রকৃত অভিযোক্তা। যদি অধ্যক্ষের বা আপনাব পরস্পব মধ্যে কোন কথা বলিবার থাকে, তবে তাহা সর্বজন সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ কবিয়া বলাই বিধেয়।

মাজিষ্টব। (মহাক্রোধে) দেখিতেছি, ক্রমশ আপনি আদালতের অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন। এরূপ উপদ্রব কখনই সহনীয় নহে। কেবল আপনার চুল পরিপক্ব বলিয়া এবার আপনার মর্যাদা রক্ষা করিলাম, নচেৎ'……এমন সময় সন্ন্যাসীবেশী নগেন্দ্রনাথ রাধাশ্যামের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেবার জন্য উপস্থিত হলে অধ্যক্ষ তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মাজিষ্টর। এমন লোকের সাক্ষ্য সত্বর গ্রহণ করা উচিত। (সন্ন্যাসীর উদ্দেশে) আসুন, আপনি এই দিকে আসুন,—

বারিষ্টার দণ্ডায়মান হইলেন। নীচে বামপদ রাখিয়া, নিজ চেয়ারের উপর

দক্ষিণ পদ তুলিয়া, কোটের দুই পকেটে দুই হাত ভরিয়া, বুক ফুলাইয়া বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'আদালতের নিকট আমি বহু সম্মানপূর্বক নিবেদন করিতেছি, কোনরূপেই অদ্য এ মোকদ্দমা চলিতে পারে না, কিছুতেই এ মোকদ্দমার বিচার-কার্য আরম্ভ হইতে পারে না—যে আদালত আমার মক্কেলগণের উপর স্পষ্টত বিপক্ষতাচরণ করেন, সে আদালত দ্বারা আমার মক্কেলগণের বিচার-কার্য চলিতে পাবে না—আমি একথা মুক্তকণ্ঠে শতবার বলিতে পারি,… ..

মাজিষ্টর। (দাঁডাইয়া উঠিয়া) আমি আপনার দুইশত টাকা জরিমানা করিলাম,—

বারিষ্টার পকেট হইতে একশত টাকা করিয়া দুইখানি নোট বাহির করিয়া মাজিষ্টরেব সম্মুখে ধরিয়া দিলেন……।

মাজিষ্টর। আপনি কি এই সমস্ত বন্দীরই পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন?—না কেবল দলপতির?

বাবিষ্টাব। আমি প্রত্যেক বন্দীবই পক্ষসমর্থনকাবী।

মাজিষ্টব। আপনাব ওকালতনামায় কি তবে সমস্ত বন্দীর নাম লেখা আছে?

বাবিষ্টার। কাউন্‌সিলের আবার ওকালতনামা কি!—ইহা ত বড় আশ্চর্য কথা!

মাজিষ্টব। (হাসিয়া) ওহো! আপনি ওকালতনামা না দিয়া এতক্ষণ বৃথা তর্ক কবিতেছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ওকালতনামা না দিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার কোন কথা শুনিতে বাধ্য নহি।

বারিষ্টার। অদ্য ইহজীবনে এক নূতন বসাত্মক কথা শুনিলাম। কাউন্‌সিলের আবার ওকালতনামা কি? 'আমি অমুক পক্ষে নিযুক্ত হইলাম' বলিলেই যথেষ্ট হইল।

মাজিষ্টর। আমাব আদালতেব সেরূপ দস্তুর নহে,—ওকালতনামা ব্যতীত আমি কাহাকেও কথা কহিতে দিই না।

বারিষ্টাব। তবে আমি নাচার! আমি চলিলাম। আমার শেষ বক্তব্য এই,—এই মোকদ্দমা তিনদিন মাত্র মুলতুবি রাখিতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি?

মাজিষ্টর। হা হা রবে হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ গুরুতর

মোকদ্দমা বিচারে আমি কখনই কাল বিলম্ব করিতে পারি না। আমি অদ্যই ইহার চূড়ান্ত বিচার করিব।" বৃদ্ধ বারিষ্টার গম্ভীর মূর্তিতে সতেজে উঠিয়া চলিলেন।' শুধু রাধাশ্যামের মামলা নয়, রঘুদয়াল, ধনঞ্জয় বাচস্পতির ব্যাপারেও একই বিচার-প্রহসনের কথা উল্লেখ করেছেন যোগেন্দ্রচন্দ্র।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনা এবং বিষয়বস্তুব মোটামুটি একটা পবিচয় দেওয়া হলো। এ থেকে একটি কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি দারুণ রক্ষণশীল ছিলেন। জাতিভেদ, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁব রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্রনাথের মতো তিনিও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যঙ্গ কবে অধিকাংশ ব্যঙ্গ-কবিতাগুলি লিখেছিলেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতিভেদকে সমর্থন কবে 'ব্রাহ্মণের নবজাগবণ'-এর জন্য মনে-প্রাণে কামনা কবেছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রও বর্তমান ব্রাহ্মণের অধঃপতনেব কথা স্বীকার কবে ব্রাহ্মণেব নব-অভ্যুত্থান সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তাতে জাতিভেদ প্রথাকে পরোক্ষভাবে স্বীকাব কবা হয়েছে। ইন্দ্রনাথের প্রতিটি কথার সঙ্গে যেন তাব মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 'আম গাছ কখন আমড়া গাছ হয় না। আম গাছেব আম টক হইতে পাবে, আম গাছ বাঁজা হইতে পারে, কিন্তু আম গাছ, আম গাছই থাকিবে। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণই থাকিবেন।'[১১]

যোগেন্দ্রচন্দ্র বিধবা বিবাহের প্রবল বিরোধী ছিলেন। এজন্য বিদ্যাসাগরকেও তিনি কটাক্ষ কবেছিলেন। 'বঙ্গবাসী'র প্রথম সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় 'পতাকা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'বিধবা বিবাহ' সমর্থন করে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রতিবাদে 'মোটে বিবাহ হওয়া উচিত কিনা?' শীর্ষক একটি ব্যঙ্গ-বচনা লিখেছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুও 'চিনিবাস চরিতামৃত'-এ ঠিক একই মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। ......'আবার বলি, নারীর অবনতি (কবতালি)। চির কুসংস্কারেব বশীভূত হইয়া আমরা মারা যাইতেছি। স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-বায়াম, এবং বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, এসব সুপ্রথা আমাদের দেশে আছে কি? ইউরোপে ইহা আছে বলিয়া ইউরোপ রাজা, ভারতে নাই বলিয়াই ভারত প্রজা (ঘন করতালি)।......বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অনেক অতিরিক্ত সন্তান অবশ্যই জন্মিতে পারে। তাহারা তখন জঙ্গল-ভূমি আবাদ করিয়া

ভারতের দুঃখ বিমোচন করিবে। (করতালি) কোন কোন অল্প বুদ্ধি, অদূরদর্শী মানব বলিয়া থাকেন. "ভারতে পুরুষের সংখ্যা কম, স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, বিধবার বিবাহ হইলে, অনেক স্ত্রীলোককে পুরুষ অভাবে চির-কুমারী থাকিতে হইবে।" এ সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য, ভারতে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা সমান, বরং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিয়া দেখিলে, পুরুষেব সংখ্যাই অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চীন পরিব্রাজক হোয়েনশাং এ বিষয় বিশেষ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। আর্যভট্ট, মোক্ষমূলর, মিল, মেকলে, আর ও বাড়ীর মেজবাবু—এ সম্বন্ধে সকলেই একমত। সুতবাং প্রমাণ অকাট্য, শিরোধার্য। আব যদি মনে করেন, পুরুষেব সংখ্যা কম—অতএব বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে, অবিবাহিত বালিকারা চিরকুমাবীই থাকিবে,—তাহা হইলেও এক্ষণে আপাতত বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত। যখন পুরুষ অভাবে কতকগুলি স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই অবিবাহিত থাকিবে, তর্কের খাতিবে ইহা ধরিয়া লওয়া হইল, কেবল বিধবাবা ইহাব ফলভোগী হইবে কেন? সাম্য ও ন্যায়ের বিচাবে, কুমারীগণও ফলভোগ করিতে বাধ্য। নচেৎ পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হইতে হয়। পালা প্রথার সৃষ্টি হউক। আর তৎপব একশত বৎসব কেবল কুমারীদের বিবাহ হউক। এই সৎ সামঞ্জস্যে অধিক সুফল প্রসব কবিবে (কবতালি)।'

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মদেব অত্যধিক রুচিপবায়ণতাকে নিন্দা করে 'কুরুচিব সাঁকো' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রও 'বঙ্গবাসী'তে 'কুরুচি' 'রুচিকাব্য' শীর্ষক দুটি ব্যঙ্গ-রচনায় একইভাবে ব্রাহ্ম রুচিবাদের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁব অভিযোগ: 'কোন কোন নব্য বাবু বাবাজী-প্রকৃতিক হইয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হেতু, পরের কুলবধূকে ক্রমে যত অধিক লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ কবিলেন, ততই দিবসে লোকালয়ে তাঁহাব রুচি-মাহাত্ম্যের বক্তৃতা বাড়িতে লাগিল। কেহ যদি তাঁহাকে বলিল, "কদম্ববৃক্ষ",—তাহার উত্তর হইল, "ছি ছি! এ কথা মুখে আনিও না, কদম্ব নাম করিলেই আমার মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ মোহন বাঁশী হাতে করিয়া আড় নয়নে গোপিনীদেব পানে চাহিয়া আছেন—ক্রমে বস্ত্র-হরণেরও সব কথা স্মরণ হয়।" কদম্ব বলিলে, বরং রক্ষা আছে, দাড়িম্ব বলিলে, একেবারেই মূর্চ্ছা, বুঝি বা ডাক্তার ডাকিতে হয়। কোকিলের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন ফুলের ফোটন—সবই কুরুচি।' ব্রাহ্মদের নিন্দা কবলেও, যোগেন্দ্রচন্দ্র নিজেও বিশেষ প্রগতিশীলতার পরিচয় দিতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রকেও তিনি

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে ব্রজেশ্বর সাগর-বৌ-এর পা টিপেছিল বলে, যোগেন্দ্রচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, 'গ্রন্থকার বা তদীয় কোন বন্ধু বলিতে পারেন, সাগর-বৌয়ের ঐরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল, তাই স্বামীকে দিয়াই পা টিপাইয়া লইয়াছিলেন। জিজ্ঞাস্য,—প্রতিজ্ঞা যদি আরও কিছু উচ্চ অঙ্গের থাকিত, তাই বলিয়া কি তাহাও চিত্রিত কবিতে হইত?' 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস সম্বন্ধেও তিনি আপত্তি তুলেছেন। 'বিষবৃক্ষ ৫৬ পৃষ্ঠা পড়ুন! শ্রীশচন্দ্র এবং কমলমণি—স্বামী এবং স্ত্রী, পুত্রের নাম সতীশচন্দ্র। কমলমণি বাপের বাড়ী যাইবেন। .....

কমলমণি কৃত্রিম কোপ সহকারে কহিল "আমার খুসি, বলবো।"

শ্রীশচন্দ্রও কৃত্রিম কোপ সহকারে বলিলেন, "আমার খুসি, বলবো।"

তখন কোপযুক্তা কমলমণি শ্রীশকে একটি কিল দেখাইল। কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া ছোট হাতে একটি ছোট কিল দেখাইল।

কিল দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র কমলমণিব খোঁপা খুলিয়া দিলেন। এখন বর্দ্ধিত-রোষা কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের দোয়াতের কালি পিক্‌দানিতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিল।

রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতিতে ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখ চুম্বন করিলেন।' 'বিষবৃক্ষে'র ৬৪পৃষ্ঠার একটি গান শুনুন,—হরিদাসী বৈষ্ণবী, গৃহস্থ-ঘরে আসিয়া গান ধরিল,—

কাঁটা বনে তুল্‌তে গেলাম কলঙ্কের ফুল,
গো সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পর্‌লেম মালা গেঁথে, কানে পর্‌লেম দুল।
সখি কলঙ্কেবি ফুল।
মরি মরব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোঁথায় ফুটে,
নবীন মুকুল।

৬৮ পৃষ্ঠার একটি গান শুনুন,—

'মনের মতন রতন পেলে যতন কবি তায়।
সাগর ছেঁচে তুলব নাগর পতন করে গায়॥'[১২]

স্থান, কাল, পাত্রানুযায়ী এই সাহিত্যিক রঙ্গ-রসের আস্বাদন যোগেন্দ্রচন্দ্র করতে

পারেন নি। তাই রক্ষণশীল দৃষ্টিতে এগুলি অমার্জনীয় অপরাধ বলে তাঁর মনে হয়েছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র ও 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকেও ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেন। এঁদের প্রবল বিরোধিতার জন্য সেযুগে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও রবীন্দ্রসাহিত্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সেজন্য 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও অন্যান্য রচনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জনপ্রিয়' হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও এই গোঁড়ামিব প্রতিবাদে নিজের লেখনীকে পরিচালিত করেছিলেন। এঁদের 'সংস্কারবিরোধী হিন্দুয়ানী, পরগুণ-অসহিষ্ণুতা, অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি, যুক্তিহীন গলাবাজি এবং নিষ্কাম বাক্‌সর্বস্বতা'কে তিনি আক্রমণ করতেন। 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত ববীন্দ্রনাথের 'শ্রীমান দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু' কবিতাটির লক্ষ ব্যক্তিরা হলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও চন্দ্রনাথ বসু। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

'রব উঠেছে ভারতভূমে হিঁন্দু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন ভয় নেইক আর।
ওরে দামু, ওরে চামু! ··
লিখচে দোঁহে হিন্দুশাস্ত্র এডিটোরিয়াল,
দামু বলচে মিথ্যা কথা চামু দিচ্ছে গাল।
হায় দামু, হায় চামু!······
দামু চামু কেঁদে আকুল কোথায় হিন্দুয়ানি।
ট্যাঁকে আছে, গোঁজ যেথায় সিকি দুয়ানি।
খোলের মধ্যে হিন্দুয়ানি।
দামু চামু ফুলে উঠল হিন্দুয়ানি বেচে,
হামাগুড়ি ছেড়ে এখন বেড়ায় নেচে নেচে।'

'বঙ্গবাসী' পত্রিকাতেই টিকি-মাহাত্ম্য প্রচার করে যোগেন্দ্রচন্দ্র নিজেকে শশধর তর্কচূড়ামণির যোগ্য শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে সুবলচন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন, 'বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, এখনও কোন ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু সন্তান টীকি রাখিলে এবং গলায় মালা পরিলে কাহারও কাহারও নিকট 'বঙ্গবাসীর চেলা' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।'[১৩] কিন্তু সবচেয়ে আপত্তিকর হলো, যোগেন্দ্রচন্দ্র শিক্ষা—বিশেষভাবে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে চরম

প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। শিক্ষিত নারীসমাজের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল খুবই সঙ্কীর্ণ।

শিক্ষার অর্থ বলতে তিনি বুঝেছিলেন 'কার্যশিক্ষা'কে। অক্ষর পরিচয় ছাড়াও মানুষ কাজ শিখতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। অতএব ইংরেজি লেখাপড়া শেখার কোন প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেননি। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন, বর্ণ অনুযায়ী স্বতন্ত্র শিক্ষার ফলে দেশের মঙ্গল হবে। তাঁব নিজেব কথায় বলতে গেলে—'শিক্ষার অর্থ কার্য-শিক্ষা—পুঁথিগত বিদ্যা নহে, টেয়াপাখীব রাধাকৃষ্ণ বুলি নহে। হিন্দু এই কার্যশিক্ষাই বুঝে; ইহা ব্যতীত হিন্দুব অন্য শিক্ষা নাই। কর্ম, কর্ম, কর্ম—ইহাই হিন্দুব একমাত্র কথা। যিনি বৈদিক কর্মের অধিকারী, তিনি বেদ পাঠ করুন—ইহাই হিন্দুর উপদেশ। অপরে আজীবন বেদ পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট কবিবেন কেন? অধিকাবী ভেদে শিক্ষাভেদ। নচেৎ ভস্মে ঘৃত-ঢালাবৎ শিক্ষা নিষ্ফল হয়।

বর্ণজ্ঞান এই কার্য শিক্ষার সাহায্য কবে মাত্র। ইহা ব্যতীত বর্ণজ্ঞানের আর কোন উপকারিতা নাই। বলাবাহুল্য, অক্ষব পবিচয়েব সাহায্য ব্যতীতও উত্তম কার্যশিক্ষা হইতে পাবে। ·.... বর্ণজ্ঞান শূন্য হইলেও, পুরুষ এবং মহিলা সুশিক্ষিত হইতে পারেন, আবাব এদিকে, ইংরেজী-বাঙ্গালায় আউট হইয়াও অনেক নরনারী নিদারুণ অশিক্ষিত। শিক্ষার অর্থ,—বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়। যাঁহাব এ জ্ঞান জন্মে নাই, তিনি পাশ্চাত্য প্রদেশে আইসলণ্ডস্থ হেক্‌লা পর্বতে উঠিয়া এক্স, ওয়াই, জেড পাশ করিয়া আসিলেও অশিক্ষিত!' খুবই সাংঘাতিক মত। সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা যদি জগৎ চলতো, তাহলে আজ আমাদেব অবস্থা কোথায় কি হতো, কে জানে। নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁব বক্তব্য: 'সেই একদিন, আর এই একদিন। সেদিন সেই পূর্ণিমা তিথি, ষোলকলা শশী, শারদ কৌমুদীরাশি, আর আজ এই ঘোর অমানিশার অন্ধকাব, মেঘের হুঙ্কাব, বিদ্যুতের বিকট হাসি, উনপঞ্চাশ পবনের বিষম বিক্রম, আর বাঁচিনা, আব তিষ্ঠিতে পাবি না। সেদিন বাঙ্গালীব ঘরে ঘরে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শ-প্রতিমা দেখিয়াছি, মূর্তিমতী সরলতা, মূর্তিমতী পবিত্রতা, মূর্তিমতী পতিভক্তি, মূর্তিমতী গৃহকর্ম, মূর্তিমতী গৃহলক্ষ্মী, সেদিনও দেখিয়াছি—কিন্তু আজ ঠক বাছিতে গ্রাম উজার হয় কেন? কেন এমন হইল? বাঙ্গালীর ঘরণী বিলাসিনী কেন? আড়-

নয়ন খেমটা নাচে কেন ? চারু হাসিতে বিষ মাখাইল কে ? কথামৃতে ছাই ফেলিল কে ? ঘোমটা লুকাইল কে ? গৃহলক্ষ্মীকে বাইজি সাজাইল কে ? ·· ...ম্লেচ্ছ অধিকারে "স্ত্রী-শিক্ষা" নাম্নী এক অভিনব সামগ্রী এ দেশে আমদানি হইয়াছে। এই "স্ত্রী শিক্ষাই" সর্বনেশে জিনিস ; তেঁতুলে কেউটের বিষ। কিন্তু ইহাই বাবুদের সখের, সোহাগের সু-ভোগের পদার্থ। এই হলাহল-প্রসবিনী কালনাগিনী শিক্ষাই আজ রমণীকুলের সর্বোত্তম ভূষণ, ইহাই যেন হাতের নোয়া, সঁীথার সিন্দুর, ইহাই পতিভক্তি, পুত্র স্নেহ, গৃহকর্ম ; ইহাই সংসারের সার-সর্বস্ব। এ শিক্ষা না থাকিলে কন্যা কুৎসিতা, অসভ্য, বিবাহের অযোগ্যা, বরং একদিন, দশদিক উজ্জ্বলীকৃত, কহিনুর-বিভূষিত স্বর্ণমুকুট হস্তে পাইয়াও দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি, তথাচ, এ 'শিক্ষা'টুকু ছাড়িতে পারিনা। অধিক কি, বরং বিধবা হইয়া বারমাস বাস করিব, তথাপি এ শিক্ষা ছাড়িব না। এমনি ঝোঁক, এমনি মোহ, এমনি উন্মত্ততা।'[১৪] এই সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। মহাকাল এর সম্যক জবাব দিয়েছে। কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র 'বঙ্গবাসীতে' এই অনুদার পুনরভ্যুত্থানবাদী মতগুলি প্রচার করে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। ইংরেজের শোষণ এবং ইংরেজের অনুকরণ-প্রিয় এ-দেশীয় একটা বিশেষ শ্রেণীর উপর বিদ্বিষ্ট হয়ে জনসাধারণ এই প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। সুস্থ, স্বাভাবিক এবং যুক্তিসম্মতভাবে এই পুনরভ্যুত্থানবাদী চিন্তাধারাকে পরিচালিত করতে পারলে, দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি অনেক আগেই হতো। সে যা হোক, বঙ্গবাসী সেকালে যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, সেকথা ঠিক। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ভারতখ্যাত ব্যক্তিকেও 'ন্যাশনাল ফণ্ডের' সূচনায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। 'তাৎকালিক 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ যখন 'ন্যাশনাল ফণ্ডের' সূচনা করেন, তখন 'বঙ্গবাসীর' গ্রাহক সংখ্যা ও প্রতিপত্তি বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। একদিন সুরেন্দ্রনাথ ঐ ফণ্ড সম্বন্ধে কথা কহিবার জন্য যোগেন্দ্রচন্দ্রের বাসায় আসিয়াছিলেন।'[১৫] ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাস-নিপুণ ভাষায় মন্তব্য করেছিলেন,'যোগেন্দ্রবাবু, আপনি এত অল্পদিনের মধ্যে দু'পয়সার বাঙ্গালা কাগজের এমন প্রতিপত্তি করে তুলেছেন যে, ইংরেজী কাগজের সম্পাদকতাভিমানী বিলাতী বাবুরা আপনার মতামত জানবার জন্য আপনার বাসায় আসেন। এর জন্য আপনার কালো পাথরের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হওয়া উচিত।' মাদ্রাজের সুবিখ্যাত সিবিলিয়ান মিঃ লিলিও নাকি

'বঙ্গবাসীর' জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছিলেন। 'বঙ্গবাসী' হিন্দু-সংস্কার ও প্রথা ইত্যাদির সমর্থন ও প্রচার করে সাধারণের কাছে যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তা 'সহবাস সম্মতি বিধি' প্রবর্তনের সময় লক্ষ করা যায়। 'বঙ্গবাসী'র নির্দেশে তখন লক্ষ লক্ষ লোক নাকি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। 'সেই আন্দোলনের ফলেই 'বঙ্গবাসী'র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল—যোগেন্দ্রচন্দ্র রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ কবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।'[১৬]

তাঁর এই ইংরেজ-বিদ্বেষ একটি আপত্তিকর সংস্কারের সমর্থনে অপব্যয়িত না হয়ে যদি ইংরেজ-শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতো—তবে বিভিন্ন দিক থেকে দেশ অনেক এগিয়ে যেতো।

শুধু 'বঙ্গবাসী' নয়, যোগেন্দ্রচন্দ্র 'হিন্দী বঙ্গবাসী', বাংলা 'দৈনিক', ইংরেজী দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকা—'টেলিগ্রাফ' 'জন্মভূমি' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করে তাঁর মনোভাব সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই পত্র-পত্রিকাগুলিতে অজস্র রচনা লিখে সুখ্যাতি অর্জন করলেও, যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি কালের প্রভাব অতিক্রম করতে পারে নি। সুবলচন্দ্র মিত্র যোগেন্দ্রচন্দ্রের লেখার মাধুর্য ও নতুনত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি যাই বলুন না কেন, অনুদারতা, বিদ্বেষ এবং অতিশয়োক্তির ফলে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি সত্যি ব্যাহত হায়ছে। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মধ্যে যে দূরত্ব বজায় রাখা উচিত, যোগেন্দ্রচন্দ্র তা পারেন নি, তাই তাঁর সাহিত্য 'দাঁত খিচুনিতে' পরিণত হয়েছে। এ-বিষয়ে অজিত দত্তের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—'যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় হাস্যরস দূরে থাক, প্রকৃত সরসতাই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। গালি দিয়ে লোক হাসাবার যে প্রথা সেকালে প্রচলিত ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে যথোচিত নিন্দা করেছেন। তবু সেকালে কবিওয়ালার খেউড়ে কিছুটা হাসি ছিল। কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনা পাণ্ডিত্যের ভান অত্যুগ্র হিন্দুয়ানি এবং অসূয়াপূর্ণ মনোভাব মিশ্রিত হয়ে 'দাঁত খিঁচুনিতে' পর্যবসিত হয়েছে।'[১৭] 'জনৈক' সমালোচক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক রচনাগুলি পরবর্তীকালে ব্যর্থ হওয়ার জন্য আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'শুনিয়াছি, ফরাসী নাটককার মোলিয়ার একটি একটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে এক একখানি বিদ্রূপাত্মক নাটক লিখিতেন। আর বিদ্রূপবাণে জর্জর হইয়া কুপ্রথাটি প্যারিস-সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইত। ডিকেন্সের নভেলও ইংরাজ-সমাজের অনেক

কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে; কিন্তু ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ লেখনী আমাদের চক্ষু ফুটাইতে পারে নাই। ইহা কি মোলিয়ার ডিকেন্‌সের তুলনায় ইন্দ্রনাথ-যোগেন্দ্রচন্দ্রের অক্ষমতাব পরিচায়ক? শতবার বলিব, কখনই নহে। আমরা যে 'গম্ভীরবেদী' তাই আমাদের সমাজে পড়িয়া হীরার ধারও ভাঙ্গিয়াছে।' এ-ধারণা সত্য নয়। যোগেন্দ্রচন্দ্র যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, মহাকালের বিচারে সেগুলিব অনেকটা আজ অপ্রয়োজনীয় এবং ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর রক্ষণশীলতা ও সংশয়কে অতিক্রম করে প্রগতির রথ সবেগে এগিয়ে গেছে। সেজন্যই আধুনিক মানুষের কাছে যোগেন্দ্রচন্দ্রেব সাহিত্য-কীর্তি আজ ব্যর্থ।

পাদটীকা

প্রাক্-পরিচয়

১. এই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত সাধারণ-সভায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটু বিলম্বে উপস্থিত হলে রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁকে মিশনারী অসুরবধকারী আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, 'আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম ; আমরা ভাবিতেছিলাম যে, দেবেন্দ্র ভিন্ন অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে কে ?'—'ভূদেব চরিত' (৩য় খণ্ড), পৃঃ ১১৯—মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

২. বীর পূজা : যোগেন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪০ —যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

৩. **'Brahminism and the Sudra'**—শীর্ষক নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, **'rin or sense of debt which even now fairly binds the Hindu Conscious with a true sense of duty.'**

৪. কেশবচন্দ্র বলেছিলেন, 'কখনো লক্ষ্মী, কখনো সরস্বতী, কখনো মহাদেব, কখনো জগদ্ধাত্রী—এই নানা ভাবে কখনো একনামে কখনো অন্যনামে হরিকে নিত্য নবীন বেশে দেখিব।'

৫. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (৩য় সংস্করণ), পৃঃ ৩২২ : শিবনাথ শাস্ত্রী।

৬. জাতি-বৈর, পৃঃ ২০১ : যোগেশচন্দ্র বাগল।

৭. **The Literature of ihe Victorian Era—H. Walker.**

৮. 'কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা', পৃঃ ৬, যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর।

৯. 'কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা' পৃঃ ৬৬, যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর।

১০. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পিতা আনন্দচন্দ্র গোস্বামী নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি রান্না করার কাঠগুলি পর্যন্ত গঙ্গাজলে ধুয়ে নিতেন। তাঁর কণ্ঠে 'দামোদর' নামে শালগ্রাম শিলা কণ্ঠাভরণস্বরূপ শোভা পেত।—'মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ', পৃঃ ৮ : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

১১. প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পৃঃ ১৪৪ : জগদ্বন্ধু মৈত্র।

১২. সত্তর বৎসর—আত্মজীবনী, পৃঃ ৭—৮ : বিপিনচন্দ্র পাল।

১৩. Sri Krishna Pp 1—2, Bipin Ch. Pal.

১৪. পৌরাণিক নাটক—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

১৫. গিরিশ গ্রন্থাবলী (দ্বাদশ ভাগ, বসুমতী সংস্করণ, ১৩১৮), পৃঃ ২৩২।

১৬. 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' প্রবন্ধ। (বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩০৮) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

১৭. 'পুণ্য' বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩০৫।

১৮. 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ।—বাংলা সাহিত্য সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ' : চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

১৯. 'সবুজপত্রের ডাক' প্রবন্ধ, 'দেশ' (১৩ই কার্তিক, ১৩৬৬)।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

১. The Cultural Heritage of India, March 1937, Vol 1, Introduction, P XXX

২. The Indian Mirror, 9 Oetober, 1811

৩. Man I have seen, 4th Chapter—Sivnath Shastri.

৪. ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ৬৫ : প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।
এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রামকৃষ্ণদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক যোগদান করেছিল। শবযাত্রায় 'হিন্দুধর্মের ত্রিশূল ও ওঁকার, বুদ্ধধর্মের খুন্তি, মোহম্মদীয় ধর্মের অর্দ্ধচন্দ্র, খ্রীষ্টধর্মের ক্রুশচিহ্নিত পতাকা সর্বাগ্রে বাহিত হইয়াছিল।'
('শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' সমসাময়িক দৃষ্টিতে) পৃঃ ৬৫, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত)।

৫. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৬—শ্রীম কথিত।

৬. The Discovery of India, P. 338—Jawharlal Nehru.

৭. আত্মচরিত, পৃঃ ২১৬—শিবনাথ শাস্ত্রী।

৮. বাংলার নবযুগ, পৃঃ ১৫১—মোহিতলাল মজুমদার

৯. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও দেশ, পৃঃ ২৮—ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায়।

১০. ধর্মতত্ত্ব (১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬) পত্রিকায় এ-বিষয়ে লেখা হয়েছিল,—'তিনিও (পরমহংসদেব) আচার্য ভবনে আসিয়া অনেক দিন লুচি

তরকারী ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেন, এমন কি ক্ষুধা হইলে খাবার চাহিয়া খাইতেন।'

১১. রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের গভীর প্রীতির কথা স্মরণ করে ১৮৮৬ খৃঃ ১০ই সেপ্টেম্বর 'দি ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, পরমহংসদেব নাকি তাঁর জীবনের শেষ ক'টি দিন কমলকুটীরে কেশবচন্দ্রের সমাধি সৌধে কাটিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

১২. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র—শিবনাথ শাস্ত্রী।

১৩. The life and teaching of Keshub Chunder Sen, P. 242—P. C. Mozumder

১৪. Ramkrishna and his Disciples, P. 192—Christopher Isherwood.

১৫. বিবেকানন্দ চরিত : সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, পৃঃ ৫০

১৬. Ramkrishna and his Diciples, P. 196—C. Isherwood.

১৭. এই সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'On the Edges of time' (পৃঃ ৪৪) গ্রন্থে লিখেছেন, ভগিনী নিবেদিতার কথায় রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে হিমালয় ভ্রমণে অনুমতি দিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "পিতৃস্মৃতি" গ্রন্থে (পৃঃ ২৫৬) আরো লিখেছেন, বুদ্ধগয়ায় জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ গভীর রাত্রি পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

১৮. Life and works of Brahmananda Keshub, P. 106—P. S. Basu.

১৯. প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পৃঃ ৩৯৫—জগদ্বন্ধু মৈত্র।

২০. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ২৮২—শ্রীম কথিত।

২১. Ramkrishna and Disciples, P. 199—C. Isherwood.

২২. রামকৃষ্ণের জীবন, পৃঃ ২০৪ : রোঁমা রোলাঁ।

২৩. ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'The Master As I Saw Him' গ্রন্থে (পৃঃ ১০৮—১০৯) এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'It was his habit, when a new disciple came to him, to examine him mentally and Physically in all possible ways.'

শশধর তর্কচূড়ামণি

১. সাধারণী, ১৮৮৪
২. শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪র্থ ভাগ, পঞ্চদশ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।
৩. ১২৮১ সালের 'সাধাবণী'র বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গ রচনার (চুল্লী না নির্বাণ হয়) একস্থানে লেখা হয়েছিল—'উন্নতিশীল ব্রাহ্মরূপী তালবৃক্ষগণ, লেক্‌চরে লেকচবে খীশুস্তুতি করিয়া যোগসাধনা করিতেছেন'। ১২৮০ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় বাগাডম্বব বেশী, ইতিহাস জ্ঞান অতি অল্প বলে কটাক্ষ করা হয়েছিল।
৪. সত্তর বৎসর ॥ আত্মজীবনী ॥—বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ ১৯৮
৫. A Nation in Making P-85—Surendra Nath Banerjee.
৬. Bengal under the Lieutenant Governors pp 787-88 : Buckland C. E.
৭. 'গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান,
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌সন, কেস্‌য়িক মিলার—
"নেটিভের কাছে খাড়া, নেভাব,—নেভাব।"
"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান, আমাদের "জানানা"।
বিবিজান! দেহে প্রাণ কখনো তা হবে না ॥ ইত্যাদি
৮. Reproduced from 'Memories of my life and times in the days of my youth'—Bipin Ch. Pal.
৯. Supplement to the Theosophist, May, 1882. Reproduced from 'The Theosophical Craze : Establishment of the Theosophical Society'—John Mur Doch.
১০. Amrit Bazar Patrika, July 22, 1886.
১১. A letter to Mr. Behramji M. Malabari, Reproduced from Allan Octavian Hume, Appendix II—Sir William Wedderburn, Bart.
১২. স্মৃতিরঙ্গ—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।
১৩. Memories of my life and times—Bipin Ch. Pal.
১৪. কর্ণধার (১২৯৫-৯৬) : হৃষীকেশ শাস্ত্রী

১৫. 'সম্পূর্ণ মানুষ ভারতেই সম্ভবে'—ধর্মব্যাখ্যা (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড) : শশধর তর্কচূড়ামণি

১৬. 'হিন্দুধর্মের সংস্কার' প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর—চন্দ্রমোহন সেন, 'নবজীবন' ৪র্থ ভাগ (১২৯৪-৯৫)

১৭. পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার "সমালোচনা শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

১৮. চন্দ্রনাথ বসু—সাহিত্য সাধক চরিতবালা (৮ম খণ্ড)

১৯. 'আর্য ও অনার্য' : হাস্য কৌতুক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০. 'আর্যামি ও সাহেবিয়ানা' : প্রবন্ধ মালা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১. " " "

২২. " " "

২৩. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১০)

২৪. " " "

২৫. সামাজিক বা 'REFORMED HINDOOS' : হাসির গান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

২৬. 'আমাব জীবন' (প্রচাবক না প্রবঞ্চক অংশ)—নবীনচন্দ্র সেন

২৭. 'নবজীবন' (১২৯৪-৯৫) চন্দ্রমোহন সেনের 'হিন্দুধর্মের সংস্কার' প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর

২৮. আমার জীবন (প্রচারক না প্রবঞ্চক অংশ) নবীনচন্দ্র সেন

২৯. " " "

৩০. **Bengalee, Saturday, July 19, 1885 (Editorial)**

৩১. এই কাব্যগ্রন্থে, কলিদেবের সঙ্গে শশধর তর্কচূড়ামণির এবং কলি-গুরু হিসাবে পঞ্চানন্দ অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কাব্যটি মেঘনাদ বধ কাব্যের অনুকরণে লেখা। যেমন—

প্রস্তাবনা।

দুর্দান্ত ব্রাহ্মের দল দৈব বলে বলী,
যুঝি কলিরাজ সনে ঘোরতর রূপে
অস্থিরিলা যবে তাঁয়, ভয়ে ভঙ্গ দিয়া
পলাইলা কলিদেব অনুচর যত,
টলিল আসন তাঁর ঘন থর থরি,

কি চেষ্টা করিলা তবে কলিরাজ পুন,
উদ্ধারিতে নিজ রাজ্য, কহ বীণাপাণি! ইত্যাদি

৩২. স্মৃতিকথা—স্বর্গীয় মন্মথকুমার বসু রচিত ও শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত, ১ম সংস্করণ ১৩৫৫, পৃঃ ১৭১
৩৩. 'ব্রাহ্মণ সমাজ' পত্রিকা, ১৩৩৪

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন

১. রবীন্দ্র জীবনী (১ম খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
২. 'ভারতে ধর্মপ্রচার' 'পরিব্রাজকের বক্তৃতা'—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন
৩. 'ভারতে মূর্চ্ছাভঙ্গ' " " " "
৪. My Life and times,—Bipin Ch. Pal, p 438-439 Vol 1
৫. 'ভক্তি ও ভক্ত' অবতরণিকা অংশ—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন
৬. বলিদানের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত : প্রকাশকের নিবেদন
৭. সাহিত্য—১৩২৮ (আষাঢ)
৮. 'নীতিরত্নমালা' পরিশিষ্ট—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন
৯. " " "
১০. রবীন্দ্র জীবনী (১ম)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১১. বাংলা চরিত সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত—ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য
১২. দুর্গামোহন সেন লিখিত পত্রখানি বর্তমানে নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক নীরদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে রক্ষিত আছে।
১৩. ১৮৯৯ খৃঃ জেল খাটার পর তিনি শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও শিশিরকুমার ঘোষের অনুরোধে দেওঘরে দুটি বক্তৃতা করেন।

চন্দ্রনাথ বসু

১. 'চন্দ্রনাথ বসু'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' পৃঃ ৮
২. Calcutta quarterly Magazine and Review, P. 92-94
৩. The Proceedings & Transactions of the Bethune Society, From Nov. 10th, 1859 to April 20th 1869, p. c XXXVII

৪. এ প্রসঙ্গে 'বঙ্গভাষার লেখক' (পৃঃ ৬৯১) গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর ক্ষুদ্র আত্মজীবনীতে লেখা হয়েছে—'পূর্ব্বে যখন দেব-দেবীতে বিশ্বাস ছিল না, ইংরাজী ভাবাপন্ন ছিলাম, তখন আমাদের সবই মন্দ মনে হইত। ঠিক মনে নাই, বোধ হয় ১৮৭৭ সালে (২৫ এপ্রিল ১৮৭৭) 'Bethune Society' নামক সভায় 'High Education in India' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম।'

৫. পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত।

৬. বাংলায় ধ্রুববাদ (Krishnanagar Centenary Vol.) প্রিয়রঞ্জন সেন।

৭. 'Life of the Hon. Dwarakanath Mitter' by Dinabandhu Sanyal, P. 144.

৮. চন্দ্রনাথ বসু—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'।

৯. পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

১০. হিন্দুত্ব, ভূমিকা : চন্দ্রনাথ বসু

১১. 'সোঽহং'—হিন্দুত্ব : „

১২. 'কঃ পন্থা' পৃঃ ৩২ : „

১৩. „ পৃঃ ৬১-৬২ „

১৪. সাবিত্রীতত্ত্ব পৃঃ ৩০ „

১৫. ফুল ও ফল পৃঃ ৮৩ „

১৬. চন্দ্রনাথ বসুর বিভিন্ন মতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখনী ধারণ করেছিলেন। 'হিন্দু বিবাহ'—ভারতী ও বালক, ১২৯৪ আশ্বিন ; 'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর মত'—সাধনা, ১২৯৮ পৌষ, "সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা", সাধনা ১২৯৮ ফাল্গুণ, "কড়ায় কড়া কাহন কানা" সাধনা ১২৯৯ পৌষ, "চন্দ্রনাথ বাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব সাধনা" ১২৯৯ আষাঢ়, "সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা "সাধনা, ১২৯৯ ভাদ্র—আশ্বিন সংখ্যা দ্রষ্টব্য। মতভেদ থাকলেও চন্দ্রনাথ বসুর প্রতি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ শ্রদ্ধা ছিল। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের 'বিমল, চন্দ্রবাবু আসিয়াছেন' উক্তিটির মধ্যে এই শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। চন্দ্রনাথ বসুও রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। ১৩০৭ সালের ৩০শে শ্রাবণ একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছিলেন—'তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ আমার নাই—তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ।

তোমার প্রতিভার পরিমাপ নাই—উহার বৈচিত্রও যেমন, প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত······কিন্তু তোমার গতি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি—ও গতি যথার্থই বিদ্যুতের গতি—যেমন দ্রুত, তেমনি উজ্জল, তেমনি সুন্দর। ও গতি এখানকার নয়, উর্ধ্বদেশের মহাকাশের। রবীন্দ্রনাথ, তোমার পরিমাণ করিতে পারি যথার্থই এমন শক্তি আমার নাই।' এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৮৭৬ খৃঃ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মরকতকুঞ্জে হিন্দু কলেজেব প্রাক্তন ছাত্রদের যে পুনর্মিলনোৎসব হয়েছিল তাতে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের নামে-মাত্র ছাত্র, পনের বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথকে চন্দ্রনাথ বসুই নিয়ে যান।

১৭. হিন্দুত্ব পৃঃ ৩৩০ : চন্দ্রনাথ বসু

১৮. সমাজ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯. ত্রিধারা পৃঃ ১১৩ : চন্দ্রনাথ বসু

২০. হিন্দুত্ব পৃঃ ২৬৬ : "

২১. ফুল ও ফল পৃঃ ২৬-২৭ "

২২. উৎসর্গ 'পৃথিবীর সুখ ও দুঃখ' "

২৩. সাবিত্রী তত্ত্ব পৃঃ ১৬৩-৬৪ "

২৪. গার্হস্থ্যপাঠেব ভূমিকা "

২৫. ত্রিধাবা পৃঃ ১৩৩-১৩৫ "

২৬. The Reformation Era P. 336—H. J. Grimm.

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

১. Memories of My Life And Times, P. 439—Bipin Ch. Pal

২. 'প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় কর্তৃক হিন্দুধর্মের সংস্কার' প্রবন্ধ (নবজীবন ৩য় ভাগ, ১৮৮৬)—চন্দ্রমোহন সেন।

৩. 'সত্য অহিংসাদি—নিত্যধর্ম,' "সনাতনী"—অক্ষয়চন্দ্র সরকার

৪. " " "

৫. 'মর্মকথা'—নবজীবন প্রথম ভাগ, ১২৯১।

৬. 'তোমরা যদি আর্য হও, আমরা অনার্য', 'রূপক ও রহস্য' : অক্ষয়চন্দ্র সরকার

" " "

৮. 'নারী ধর্ম' প্রবন্ধ, 'সনাতনী' : অক্ষয়চন্দ্র সরকার

৯. 'জাতি : সৃষ্টি, স্থিতি, উন্নতি'—'সনাতনী' অক্ষয়চন্দ্র সবকার।

১০. অক্ষয়চন্দ্র এত গোঁড়া ছিলেন যে, তিনি নাকি মাথায় টিকি বা শিখা পর্যন্ত ধারণ করতেন। অক্ষয়চন্দ্রের এই রক্ষণশীলতাকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রথমে ব্যঙ্গ করেছিলেন। 'আষাঢ়' গ্রন্থে রাজা নবীনকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা পূবণ-প্রসঙ্গে, শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে জীবন সরকার অর্থাৎ অক্ষয়চন্দ্রকে দ্বিজেন্দ্রলাল বানব বানিয়েছিলেন। মাথায় খাঁটি গোবর-গোলা ঢেলে ঠিক ৮২ গজ মাপে নাকে খত দেবার কথাও সেই ব্যঙ্গ-কবিতায় উল্লিখিত হয়েছিল।

'বল্লেন উঠে জীবন সরকার তখন,' মহাবাজ,
হিন্দুধর্ম সংবক্ষণটা কবাই আমার কাজ;
করি ব্যাখ্যা ধর্ম, ভাগবতেব মর্ম,
বেদ ও দর্শন, মনুস্মৃতি সংস্কৃত না শিখেই,
প্রচাবি যোগ ব্রহ্মচর্য—চালাই একখানা মাসিকী;
—ইথে, বল্লেন সবকাব, বিদ্যা নেইক দবকাব,
বলা দরকাব, "ইংবেজ মূর্খ, হিন্দুবাই সব;"
তাতে আমার মাসিক পত্র কাটে অসম্ভব!

* * *

কিন্তু তোমার সরকাব কিছু শিক্ষার দবকাব,
সর্দাব, এই বানরের মাথায় গোবব গোলা খাঁটি
ঢেলে, দেওয়াও নাকে খত ঠিক ৮২ গজ মাটি।'

অবশ্য পবে (১৯১২ খৃঃ) দ্বিজেন্দ্রলাল অক্ষয়চন্দ্রের 'সনাতনী গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কবে একটি পত্র লিখেছিলেন।

১১. অক্ষয়চন্দ্রেব সাকার রূপ-বন্দনা তাঁব দুর্গোৎসব শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, চন্দ্রনাথ বসু, শশধর তর্কচূড়ামণিও দুর্গোৎসব সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের দুর্গোৎসব তত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২১ খৃঃ লিখেছিলেন (দ্রঃ অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার—কালিদাস নাগ সম্পাদিত, পৃঃ ৮৩০)—'তখনকার ব্রাহ্ম সমাজেব ভাবতরঙ্গ কেমন ভঙ্গীতে উত্থিত হইত তাহা না জানিলে এই সকল প্রবন্ধের কাকু ও দ্যোতনা কেহ উপভোগ করিতে

পারিবে না। এ যে পাল্টা জবাব, কিসের এবং কাহাদের পাল্টা জবাব তাহা জানিতে ও বুঝিতে হইবে, হিন্দুয়ানীকে বা Hindu Culture-কে বঙ্কিমযুগের মনীষিগণ কোন্ উপায়ে এবং কোন্ ভাবে ইয়োরোপীয় শিক্ষা সাধনা বা Culture-এর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অনেকটা সার্থক চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আচার্য অক্ষয়চন্দ্রের দুর্গোৎসব প্রবন্ধ-পরম্পরায় প্রকট আছে।'

১২. সাধারণী (২৮শে কার্তিক, ১২৮৩)।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১, Memories of my Life and Times—Bipin Ch. Pal. P, 432

২. ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত: ভূমিকা পৃঃ ১৩।

৩. কল্পতরু গ্রন্থটি 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লিখিত হয়। 'জ্ঞানাঙ্কুব' সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণদাস ছিলেন ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী। তিনি 'কল্পতরু' উপন্যাসটি ফেবত দেবার সময় মন্তব্য কবেছিলেন, 'ব্রাহ্মের নিন্দাসূচক, কেমন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে তাহা (কল্পতরু) প্রকাশিত হইতে পারে।' 'বঙ্গভাষার লেখক' (১ম ভাগ, পৃঃ ৭৫৫)।

'কল্পতরু' টেক্‌চাঁদ ঠাকুরের রচনারীতির অনুকরণে লিখিত হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে 'ক্যালকাটা রিভিয়্যু' (১৮৭৫, পঞ্চদশ সংখ্যা) মন্তব্য করেছিল, **'The style of the book is after that of Alaler Gharer Dulal, but the author, we must admit, has beaten Tekchand Thakur hollow.'**

গ্রন্থটি সম্বন্ধে সেই পত্রিকায় আবও মন্তব্য করা হয়েছিল যে,—**'...to be sure, it is not a complete picture of society, it does not deal with the virtues or greatness of men; it represents simply their vices, and failings and littleness; but as such the representation is admirably perfect.'**

ডাঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৯) গ্রন্থে লিখেছেন, 'সেকালে প্রধানত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী অথবা ব্রাহ্ম-

ধর্মানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা সমাজে নূতনত্বের প্রবর্তন হইয়াছিল, সেই কারণে কল্পতরুতে এবং পরবর্তী অধিকাংশ রচনায় বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্মানুরাগী নব্যেরা ব্যঙ্গচিত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছিল।' বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য হিসাবে 'কল্পতরুর' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'বঙ্গদর্শনে' (পৌষ ১২৮১, পৃঃ ৪১৫-২০) লিখেছিলেন. 'বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাঙ্গালার প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।'

৪. সুসমাচাব—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী (বঙ্গবাসী সংস্করণ), পৃঃ ৩৯৬।

৫. পঞ্চানন্দেব বিলাত যাত্রা—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী (বঙ্গবাসী সংস্কবণ), পৃঃ ৬২৭।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব 'কালান্তব' প্রবন্ধে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 'ম্যাট্‌সিনি-গারিবাল্‌ডিব বাণীতে কীর্তিতে সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত। সেদিন তুর্কিব সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের বজ্রস্বব। আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন কবতে আবম্ভ কবেছি।'

৭. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'ইল্‌বার্ট' বিলকে কেন্দ্র করে 'নেভাব, নেভাব' শীর্ষক ব্যঙ্গ-কবিতা লিখেছিলেন।

৮. রবীন্দ্রনাথের 'যুরোপ প্রবাসীব পত্রে' এই মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন—'ইংলণ্ডে আসবাব আগে আমি আশা করেছিলেম যে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বুঝি টেনিসনেব বীণাধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, মনে কবেছিলেম, এই দুই-হস্ত পরিমিত ভূমিব যেখানে থাকি না কেন, গ্ল্যাড্‌স্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্সমূলাবেব বেদান্ত ব্যাখ্যা, টিণ্ড্যানের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্র শুনতে পাব।'

৯. বিধবার পুবষান্তব গ্রহণ (১) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গবাসী' ২৪শে ফাল্গুণ, ১৩১৪।

১০. নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা ( ) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গবাসী', ১০ই চৈত্র, ১৩১২।

১১. 'স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা' (১) পঞ্চম প্রবন্ধ—'বঙ্গবাসী', ১৯শে ফাল্গুণ, ১৩১২।

১২. 'স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা' (১) পরিশিষ্ট

১৩. 'সংস্কার ও শিক্ষা' ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গবাসী ২২শে বৈশাখ, ১৩১৩।

যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু

১. Memories of my Life and Times—Bipin ch. Pal, P. 431

২. 'Bengalee', Nov. 19, 1881.

৩. ইন্দ্রনাথ স্মৃতি : ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলীর ভূমিকা (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

৪. উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনরুজ্জীবনের কথা শোনা যায়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বঙ্গদর্শনে (বৈশাখ, ১৯০১) 'হিন্দু জাতির একনিষ্ঠতা' প্রবন্ধ লিখে বর্ণাশ্রম ধর্মের মহিমা কীর্তন করেন। ঐ বৎসরের বঙ্গদর্শনে (চৈত্র) 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' প্রবন্ধ লেখেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। একই সময়ে রবীন্দ্রনাথও একাধিক প্রবন্ধে এর মাহাত্ম্যখ্যাপন কবেন। রামেন্দ্রসুন্দর জাতিভেদ-ভিত্তিক বর্ণাশ্রম ধর্মেব পক্ষপাতী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সেই অর্থে বর্ণাশ্রমেব গুণগান কবেন নি। তিনি জাতিভেদের চেয়ে গুণভেদের উপর জোব দিয়েছিলেন বেশি। শান্তিনিকেতন থেকে লিখিত একখানি পত্রে (৭ই বৈশাখ, ১৩০৯) রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রমের জয়গান কবেছিলেন—'এই আদর্শে সমস্ত জীবনকে ধর্মলাভের উপায় স্বরূপ করিয়া তোলা যায়—বাল্যে গুরুগৃহে বাস ও ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা জীবনের সুর বাঁধা সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিব সঙ্গে একাত্মভাবে মিলিয়া বাডিয়া উঠা,· ·যৌবনে সংসাবে প্রবেশ ও মঙ্গল সাধনা, বার্ধক্যে সংসার বন্ধনকে মোচন কবিয়া অধ্যাত্মলোকের জন্য প্রস্তুত হওয়া, বনবাস ও শিক্ষাদান।' বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' গ্রন্থে বৈষম্য-ভিত্তিক বর্ণাশ্রমের নিন্দা করলেও পরে ধর্মতত্ত্বে (১৮৮৮) সেই মত পরিবর্তন করেন। ধর্মতত্ত্বের দশম অধ্যায়ে তিনি লঘু-গুরু ভেদ স্বীকার করে লিখেছেন, 'রাজার অপেক্ষাও যাহারা সমাজের শিক্ষক তাঁহারা ভক্তির পাত্র।······সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল।'

৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ড. সুকুমার সেন, পৃ: ২০০—২০১।

৬. কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য চরিতামৃত' (মধ্যখণ্ড, ২৩ অধ্যায়) গ্রন্থের 'সনাতন শিক্ষায়' বৈরাগ্যের স্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও 'মর্কটবৈরাগ্যে'র নিন্দা করতেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র এর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন।

৭. 'রজনী' উপন্যাসের শেষদিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতবর্ষের চিকিৎসা-শাস্ত্রের গুণগান করে লিখেছেন, 'আমাদিগের ভাবতবর্ষের চিকিৎসা সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য প্রকরণ ছিল,—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম কবিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না।' এছাড়া 'মৃণালিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি উপন্যাসে সন্ন্যাসী-চিকিৎসকদের অলৌকিক কার্যকলাপও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

৮. 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'—যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

৯. 'হিন্দুধর্মের দুর্দিন' প্রবন্ধ, বাঙ্গালী চরিত—যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

১০. **A case of Police Oppression—Bengalee, Jan. 19, 1881.**

১১. 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধ—বাঙ্গালী চরিত—যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

১২. 'মহীরাবণেব আত্মকথা'— ঐ

১৩. যোগেন্দ্রচন্দ্রেব প্রথম স্মৃতিসভায় সুবলচন্দ্র মিত্রের বক্তৃতা।

১৪. 'শিক্ষিতা বাঙ্গালিনী' প্রবন্ধ—'বাঙ্গালী চরিত'—যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

১৫. 'ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী' ভূমিকা (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

১৬. সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র—সুবলচন্দ্র মিত্র।

১৭. বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস—অজিত দত্ত।

১৮. সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

ভূদেব চরিত | মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়
যোগেন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী | যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | শিবনাথ শাস্ত্রী
কেশব জননী দেবী সারদা সুন্দরীর আত্মকথা | যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর
মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ | যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
গিরিশ গ্রন্থাবলী | বসুমতী প্রকাশন
ভগিনী নিবেদিতা | প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—সাময়িক দৃষ্টিতে | সজনীকান্ত দাস ও
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
আত্মচরিত | শিবনাথ শাস্ত্রী
বাংলার নবযুগ | মোহিতলাল মজুমদার
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও দেশ | সত্যেন্দ্রনাথ রায়
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র | শিবনাথ শাস্ত্রী
বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী | জগদ্বন্ধু মৈত্র
রামকৃষ্ণের জীবন | রোঁমা রোঁলা
সত্তর বছর | বিপিনচন্দ্র পাল
স্মৃতি রঙ্গ | তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
ধর্মব্যাখ্যা | শশধর তর্কচূড়ামণি
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার সমালোচনা |
কালীবর বেদান্তবাগীশ
হাস্য কৌতুক | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আর্যামি ও সাহেবিয়ানা | দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা | স্বামী বিবেকানন্দ
হাসির গান | দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আমার জীবন | নবীনচন্দ্র সেন
স্মৃতিকথা | মন্মথকুমার বসু
রবীন্দ্র জীবনী | প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
পরিব্রাজকের বক্তৃতা | কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন
ভক্তি ও ভক্ত | ঐ
নীতিরত্নমালা | ঐ
বাংলা চরিত সাহিত্য | দেবীপদ ভট্টাচার্য
সাহিত্য সাধক চরিত মালা | ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্যায়) | বিপিনবিহারী গুপ্ত
পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু | খগেন্দ্রনাথ মিত্র
হিন্দুত্ব | চন্দ্রনাথ বসু
কঃ পন্থা | ঐ
সাবিত্রী তত্ত্ব | ঐ
ফুল ও ফল | ঐ
ত্রিধাবা | ঐ
পৃথিবীর সুখ ও দুঃখ | ঐ
রবীন্দ্র রচনাবলী | বিশ্বভারতী প্রকাশন
সনাতনী | অক্ষয়চন্দ্র সরকার
রূপক ও রহস্য | ঐ
অক্ষয়চন্দ্র গ্রন্থাবলী | কালিদাস নাগ সম্পাদিত
ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী | শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস | সুকুমার সেন
রজনী | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী | যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু
মহীরাবণের আত্মকথা | ঐ
বাঙ্গালী চরিত | ঐ
সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র | সুবলচন্দ্র মিত্র
বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস | অজিত দত্ত
সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র | ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পত্রাবলী | স্বামী বিবেকানন্দ

Man I have Seen | Sibnath Shastri

Discovery of India | Jawharlal Nehru

The life and teaching of Keshub Chundur Sen | P.C. Majumdar

Ramkrishna and his Disciples | C. Isherwood

On the Edges of time | Rathindranath Tagore

Life and works of Brahmananda Keshab | P. S. Basu

The Master as I saw him | Sister Nivedita

A Nation in Making | Surendranath Banerjee

Bengal Under the Lieutenant Governors | C. E. Buckland

Memories of my Life and Times | Bipinchandra Pal

The Theosophical Craze : Establishment of the Theosophical Society | John Mur Doch

Allan Octavian Hume | Sir William Wedderbarn

Life of the Hon. Dwarakanath Mitter | Dinabandhu Mitra

The Literature of Victorian Era | H. Walker

Sri Krishna | Bipin chandra Pal

National Awakening and the Bangabasi | Shyamananda Banerjee

History of Indian and Political Ideas | Bimanbehari Majumdar

Militant Nationalism in India | Do

British Paramountcy and Indian Renaissance | Ed.—R. C. Majumdar

Speeches and writings of Annie Besant

Social Background of Indian Nationalism | A. R. Desai

Ramkrishna | Max Muller

History of Brahmo Samaj Movement | Sibnath Shastri

The Complete Works of Swami Vivekananda

Studies in Renaissance of Hinduism in the Nineteenth and Twentieth Century | D.S. Sarma

The Reformation Era | H. J. Grimm

পত্র-পত্রিকা

বঙ্গদর্শন, পুণ্য, দেশ (সাহিত্য সংখ্যা—১৩৭৩), ধর্মতত্ত্ব, সাধারণী, কর্ণধার, নবজীবন, প্রচার, ব্রাহ্মণ সমাজ, সাহিত্য, আলোচনা, সখা, ভারতী, সাধনা, বঙ্গবাসী, Statesman, Englishman, Amrita Bazar Patrika, Hindu Patriot, Bengalee, The Indian Mirror, The Cultural Heritage of India, Calcutta Quarterly Magazine and Review, The Proceedings and Transactions of the Bethune Society, Krishnanagar College Centenary Volume.

নির্ঘণ্ট